ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৯। সংখ্যা ২৩। মে ২০২৬

ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৩ ● মে ২০২৬

সম্পাদক

মাহমুদ হাফিজ

বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৩ ● মে ২০২৬

সম্পাদক
মাহমুদ হাফিজ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
জুলেখা ফেরদৌসী

প্রচ্ছদ শিল্পকর্ম
এজেড শিমুল এর চিত্রকর্ম 'যুগল যোগী' অবলম্বনে

কর্মাধ্যক্ষ
হোসেন সোহরাব

অক্ষর বিন্যাস
আশিক হোসেন

মুদ্রণ

মাওলা কালার ইনভার্ট
৯৯ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মূল্য
২০০ টাকা

যোগাযোগ
প্রযত্নে- লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গণ
৭৯ আজিজ মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Bhromongoddya
A Travelogue Magazine
Year 9 Issue23 | | May 2026
Editor | | **Mahmud Hafiz**
Managing Editor | | **Zulekha Ferdousi**
Cover | | **Based on AZ. Shimul's painting 'Jugol Yogi'**
Illustration | | **Ashik Hossain**
Manager | | **Hossain Sohrab**
Printing: **Mawla Color Invart**
99 Fakirapool, Dhaka-1000
Price: **BDT 200 IR 150 USD 5**

Contact
C/O: Little Magazine Prangyan, 79 Aziz Market (1st Floor) Shahbag, Dhaka-1000
Email: bhromongoddya@gmail.com
FB: Facebook.com/bhromongoddya

সূচিপত্র

নির্বাচিতক্রম

মঈনুস সুলতান	৭	নৃত্যগীতে ভরপুর জলসার শেষ শোভাযাত্রা
আবু জুবায়ের	১৭	সিসিলির পথে প্রান্তরে
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩	জাঁস্কার ভ্যালি
ফরিদুর রহমান	২৯	লেক প্লিটভিস: জাদুকরী জলের জগৎ
স্বপন ভট্টাচার্য	৩৭	মোৎজার্ট এর শহরে
কামরুল হাসান	৪৩	অরুনোদয়ের অরূপতীর্থপথে
আবদুর রব	৫০	ইনকাদের দেশে
হুসেইন ফজলুল বারী	৬১	মগের মুল্লুক
মনিরুল ইসলাম	৬৯	সাকিন সাইকেল

বর্ণানুক্রম

অনিন্দিতা সেন	৭৬	টাকিনের ঠিকানায়
আকতারুল আলম বাবলু	৮৫	এক সুন্দরবন, দুই ভ্রমণ
আহসান নবাব	৮৯	গ্রান্ড ক্যানিয়ন ও অন্যান্য
ক্ষমা মাহমুদ	৯২	বুখারা ॥ স্মরণে মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জা
গোলাম শফিক	৯৯	দিনাজপুরের দর্শনীয়
চান্দ্রেয়ী পাল মম	১০৯	মুন্সিগঞ্জে সারাটা দিন
জাফর সাদেক	১১৩	লোবুচে ইস্ট অভিযান
জেসমিন মুন্নী	১১৮	চীন ॥ পাহাড় ঝুঁকে পড়ে পদচিহ্নতলে
ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্	১২৩	হ্যালং বে
তৌফিক রহমান	১২৯	মেডানের যীশু
মাসরুর-উর-রহমান আবীর	১৩২	শিলাইদহ ও অন্যান্য রবীতীর্থ
মাহফুজুল হক জগলুল	১৪০	ঠাকুরাভো: প্রাগের রবীন্দ্র চত্বর
রওনক আফরোজ	১৪৯	বোম্বে বিচ: ক্যালিফোর্নিয়া
শাহনাজ আক্তার	১৫৬	টাঙ্গুয়ার হাওরের রুদ্ধশ্বাস দিন
সাইফুল ইসলাম রিপন	১৫৮	সীমানা পেরিয়ে
সেলিম সোলায়মান	১৬৭	রঙের শহরে ধোঁয়ায় শান্তি

পূর্ণাঙ্গ বই

জিকরুর রেজা খানম	১৮১	মোহময়ী মরক্কো

ছবিগদ্য

রফিকুর রহমান	২০৬	ক্যামেরার সুন্দরবন

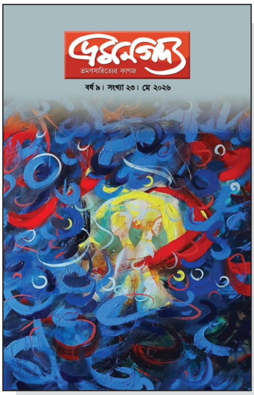

লেখা পাঠানোর নিয়ম

অভিজ্ঞতাময় ভ্রমণগদ্য পাঠানো সবার জন্য উন্মুক্ত

প্রথিতযশা ভ্রমণলেখকের পাশাপাশি নবীন ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখকদের লেখা সাদরে গৃহীত হয়

ইউনিকোড সমর্থিত ফন্টে ই-মেইলে সংযুক্ত করে লেখা পাঠাতে হয়

লেখার সঙ্গে ছবিতে ক্যাপশন সেভ করে ছবি পাঠাতে হবে

যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে যাতে লেখককে

সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো যায়

ব্যক্তিগত যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয়

প্রয়োজনে ভ্রমণগদ্যের পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা হয়

যোগাযোগ

E mail: bhromongoddya@gmail.com

https://www.facebook.com/Bhromongoddya

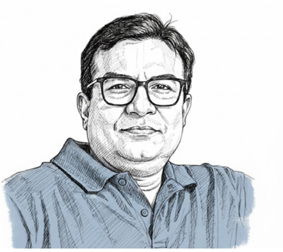

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওরফে এআই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। মানবমস্তিষ্ক শিল্পসৃজনে যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়ে আসছে সভ্যতার শুরু থেকে, এআই সেই তাবৎ মৌলিক সৃষ্টি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুঞ্জিভূত আঁধার হয়ে উঠেছে। বললেই সে কবিতা লিখে দেয়, সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে দেয়, ছবি আঁকে, স্কেচ করে। এ যেন আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত 'কুন, ফাইয়াকুন' এর মতো। অর্থ্যাৎ আল্লাহ যখন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন আদেশ দেন 'হও', তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়'। আমাদের ছোটবেলায় আলাদীনের চেরাগে লুকানো দৈত্যের কতো গল্প শুনেছি, নাটক-সিনেমায় দেখেছি। চেরাগে ঘষা দিলে দৈত্য প্রকট হয়ে মালিককে আদেশ করার মিনতি জানায়। কোন কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে সে মালিকের সামনে হাজির করে। এআই' অনেকটা তেমনই। কী-বোর্ড বা মাউসের কমান্ড পেয়ে সে আদেশ দাতার সামনে হাজির করে দেয় ভার্চুয়াল জগৎ। এমনকি তা মেঘদুনিয়ায় ভেসে থাকা বহুপ্রজন্মের মস্তিষ্ক সৃষ্ট বুদ্ধি-জ্ঞান-তথ্যের সারাৎসার।

খোদ পশ্চিমে যেসব মস্তিষ্ক এআই উদ্ভাবন করেছে, তারা স্বয়ং নিজ সৃষ্টির অভাবিত ফলাফলের জেরে আইটি জায়ান্ট থেকে নিয়ত চাকরি খোয়াচ্ছে। সহস্র মেধা ও মনন কর্পোরেটে দুনিয়াকে যে ডেলিভারি দেয়, এআই তা চোখের পলকে দিতে পারে। তাই চাকরি খোয়ানো এআই উদ্ভাবক-ব্যবহারকারীরা এখন অস্তিত্ব অন্বেষণে মেশিন লার্নিংয়ের দিকে ঝুঁকছে। কাজেই এআই আমাদের সমস্ত মানবীয় সৃজনশীলতাকে কেড়ে নেবে, কী নেবে না- তা আজকের বিশ্বে এক বড় বিতর্ক। যদিও বড় দার্শনিক সত্য হচ্ছে, সৃষ্টি কখনো স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

সভ্যতার নানা ধাপে নতুন শিল্পবিপ্লবের পর মানুষের শঙ্কা-আশঙ্কার ওপর দাঁড়িয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে, সময়ের ব্যবধানে আবার প্রশমিতও হয়। টালিখাতায় কষা হিসেবের বিপরীতে ক্যালকুলেটর আসার পর, হাতে লেখা নোটের বিপরীতে জেরক্স-ফটোকপি আসার পর, টেলিগ্রাম টাইপরাইটারের জায়গায় কম্পিউটার আসার পর, বই ঘেঁটে অনুসন্ধানের বদলে এক ক্লীকে লক্ষ বিষয় অনুসন্ধানের সুযোগ আসার পর, কিংবা রোবট মানুষের বহু জায়গা দখল করতে থাকলে-'গেল গেল, সব গেল' বলে রব ওঠে। সকল কালের অর্থডক্সের দৃষ্টিকোণে মানবীয় মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের হাহাকারধ্বণি শোনা যায়। প্রজন্মগত হাহাকারের মধ্যেও অতীতগন্ধী ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ নতুন আবিস্কারে পথে এগিয়েছে। কিছুই আসলে শেষ হয়ে যায় না, তা হয়তো পরিবর্তন মানে। কালের বিতর্ক সমাজ ও সভ্যতায় চোখ সওয়া কিংবা আত্মস্থ হয়ে গেলে মানুষ আবারও এগিয়ে যায় নতুন পথের বাঁকে। প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছেন "আমার পায়ের শব্দ শোনো, নতুন এ-আর সব হারানো পুরনো"। ভ্রমণগদ্য এই নতুন বাঁকের আজন্ম-আকাঙ্খী, যা এর নামলিপিতে নিহিত। কাজেই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে এআই'কে অঙ্গীভূত করে নিতে এক মূহুর্তও বিলম্ব করেনি এ কাগজ।

থ্যাংক গড, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাহিত্যের অন্য শাখার সৃজনশীলতার দিকে বিপুলবিক্রমে ধেয়ে গেলেও 'ভ্রমণগদ্য'কে পুরো সাবাড় করার সুযোগ পাবে না। আমাদের সৃজনশীলতায় মিশে আছে ভ্রমণের বাস্তবানুগ অণুষঙ্গ। কল্পনার ফানুস যতোই উড়াই, সশরীর ভ্রমণ ছাড়া স্থান কালিক ও মানবস্পর্শী ভ্রমণলেখা সৃজন সম্ভব না। এআই হয়তো, বরেণ্য বর্ষীয়ানদের প্রাত:স্মরণীয় বিপুল রচনা ঘেঁটে কিছু দাঁড় করাতে পারবে, কিন্তু তা ভ্রমণকারীর আন্তরিক অনুভূতিময় হওয়া অসম্ভব। ভ্রমণলেখকের লেখা, বাস্তবোচিত, স্থান কাল ঘটনার স্পর্শময় বর্ণনায় ভাস্বর এবং প্রাতিস্বিক। অতএব হে ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখকগণ, এআই যুগে আপনাদের ভয় নেই। চলুন এগিয়ে যাই প্রাতিস্বিক কণ্ঠস্বরে।

শুভভ্রমণ!

মাহমুদ হাফিজ

নৃত্যগীতে ভরপুর জলসার শেষ শোভাযাত্রা

মঈনুস সুলতান

সাতদিন হতে চলল, ফ্লোরিডায় নেটিভ আমেরিকান বা আদিবাসীদের মিউজিক ফেস্টিভ্যালে শামিল হয়ে ব্যতিক্রমী অঙ্গের নৃত্যগীতে রীতিমতো মশগুল হয়ে আছি। মনোজ্ঞ এ মাহফিলটি আয়োজিত হয়েছে মেলবোর্ন শহরের প্রান্তিকে, উইকাহাম নামক বিরাট পার্ক সংলগ্ন গাছ-বিরিক্ষ-হ্রদ ও হরিণে ভরপুর একটি উপবনে। আদিবাসীদের হরেক কিসিম গোত্র থেকে আগত নানা ধরনের সমঝদাররা উপবনে ক্যাম্পিংয়ের কায়দায় তাঁবু খাটিয়ে দিন গুজরান করছেন। আমি তাদের সাথে শরিক হয়ে ক্যাম্পগ্রাউন্ডে একটি তাঁবুতে ডেরা বেঁধেছি।

আজ জলসার শেষ দিন। ভোরবিহানে আমরা দল বেঁধে হেঁটে যাই, উপবনের ভেতর দিয়ে, সমুদ্রসৈকতকে নিশানা করে বেশ খানিকটা পথ। আমাদের পদযাত্রার গন্তব্য ছিল, অনেক যুগ আগে, গাছের কাণ্ড কুঁদে তৈরি হরেক রকমের প্রতীকে পরিপূর্ণ 'পিকটোগ্রাফ ট্রি' বা চিত্রিত একটি বৃক্ষ। পৌঁছানোর পর পরই আমাদের মতো পর্যটকদের আলোকচিত্র না তোলার অনুরোধ জানিয়ে আদিবাসীদের একজন শ্যামান বা পুরোহিত তন্ত্র-মন্ত্র ও ধূপধুনোয় পারফর্ম করেন ব্যাপক একটি রিচ্যুয়াল। ফেরার পথে খানিকটা সময় কাটাই সমুদ্রসৈকতে, যেখানে আদিবাসী কওমের কিছু সদস্য অবগাহন করে সেরে নেন সমুদ্রপ্রণাম।

চিত্রিত বৃক্ষের থান থেকে ফেরার পথে ভারি পেরেশান লাগে। তাই দলছুট হয়ে আস্তে-ধীরে একা ফিরছিলাম। ত্যাড়াবেড়া হয়ে চারদিকে ছড়ানো ডালওয়ালা একটি গাছের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ি। ডালপালার ধূসর বাকল ও বিরিক্ষটির কাণ্ড বেয়ে রীতিমতো চলাফেরা করছে সবুজ পাতার টুকরা-টাকরা।

উপর দিকে নজর দিতেই বুঝতে পারি, গাছটির কোনো পাতাই আর আস্ত নেই; খণ্ড-খণ্ড টুকরা নিপুণভাবে কেটে মরচে রঙের পিঁপড়াগুলো তা শুঁড়ে পাকড়ে ধরে তরতরিয়ে ছুটে যাচ্ছে নিচের দিকে। অনেকগুলো পিঁপড়া পত্রালির খণ্ড-বিখণ্ড লিলিপুটিয়ান মাপের পালটির কায়দায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরে অতিক্রম করছে সড়ক। তাদের কাতারবন্দী পদযাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখে সম্মোহনের ঘোর লাগে। এ প্রজাতির পিঁপড়াকে বলা হয় 'লিফ কাটার এন্ট', এদের কামড়ে তেজ প্রচুর, তাই তাদের সারিটি সাবধানে লাফিয়ে অতিক্রম করি।

বেশি দূর আগাতে পারি না, দুটি ছোট্ট কদ-এর পাখি লো-ফ্লাইটে আমার কানের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, রেকি করছে। স্বভাব-চরিত্রে এরা পিঁপড়াভুক হলে কিছুক্ষণের মধ্যে এ রকমের অন্যান্য পাখিরাও এসে যোগ দেবে, এবং পত্রবাহী পিঁপড়ার কলামটি নির্ঘাৎ আক্রান্ত হবে।

পরিচ্ছন্ন ট্রেইল ধরে হনহনিয়ে আগাচ্ছিলাম, পথের ধারে জটজুটধারী কৃষ্ণাঙ্গ এক তরুণকে হামাগুড়ি দিয়ে ছবি তুলতে দেখে থমকে দাঁড়াই। তার শরীরে জড়িয়ে থাকা অজগর সাপটি আমাকে দেখতে পেয়ে কুণ্ডলীর প্যাঁচ খুলে সরসরিয়ে এগিয়ে আসে। পড়ে থাকা গাছটির কাণ্ডে গজিয়েছে এক সারি কমলালেবু রঙের ছত্রাক। বিশেষ ধরনের লেন্সে এগুলোর ছবি তুলতে তুলতে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন, সাপটি নিরাপদ, 'প্লিজ হ্যাভ নো ফিয়ার।'

বেজায় দীর্ঘ একটি সাপ স্বভাব-চরিত্রে শান্তিবাদী সন্ন্যাসীর স্বগোত্র হলেও তাকে বিশ্বাস করার মতো হিম্মত আমার নেই। তো ফ্রিজ হয়ে দাঁড়িয়ে আবেদন জানাই, 'জেন্টলম্যান, অনুগ্রহ করে এটিকে সড়ক থেকে সরিয়ে গলায় পেঁচিয়ে নিন।' তিনি জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না, বরং আস্তে-ধীরে বিবিধ অ্যাঙ্গেল থেকে তুলতে শুরু করেন ব্যাঙের ছাতার আলোকচিত্র।

এ তরুণকে প্রথম আমি দেখি দিন তিনেক আগে, ফেস্টিভ্যালের মেলায় স্টল পেতে বসা হাত-দেখনেওয়ালি বৃদ্ধা মিসেস ক্রিস্টিনা স্মিথের সঙ্গে বাতচিত করার সময়। আজকে পদযাত্রায়ও ইনি শামিল হয়েছিলেন; সর্পাতঙ্কে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছি, এ মুহূর্তে এনাকে এড়ানো মুশকিল। তাই আওয়াজ দিই, 'কুড ইউ প্লিজ কন্ট্রোল ইয়োর স্নেইক?' তিনি সাড়া দেন, উঠেও দাঁড়ান, কিন্তু কিছু বলেন না; বরং প্রচুর সময় নিয়ে সাপটিকে জটাজুটের চারপাশে গামছার মতো করে প্যাঁচান, তারপর ফকফকে সাদা দাঁতে ভারি সুন্দর করে হেসে বলেন, 'আই হোপ, ইউ আর নট আ স্নেইক হেইটার?'

সাপ-খোপকে আমি দুশমন বিবেচনা করি, এটা খোলাখুলি বললে তিনি যদি-বা অজগর লেলিয়ে দেন, তাই সতর্কভাবে বলি, 'না, সাপকে ঘৃণা করতে যাব কেন?' বাক্যটি শেষ করতে পারি না, তিনি 'দ্যাটস গুড' জাতীয় আওয়াজ দিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'লেট মি ইন্ট্রোডিউস ইউ মাই পিস লাভিং স্নেইক, এর নাম হচ্ছে ইরাবতী, বর্মা থেকে বাচ্চা-বয়সে এদেশে এসেছে, ইন আ সেন্স আ গুড একজাম্পল অব আ পিসফুল ইমিগ্র্যান্ট, লিঙ্গ পরিচয়ে মাদি, সোমত্থ হয়েছে তবে এখনো খোকাখুকু হয়নি,' বলে ভদ্রসন্তান কান-ছে-কান অবধি চোয়াল বিস্তৃত করে হেসে ফের জানান, 'ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার স্নেইক, কারো কোনো অনিষ্ট করে না, নিজের মতো করে বাগানের একটি নিচু ডাল পেঁচিয়ে শুয়ে-বসে সময় কাটায়।'

এ ধরনের বিবৃতি শোনার পর সৌজন্যসূচক কিছু বলতে হয়, তাই বলি, 'জেন্টলম্যান, ভাবছি, এ রকম হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিস লাভিং একটি সাপ পেলে পুষতাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না সস্তায় অজগর কোথায় পাওয়া যেতে পারে?' জবাবে ভদ্রসন্তান খুশি হয়ে ফের ফকফকে সাদা দাঁতে হেসে বলেন, 'দ্যাটস গুড, আই অ্যাম গ্ল্যাড, আই ক্যান হেল্প ইউ টু ফাইন্ড আ রাইট কাইন্ড অব স্নেইক।' অনেকটা বাধ্য হয়ে আমি তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত মুঠো করে ঝাঁকাঝাঁকিতে পরিচিত হই। একসাথে আগ বাড়তে বাড়তে কিঞ্চিৎ কথাবার্তাও হয়।

সর্পপ্রিয় এ তরুণের নাম ওমারিও জেহেইম। তার পরিবার ছয়ের দশকের পয়লা দিকে জ্যামাইকা থেকে ফ্লোরিডাতে এসে সেটেল্ড হয়েছেন। ইনি 'সায়েন্স অব সিনারি' বিষয়ে ডক্টরেট লেভেলে গবেষণা করছেন।

আমি সিনারি বা দৃশ্যপটের সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, এর পেছনে যে বিজ্ঞানের কায়কারবার আছে অতশত বুঝি না। একটা ব্যাপার ওমারিও জোর দিয়ে বলেন, দৃশ্যপটের সাথে গতিশীলতার যোগাযোগটা বুঝতে পারা নাকি অত্যন্ত জরুরি। বিষয়টা আমার মাথায় সহজে ঢোকে না, তবে প্রতি মুহূর্তে যে প্রকৃতিতে পরিবর্তন হচ্ছে, এ নিয়ে তিনি যে দুটি দৃষ্টান্ত হাজির করেন, তাতে ভাবনা-চিন্তার একটু খোরাক পাই।

তিনি জানান, চিত্রিত বৃক্ষের থানে যাওয়ার পথে তিনি পড়ে থাকা এই গাছের ছবি তুলেছিলেন, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাতে গজিয়েছে কমলালেবু রঙের ছত্রাক; লিফ কাটার পিঁপড়াগুলো যে গাছটির পাতা কেটে তছনছ করেছে তার ছবি তিনি যখন তুলেছেন, তখনও তাদের দেখতে পাননি। ছোট্ট এ দুটি পরিবর্তন বনানীর দৃশ্যপটকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে গুণগতভাবে, এ বাবদে তিনি ছবি তোলার মারফতে এইমাত্র সংগ্রহ করলেন প্রামাণ্য ভিজ্যুয়াল ডেটা।

'ইউ ডিড সামথিং ইন্টেলেকচুয়ালি সো ইন্টারেস্টিং,' বলে ওমারিও জেহেইমের তারিফ করতে যাই, কিন্তু ওসব খেজুরে আলাপে না জড়িয়ে তিনি কাজের কথায় এসে সরাসরি সওয়াল করেন, 'সো, ইউ ওয়ান্ট আ স্নেইক, আর ইউ শিওর

অ্যাবাউট ইট?' ছুড়ে দেওয়া তীর ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো কুদরত নেই, তাই কণ্ঠস্বরের কপটতা গোপন রেখে মিনমিনিয়ে জবাব দিই, 'ইয়েস, আই হ্যাভ সাম ইন্টারেস্ট ইন রেপাইলস।'

জেহেইম সিরিয়াস মুখে গুছিয়ে এ বাবদে জরুরি কিছু তথ্য দেন। ফ্লোরিডায় বসবাসরত অনেক সিনিয়র সিটিজেন জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীতে তাঁদের নাতিপুতির কাছ থেকে উপহার পান বার্মিজ পাইথন বা অজগর সাপ। বয়সজনিত রোগে-শোকে কাহিল হলে এঁনারা আর সাপের দেখভাল করতে চান না, অনেকেই গোপনে এগুলো এভারগ্রেইড এলাকায় ওয়েটল্যান্ডে রিলিজ করে দেন।

হালফিল ওই এলাকায় নাকি শত-সহস্র সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এদের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেছে। তো ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ডিপার্টমেন্ট এ সাপগুলো দত্তক দেওয়ার জন্য লোক খুঁজছেন। ওদের ওয়েবসাইটে খোঁজ করলে বা টেলিফোন করলে সহজেই স্বত্বাধিকারী হওয়া যাবে আকারে-প্রকারে লম্বা-চওড়া একটি সরীসৃপের। কথা বলতে বলতে আমরা এসে পড়েছি ক্যাম্পগ্রাউন্ডের কাছে। আমি ওমারিও জেহেইমকে গুডবাই বলি। তিনি যে আমাকে তাঁর পোষা সাপটি মাগনা গছিয়ে দেননি, এ জন্য স্রষ্টার কাছেও শুকরিয়া জানাই।

বেলা পড়ে এসেছে, লাঞ্চের বিক্রি-বাট্টা শেষ হয়েছে ঘণ্টা তিনেক আগে, ফুড-কার্টগুলোর ঝাঁপি বন্ধ। অপরাহ্নের সমাপ্তি অধিবেশন এখনো শুরু হয়নি। তো ক্যাম্পগ্রাউন্ডের ভেতর দিককার কোনাকুনি পথটি ধরে তাঁবুর দিকে রওনা হই।

একটি পিকনিক টেবিলে ছড়িয়ে রাখা সসে-জারিত চিকেন, কাটা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ও হ্যামবার্গার। মনে হয়, আয়োজন চলছে বৈকালিক বার্বিকিউর। কাছেই গাছের ডালে টাঙানো দড়ির হ্যামকে অন্তরঙ্গভাবে আধশোয়া এক যুগল স্পর্শ করছে পরস্পরের শরীর। তাদের তলা দিয়ে পিকনিক টেবিলের দিকে ছুটে আসে ছোট্ট একটি কুকুর। সে আমাকে দেখতে পেয়ে একটু থেমে লেজ নাড়ে, কুকুরটিকে চেনা মনে হয়, তখনই সে লাফিয়ে উঠে টেবিল থেকে চিকেনের টুকরাটি মুখে পুরে ছুটে যায় ঝোপের দিকে। কিঞ্চিৎ খুঁড়িয়ে ছোটার ভঙ্গি থেকে এবার সারমেয়টিকে স্পষ্টভাবে শনাক্ত করতে পারি।

জ্যাক রাসেল প্রজাতির শিকারে সুদক্ষ এ কুকুরটির নাম গিজমো। এর গৃহস্থ মিসেস গুডস্তন বেনথামের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। সাভানা শহরের যে সিনিয়র সেন্টারে আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করি, ওখানে মিসেস বেনথাম ব্রিজ খেলতে আসেন। আশি বছর বয়সের এ অবসরপ্রাপ্ত পাইলট কান্ট্রি ক্লাবেও যান প্রতি উইকেন্ডে। মাঝেমধ্যে মার্টিনি পানে মাতাল হলে, বাত-ব্যধিতে কাহিল শরীরটি বাঁকিয়ে বৈঠা মারার কায়দায় ড্যান্সও করে থাকেন।

মিসেস বেনথামও আজকের সমাপ্তি অধিবেশনে শামিল হতে ছুটে এসেছেন, গিজমোর উপস্থিতি থেকে তা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই, এ মহিলা আদিবাসীদের সংগীত পছন্দ করেন; এ ধরনের

বাদ্যবাজনা ব্যবহারের মারফত মিউজিক থেরাপি নিতে পারলে যে উদ্বেগ লাঘব হয়, নিস্তার পাওয়া যায় দুশ্চিন্তা থেকে, এ ব্যাপারটা তিনি সকলকে বলে বেড়ান।

মাস ছয়েক হলো পার্কিনসন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর হাত মারাত্মকভাবে কাঁপে, তাই নিজে আর ড্রাইভ করতে পারেন না, তবে গান-বাজনার মাহফিল হলে উবার পাকড়ে ওখানে গিয়ে হাজির হন। তো আজকেও হয়তো চেনা কারো গাড়িতে লিফট নিয়ে এখানে এসেছেন; গিজমো হচ্ছে তাঁর থেরাপি ডগ, কুকুরটি সদাসর্বদা তাঁর সঙ্গেই থাকে, তাই তারও এখানে আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না; তবে থেরাপি ডগের চিকেন ছিনতাইয়ের কাণ্ডটি গ্রহণযোগ্য নয়। উইকাহাম পার্কে অনেকেই পোষা কুকুর, বিড়াল বা খরগোশ নিয়ে এসেছেন, এদের বকলশে বেঁধে-ছেঁদে রাখাই রেওয়াজ, আওয়ারা ঘুরতে দেওয়া সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূত। ধরা পড়লে পার্ক-রেঞ্জারদের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার সম্ভাবনা।

গিজমো চিকেনটি সাবাড় করে ফের পিকনিক টেবিলে চড়ে মাংসের টুকরা গাঁথা শিকটি মুখে তুলে, আমাকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে অতঃপর পাশ দিয়ে গিয়ে ঢোকে ঝোপে। যে দম্পতি বার্বিকিউর আয়োজন করে হ্যামকে সওয়ার হয়েছেন, তারা দিনদুপুরে পরস্পরের শরীর নিয়ে এমন ব্যস্ত আছেন যে, তাদের হুঁশিয়ার করে দিতে গিয়ে আমি নিজেই শরমিন্দাবোধ করি। এর একটা বিহিত করতে হয়, তাই মিসেস বেনথামের তালাশে মিউজিক মজমার মঞ্চের কাছাকাছি দোকানপাটগুলোর দিকে রওনা হই।

তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে— বেশ বড়সড় একটি দোতলা বাড়িতে সম্পূর্ণ একা বসবাসরত এ বৃদ্ধার বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবি। এক সময় ছোটখাটো কমার্শিয়াল বিমানে ইনি পাইলটি করতেন। সত্তর দশকের পয়লা দিকে কৃষি বিভাগের ওষুধ ছিটানো ‘ক্রপ ডাস্টার’ নামক উড়োজাহাজ চালাতেন। তখন ক্র্যাশে পড়লে চাকরি থেকে অবসর নেন, আহত হওয়ার কারণে আর্থিক খেসারতও পান।

বছর দেড়েক আগে উনার দ্বিতীয় দফা স্ট্রোক হয়। সজ্ঞাহীন হালতে কিচেন ফ্লোরে পড়েছিলেন। গিজমো নাকি পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে প্রতিবেশীর বাড়িতে ছুটে যেতে চেষ্টা করে। তাদের পাশাপাশি বাড়ি দুটির লন কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিভক্ত। গিজমো ছিদ্র গলে পড়শির বাড়িতে যাওয়ার পথে পায়ে কাঁটা বিঁধে জখম হয়। সে থেকে কুকুরটি খুঁড়িয়ে চলাফেরা করছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, গিজমো প্রতিবেশীর বারান্দায় উঠে প্রথমে বিস্তর ডাকাডাকি করে, তারপর তার জামাকাপড় ধরে টানাটানি করলে তিনি ৯১১ নাম্বারে কল দিয়ে পুলিশকে ইনফর্ম করেন। পুলিশ মিসেস বেনথামকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়, এতে রক্ষা পায় মহিলার জীবন।

যারা নিঃসঙ্গ হালতে দিনযাপন করছে, তাদের জিন্দেগিতে কুকুর পোষার ফায়দা সম্পর্কে মিসেস বেনথাম সিনিয়র সেন্টার ও কান্ট্রি ক্লাব প্রভৃতি জায়গার বাদবাকিদের অবগত করতে চান। এরা সকলেই মাসে অন্তত একবার সোসাইটি ম্যাগাজিনের পাতা উল্টান। ওখানে হামেশা মুদ্রিত হয় পার্টি-পরব, তিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী

কিংবা ভাটি বয়সে সপ্তমবার বিবাহিত হওয়া সচিত্র সংবাদ। একটি দুটি ফিচারও ছাপা হয়।

আমার লেখক হিসেবে পরিচিতির উপর ভরসা করে মিসেস বেনথাম অনুরোধ করেন, ঘটনাটি অনুলিখনের মারফত ম্যাগাজিনে প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করতে। আমি রাজি হই, কিন্তু গোল বাঁধে গিজমো সংক্রান্ত ফিচারটি ড্রাফট করা নিয়ে। মিসেস বেনথামের সঙ্গে এ বাবদে আমার ঘণ্টা দেড়েক বাতচিত হয়। তাতে আমি তাঁর বৈমানিক ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছু চমকপ্রদ উপাত্ত পাই; এ ছাড়া এক জামানায় এ বৃদ্ধা রক অ্যান্ড রোলের বাদ্যবাজনায় মশগুল হয়ে টুইস্ট ড্যান্সে যেভাবে শক্তপোক্ত পুরুষদের ঘায়েল করতেন, সে সম্পর্কেও জোটে লোমহর্ষক ডেটা।

তিনি তাবৎ কিছু রচনার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। সোসাইটি ম্যাগাজিনের পরিসর ছোট, ওখানে জোর শ পাঁচেক শব্দে কেবলমাত্র গিজমোর ঘটনা লিপিবদ্ধ করলে মুদ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; উড়োজাহাজ উড়ানো কিংবা টুইস্ট ড্যান্সে তাঁর দক্ষতা নিয়ে কিছু লিখতে গেলে অতিক্রম করতে হয় ওয়ার্ড লিমিটের গণ্ডি। মহিলাকে অতশত বোঝানো যায় না, তাই ফিচারটি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই, তাঁকে লোকেট করতে না পেরে বিরক্ত লাগে। তখনই আমার মাথায় একটি আইডিয়া খেলে যায়, ভবিষ্যতে আমি যখন একটি ডিটেকটিভ নভেল লিখব, তখন চরিত্র হিসেবে মিসেস বেনথামকে অন্তর্ভুক্ত করার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ওখানে ক্রপ ডাস্টার জাতীয় উড়োজাহাজে কীটনাশকের ছালার ভেতর পুঁটলি ভর্তি কোকেন রাখার বন্দোবস্ত থাকবে। তারপর উড়াউড়ির শেষে, এয়ারপোর্ট সংলগ্ন নাইট ক্লাবে টুইস্ট ড্যান্সের সময় আবগারি দ্রব্যটি পাচার হয়ে ঢুকে যাবে দুর্ধর্ষ চেহারার এক পুরুষের ফারকোটের পকেটে।

গিজমো পার্ক-রক্ষীদের হাতে গ্রেফতার হবে, বিষয়টা আমাকে উদ্বিগ্ন করে। তো আমি ফের মিসেস বেনথামের সুলুক-সন্ধান করি। ফুড-কার্টগুলো খোলেনি, এদিকে লোকজনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না; মনে হয় সকলেই তাঁবু কিংবা ক্যাম্পার ভ্যানে ফিরে গেছে, নাকি আজকের ফিনালে বা সমাপ্তি অধিবেশন আয়োজিত হচ্ছে পার্কের ভিন্ন দিকে, যেখানে সকলে জড়ো হয়েছেন? পকেট খুলিবিলি করেও আজকের প্রোগ্রাম-অ্যাজেন্ডাটি খুঁজে পাই না।

তো এদিক-ওদিকে এলোমেলো দৃষ্টিপাত করে হাঁটি। প্লাস্টিকের একটি টেবিলে সাজিয়ে রাখা বি-হাউস বা মৌমাছি লালন-পালনের উপযোগী কয়েকটি ঘর। আবহাওয়া পরিবর্তন কিংবা কীটনাশকজনিত পলিউশনের কারণে এতদঞ্চল থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে মৌমাছির একাধিক প্রজাতি। ফলে খেতখামারে পরাগায়নের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভীষণভাবে ভাটা পড়েছে।

এ সংকটের শিকার হয়েছেন বাগান করনেওয়ালা শৌখিন ফুলচাষীরা। তারা এ ধরনের মৌমাছির ঘর কিনে নিয়ে গাছে ঝোলান, তাতে পোষেন 'মেসন' নামে

মানবদেহে হুল ফোটানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী এক বিশেষ প্রজাতির মৌমাছি। শ্যামলবরণ একটি তরুণী শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে ছোট্ট একটি বি-হাউসে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছে। আমার কৌতূহলী দৃষ্টিপাতে সচেতন হয়ে সে চোখ তুলে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না, কেমন যেন কৌতূহল নিয়ে মেয়েটি আমাকে স্টাডি করে। তার গণ্ডদেশ ও থুতনিতে জ্যামিতিক চিহ্নের মতো বেশ কতগুলো দাগ, তাতে মনে হয় অনায়াসে মেয়েটির মুখচ্ছবি দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক জার্নালের প্রচ্ছদ করা যায়।

আমি 'হ্যালো দেয়ার' আওয়াজ দিলে সে সিং-সং ভয়েসে জানতে চায়, 'মে আই হেল্প ইউ?' আমি মিসেস বেনথামের বর্ণনা দিয়ে জানতে চাই, এ ধরনের কাউকে সে দেখেছে কি না? মেয়েটি প্রশ্ন করে, 'বৃদ্ধা কি পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলেন?' 'ইয়েস, দ্যাটস রাইট, আমি তাঁকেই খুঁজছি।'

সে আমাকে ইশারায় সামান্য দূরের লুকআউট টাওয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'তিনি ছবি তুলছিলেন, হঠাৎ করে খেয়াল হয়েছে তাঁর ছোট্ট কুকুরটি সাথে নেই। আপসেট হয়ে খুঁজতে খুঁজতে টাওয়ারের দিকে চলে গেছেন।' আমি তৎক্ষণাৎ ওই দিকে রওনা হই। না, টাওয়ারের কাছেও তাঁকে পাই না।

চতুর্দিকে ছোটাছুটি করতে করতে মিসেস বেনথামের ছবি তোলার বাতিক নিয়ে আমি ভাবি। ত্রিসংসারে স্বজন বলতে বোধ করি তাঁর কেউ আর বেঁচে নেই, তাই নিঃসঙ্গতা প্রকট হলে তিনি আদ্যিকালের একটি পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে চোখের সামনে যা পান তার ছবি তোলেন। এ ধরনের ক্যামেরার একটি সুবিধা হচ্ছে, স্ন্যাপশট নেওয়ার মিনিট দেড়েকের ভেতর প্রিন্টআউট পাওয়া যায়। মহিলা ছবি তুলেই ক্ষান্ত হন না, তা কান্ট্রি ক্লাব বা সিনিয়র সেন্টারে গিয়ে জানাশোনাদের দেখান; তাঁদের মুখ থেকে ফটোগ্রাফির তারিফ না শুনলে মুখখানা আমসি করে অর্ডার করেন ডাবল মার্টিনির। আমি তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে পোলারয়েড পিকচারের প্রশংসা করার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিই।

বেশি দূর যেতে হয় না, হ্রদপাড়ের একটি বেঞ্চে বসে কাঁপা হাতে পোলারয়েড ক্যামেরাটি সাপটে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন মিসেস বেনথাম। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করে বলি, 'প্লিজ কাম কুইকলি উইথ মি।' অতঃপর খানিক হাঁটাহাঁটি করে গিজমোকেও সহজে লোকেট করা যায়। সে বার্বিকিউর জন্য মশলামাখা চিকেন ও হ্যামবার্গের একাধিক টুকরা সাবাড় করে দিব্যি খেশমেজাজে আছে। হ্যামকে শুয়ে থাকা দম্পতি ধ্যান ধরে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন, সম্ভবত নীরবে একে অপরের মনের খোঁজখবর নিচ্ছেন; গাছতলায় পড়ে আছে বিয়ারের কতগুলো খালি ক্যান, হাওয়াবাতাস উতল হয়ে আছে হাশিশের পাংজেন্ট গন্ধে।

গিজমোকে জড়িয়ে ধরে মিসেস বেনথাম চোখ কটমট করে আমার দিকে তাকান। তাঁর উষ্মার কারণ হচ্ছে, কুকুরটির বয়স সাড়ে বারো, ভুগছে কিডনির অসুখে; ভেটেরিনারি ডাক্তার তাকে মাছ-মাংস পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ

ধরনের চিকিৎসা-বিধান বাস্তবায়িত করার কোনো দায়িত্ব আমার উপর বর্তায় না; ঠিক বুঝতে পারি না বৃদ্ধা কেন আমার উপর খেপলেন?

তিনি কাঁপা হাতে কুকুরটির একটি স্ন্যাপশট নেন; ছবির প্রিন্টে ধীরে ধীরে— লেজ ও পেছন দিককার পা দুটি বাদে একটি কুকুরের খণ্ডিত আলোকচিত্র উদ্ভাসিত হতে থাকে। আমি পোলারয়েড ক্যামেরার কারিকুরির দিকে সম্ভবত ড্যাবড্যাবিয়ে তাকাচ্ছিলাম, তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে শ্লেষ্মা জড়ানো কণ্ঠে বলেন, 'আই নিড সাম প্রাইভেট টাইম উইথ গিজমো।' ধাতানি খেয়ে আমি চুটপাট পিছু হটি; রাজসড়কের দিকে যেতে যেতে ভাবি, কারো উপকার করার সম্ভাব্য সমস্যা বিষয়ে কখনো কিছু লিখলে এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

মঞ্চের পরিসর থেকে ভেসে আসে জোরালো ড্রাম বিট। বুঝতে পারি, ফিনালে বা সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হতে যাচ্ছে। তো ওই দিকে পা চালাই। কে বা কারা সড়কের পাশে বিলবোর্ডের কায়দায় টাঙিয়ে দিয়েছেন দুটি পোস্টার। একটি পোস্টারে প্রাক-কলম্বাস যুগে আদিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভুট্টা, শিমের বীজের মতো এক ধরনের বিন ও স্কোয়াশের তেলরঙে আঁকা চিত্র। এ শস্য তিনটি 'থ্রি সিস্টারস' নামে পরিচিত। পাশেই সূর্যমুখী ফুলের ঝাড় হাতে দাঁড়ানো লাজুকমতো একটি বালিকার ছবি।

এতে সম্ভবত ব্যবহৃত হয়েছে ছোট্ট একটি মেয়ের আলোকচিত্র। আদিবাসী সংস্কৃতিতে সূর্যমুখী ফুলকে 'ফোর্থ সিস্টার' বা 'চতুর্থ বোন' বলে ডাকা হয়। এ ফুলের বীজকে তারা হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবহার করছেন খাদ্য হিসেবে। দূরের যাত্রা কিংবা যুদ্ধের ময়দানে পেষা বীজে তৈরি পিঠা প্রোটিনযুক্ত খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আমি সূর্যমুখীর ঝাড় জড়িয়ে ধরে দাঁড়ানো ভারি মিষ্টি চেহারার বালিকার ছবিটির দিকে দিশা ধরে তাকাই, ভীষণ আশ্চর্য লাগে!

উত্তর আমেরিকায় স্থানীয় এই ফুলটির খবর কিন্তু কলম্বাসের আমেরিকাতে পৌঁছানোর আগে বাদবাকি বিশ্ব তথা ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকায় বসবাসরত কোনো মানুষের জানা ছিল না। আমেরিকার আদিবাসীদের কোনো কোনো সম্প্রদায় এ ফুলকে সূর্যদেবতার প্রতিবিম্ব বিবেচনা করে ব্যবহার করে থাকে তাদের সানড্যান্স পরবে।

মঞ্চের পরিসর থেকে এবার ভেসে আসছে অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্রের সমাহারে তৈরি হৃদয়প্লাবী ঐক্যতান। মনে হয়, আছড়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে শত শত আয়না, তারপর উতরোল আওয়াজ মৃদু হতে হতে চেতনার এমন এক স্তরে পরশ বুলিয়ে যায় যে, আমি কল্পনা করি সংগীত কলাকারবৃন্দ এবার আয়নার ভাঙাচোরা টুকরা-টাকরা সাবধানে তুলে নিয়ে একত্রিত করে ফিরে যাচ্ছেন সুরলহরীর মসৃণ ঐক্যতানে।

কয়েক কদম সামনে যেতেই দেখি, ঠেলাগাড়িতে কাঠের বি-হাউসগুলো জড়ো করে রেখে, চোখ দুটি আধবোজা করে সুইং ড্যান্সের কায়দায় শরীর হেলিয়ে— ঈষৎ দুলে দুলে ড্যান্স করছে মৌমাছির ঘর-নির্মাতা মেয়েটি।

আমার চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে, তরুণীর একহারা দেহে খেলছে সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল দীপ্তি। আমি তাকে অতিক্রম করে যেতে যেতে ভাবি, আজ থেকে পঞ্চান্ন কিংবা ষাট বছর পর তার দেহমনে থাকবে কি নৃত্যের উদ্যম? চারুচঞ্চল মুদ্রা ফোটানো হাত দুটি কি অকারণে থেকে থেকে কম্পমান হবে, নাকি তখনও সক্ষম থাকবে সতেজ সঞ্চালনে? মনে হয় এ রকম কৌতূহলের উত্তর জানার আমার কোনো সুযোগ হবে না।

যন্ত্রসংগীতের সুরলয়ে ফের পরিবর্তন আসে। মারাকাস ও হ্যান্ডড্রামের আওয়াজে এবার যুক্ত হয় ঢোলকের দ্রিমি দ্রিমি তাল। দেখি, মঞ্চে জড়ো হওয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের সিনিয়র সিটিজেনরা বৃত্ত রচনা করে শরীরে ধারণ করছেন নৃত্যপ্রয়াসী ছন্দ। ড্যান্স করতে করতে অতঃপর তাঁরা এক সারিতে নেমে আসেন ঘাসে। জমায়েত থেকে অনেকেই তাঁদের সঙ্গে শরিক হয়ে তৈরি করছেন নৃত্যরত একটি মিছিল।

শোভাযাত্রাটি সামনে বাড়ে। দর্শক-শ্রোতারাও যোগ দিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আমিও শামিল হই। পেছন দিকে অনেকেই ঠিক ড্যান্স করছেন না, তবে সুরছন্দের সঙ্গে সংহতি বহাল রেখে নীরবে আগে বাড়ছেন। হ্যান্ডমাইকের ঘোষণা থেকে জানতে পারি, উইকাহাম পার্কের বাউন্ডারির বাইরের ভূখণ্ড, যা বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে আবাসিক এলাকায়, তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে আন-মার্কড 'ট্রেইল অব টিয়ার্স'-এর খানিকটা পথ। এক জামানায় নির্দিষ্ট কিছু আদিবাসী গোত্রের পূর্বপুরুষদের ওই পথ ধরে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে— পেছনে অস্ত্রধারী সৈনিক লেলিয়ে দিয়ে পথ চলতে বাধ্য করা হয়েছিল। আদিবাসীরা ঘটনাটির স্মরণে আজ নিজ উদ্যোগে স্বাধীনভাবে ওই বিলুপ্ত পথরেখাটির কিয়দংশ মাড়াবেন।

পুরো মিছিলটি বাউন্ডারি অতিক্রম করে ঢুকে পড়ে পড়ো জংলা-মতো জায়গায়। আমার ঠিক সামনে হাঁটছেন 'ফোর সিস্টারস' বা ভুট্টা, বিনস, স্কোয়াশ ও সূর্যমুখী ফুলের ছবি আঁকা টি-শার্ট পরা অ্যাথলেটিক দেহের এক তরুণ। তাঁর লোহিত বর্ণের বুটজুতো ও কপালে বাঁধা ব্যান্ডেনা বা ফেটিতে সাংকেতিকভাবে কিছু লেখা। আমি ওই দিকে বারবার তাকাচ্ছি, বিষয়টি আঁচ করতে পেরে যুবক মাথা ঝুঁকিয়ে বাও করে যেন আমার কৌতূহলকে আমলে আনেন। আমি মৃদুস্বরে, 'হাই, মে আই আস্ক… হোয়াট এক্সাক্টলি ইজ রিটেন ইন ইয়োর শুজ অ্যান্ড ব্যান্ডেনা?' তিনি নি-পকেট থেকে তুলে আমার হাতে একটি লিফলেট ধরিয়ে দেন, তাতে চেরোকি গোত্রের বর্ণমালার চার্টটির পাশে দেওয়া হয়েছে ইংরেজি হরফে উচ্চারণ। অতঃপর যেতে যেতে ফিসফিসিয়ে বলেন, ব্যান্ডেনা ও বুটজুতায় লাল রঙে চেরোকি ভাষায় লেখা, 'মনে রেখেছি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের রক্তপাত।'

আমি সরে গিয়ে চারপায়ার লাঠিতে ভর দেওয়া এক বৃদ্ধাকে পথ করে দিই। তাঁর গায়ে জড়ানো জ্যাকেটে এমব্রয়ডারিতে লেখা, 'পথশ্রম কিংবা অত্যাচারে আমার যে পূর্বপুরুষরা নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের মৃত্যু হয়নি, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে

আছেন আমার অন্তরে।' তাঁর পাশে পাশে হাঁটছে বেণীর ডগায় ব্লু-বার্ডের তীব্র নীল পালক ঝোলানো এক কিশোরী। আমি তার টি-শার্টের পেছনে লেখা বাক্যটিও খেয়াল করে পড়ি, 'বৃক্ষলতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাইবোনদের মতো; আমরা যখন মনোযোগ দিয়ে শুনি, তখন তাদের নীরব ভাষা বুঝতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।'

আমরা জংলামতো জায়গা অতিক্রম করে চলে আসি আবাসিক এলাকার রাজসড়কে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নাগরিকরা হাততালি দিয়ে মিছিলকে স্বাগত জানান। দূরে পার্ক করা পুলিশ কারের পাশে দাঁড়িয়ে একজন অফিসার চলমান গাড়িঘোড়াকে ইশারায় অন্যদিকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মিছিল সড়কের কিনার ধরে প্রায় নীরবে আগ বাড়বে।

অংশগ্রহণকারী আদিবাসী নন এ রকম শ্রোতা-দর্শকরা— ট্রেইল অব টিয়ার্সের ট্র্যাজিক ঘটনার স্মৃতির প্রতি সম্মানবশত ছবি তোলা থেকে বিরত থাকেন। তবে আবাসিক এলাকার কিছু নাগরিক ফোল্ডিং চেয়ার পেতে বসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি পর্যবেক্ষণ করছেন; তাদের কেউ কেউ হাত নেড়ে হাসিমুখে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেলফোনে তুলতে শুরু করেন মিছিলের ফটোগ্রাফস।

পথপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন হাত নেড়ে, 'লাভ ইউ গাইজ' বলে, দুআঙুলে 'ভি' চিহ্ন তৈরি করে, থেকে থেকে হাততালি দিয়ে বা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে ভারি উষ্ণভাবে মিছিল করনেওয়ালাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। চলতে চলতে আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বিষয়ে আমি সচেতন হই। এক জামানায় এই মানুষদের পূর্বপুরুষরা পিঠে সৈনিকদের ছুড়ে দেওয়া চাবুকের আঘাত নিয়ে, ফোসকাপড়া রক্তাক্ত পায়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সড়কে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিলেন।

না, আমাদের বেশি দূর হাঁটতে হয় না। মিছিল প্রতীকী পরিক্রমা শেষ করে বাঁক নিয়ে আস্তে-ধীরে ফেরার জন্য ঢোকে জংলামতো ডাঙায়।

সিসিলির পথে প্রান্তরে

আবু জুবায়ের

জানুয়ারির শেষ বেলা। প্যারিসের আকাশটা সেদিন হয়তো একটু বেশিই ধূসর ছিল, ঠিক যেমনটা উত্তর ইউরোপের শীতকালে হয়। আমি, ফারজানা আর আনাহিতা—তিনজন মিলে যখন প্যারিস থেকে উত্তর দিকে 'বুভে' বিমানবন্দরের দিকে রওনা দিলাম, তখন মনে একরাশ রোমাঞ্চ আর কিছুটা শীতের জড়তা। এই বুভে বিমানবন্দরটি তার সাদাসিধে অবয়ব নিয়ে যেন অলিখিত সংকেত দেয়, এখান থেকেই শুরু হয় সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে খোঁজার যাত্রা। রায়্যান এয়ারের ডানা যখন আমাদের নিয়ে ভূমধ্যসাগরের নীলিমার দিকে ভাসল, তখন জানালার ওপারে মেঘের কারুকাজ ছাপিয়ে মনের কোণে সিসিলির ইতিহাস উঁকি দিচ্ছিল।

সিসিলি শুধু একটি দ্বীপ নয়, ইতিহাসের এক আশ্চর্য ল্যাবরেটরি। যে মাটিতে ফিনিশীয়, গ্রিক, রোমান, আরব আর নরম্যানদের পদচিহ্ন একে অপরের ওপর মিশে গেছে, সেখানে পা রাখা মানেই কয়েক হাজার বছরের এক নিরবিচ্ছিন্ন সময়যাত্রায় শামিল হওয়া। পালেরমোতে যখন আমরা পা রাখলাম, তখন প্রথম ধাক্কাটা দিল তার বাতাস। শীতের জানুয়ারি হলেও সিসিলির বাতাসে তখন এক অদ্ভুত উষ্ণতা আর নোনা জলের ঘ্রাণ।

পালেরমোর রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, শহরটা যেন কোনো এক বৃদ্ধা রাজকন্যার মতো, যার পরনের রেশমি পোশাকে শত তালি মারা, কিন্তু তার

আভিজাত্য এক চুলও কমেনি। পালেরমোর ইতিহাসে আরবরা যখন দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করত, তখন তারা এই শহরকে সাজিয়েছিল বাগিচা আর ফোয়ারা দিয়ে। আজও এখানকার গলিতে হাঁটলে সেই 'বালারো' বাজারের শোরগোলে বা স্থাপত্যের খাঁজে খাঁজে সেই সারাসেনিক ছোঁয়া চোখে পড়ে। আমরা যখন পালেরমোর অলিগলি পেরিয়ে একটু ভেতরের দিকে যাচ্ছি, আনাহিতার চোখে তখন কৌতূহল, আর ফারজানা মগ্ন হয়ে দেখছিল পাথুরে দেওয়ালের অদ্ভুত কারুকাজ।

আনাহিতা তার আঙুল তুলে যখন সেই দেওয়ালে আঁকা নূহের নৌকার গল্প বা আদম-ইভের চিত্রগুলো দেখাচ্ছিল, তখন মনে হলো ইতিহাস সেখানে আর কেবল বইয়ের পাতা নয়, জীবন্ত এক ক্যানভাস।

সিসিলির এই পাথুরে জমিন রক্ত আর গৌরবে ভেজা। একসময় গ্রিকরা এখানে গড়ে তুলেছিল তাদের মন্দির, যার ধ্বংসাবশেষ আজও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচীন স্থাপত্য হিসেবে গণ্য। তারপর এল রোমানরা, যারা এই দ্বীপকে বানিয়েছিল সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার। কিন্তু পালেরমোর আসল ম্যাজিকটা লুকিয়ে আছে তার নরম্যান আমলের গির্জা আর প্রাসাদগুলোতে। বিশেষ করে 'মনরিয়েল' বা পালেরমো ক্যাথেড্রালের সেই স্বর্ণখচিত মোজাইকগুলো যখন জানুয়ারির বিকেলের রোদে ঝিকমিকিয়ে ওঠে, তখন মনে হয় যেন ঈশ্বর নিজেই সোনায় মুড়ে দিয়েছেন এই মর্ত্যলোককে। বাইজেন্টাইন শিল্প, আরবীয় জ্যামিতি আর নরম্যান কাঠামোর এমন অপূর্ব সহাবস্থান পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় সম্ভব ছিল না।

পালেরমোর কোলাহল ছাপিয়ে আমরা যখন আশেপাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকালাম, চোখে পড়ল মাইলের পর মাইল লেবু আর কমলার বাগান। জানুয়ারির সিসিলি মানেই এই সোনালী ফলের সমারোহ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট বাড়িগুলো যেন কোনো শিল্পীর আঁকা ফ্রেম। দূর থেকে ভেসে আসা ভূমধ্যসাগরের ঢেউয়ের শব্দে মিশে আছে ট্র্যাজেডি আর কমেডি, ঠিক যেমনটা এখানকার মানুষের জীবন। তারা যেমন গম্ভীর, তেমনই মিশুকে।

আমাদের এই ভ্রমণে সিসিলি যেন তার ইতিহাসের ধুলোমাখা বইটা আমাদের সামনে আলগোছে খুলে ধরল। প্রতিটি মোড়ে কোনো না কোনো রাজা বা আক্রমণকারীর গল্প, প্রতিটি চার্চের নিচে চাপা পড়ে থাকা প্রাচীন কোনো মন্দিরের ভিত্তি। পালেরমোর সেই ঘিঞ্জি গলির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর ফারজানা অনুভব করছিলাম, এই দ্বীপটা আসলে একটা প্রকাণ্ড আয়না, যেখানে ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ভাঙাগড়ার ইতিহাস প্রতিবিম্বিত হয়। আর আনাহিতা সেই ইতিহাসের বিশালতা হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারছিল না, কিন্তু সিসিলির রোদ আর ধুলোয় মাখা সেই প্রাচীনত্বের স্বাদটা ঠিকই তার স্মৃতিতে গেঁথে যাচ্ছিল। এভাবেই

জানুয়ারির এক শান্ত দুপুরে পালেরমোর বুকে আমাদের পরিবার নিয়ে শুরু হলো এক মহাকাব্যিক পথচলা, যার রেশ রয়ে যাবে বহুদিন।

সেদিন পালেরমোর সেই শতাব্দীপ্রাচীন পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল, শহরটা যেন কেবল ইটের ওপর ইট গেঁথে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়েছে একের পর এক সভ্যতার অবশেষ দিয়ে। ফারজানা পাশে হাঁটছিল, আর আনাহিতার চোখ তখন রাস্তার ধারের জিলাতোর দোকানের দিকে। জানুয়ারির সিসিলি খুব একটা তপ্ত নয়, বরং এক স্নিগ্ধ আবহাওয়া চারদিকে। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম পালেরমোর সেই প্রখ্যাত প্যালাতাইন চ্যাপেলের (Palatine Chapel) সামনে।

এই চ্যাপেল বা গির্জাটি সিসিলির সেই স্বর্ণালি সময়ের সাক্ষী, যখন এখানকার নরম্যান রাজারা আরবীয় কারিগরদের দিয়ে তাঁদের রাজপ্রাসাদ সাজাতেন। ভেতরে ঢুকতেই এক মায়াবী নিস্তব্ধতা আমাদের ঘিরে ধরল। ওপরের দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়—ছাদ থেকে ঝরে পড়ছে খাঁটি সোনার মোজাইকের দ্যুতি। বাইজেন্টাইন যিশুর গম্ভীর মুখাবয়ব যখন ওপর থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক তখনই তার নিচে দেখা যায় আরবীয় জ্যামিতিক নকশা। ইসলামের জ্যামিতি আর খ্রিস্টধর্মের মূর্তিশিল্পের এমন কোলাকুলি পৃথিবীর আর কোথায় দেখা যাবে? ফারজানা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সেই সূক্ষ্ম কাজ, আর আমি ভাবছিলাম—এই তো সেই সিসিলি, যেখানে ধর্ম বা দেশকাল বড় কথা নয়, বড় কথা হলো সুন্দরের সাধনা।

> **সিসিলি মানেই তো কেবল সুন্দরের আরাধনা নয়, এ হলো সেই দ্বীপ যেখানে পা রাখলে মহাকালের পদধ্বণি শোনা যায়।**

পালেরমো থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ি চড়াই পেরিয়ে আমরা যখন মনরিয়েল (Monreale)-এর দিকে রওনা হলাম, তখন রাস্তার দু-পাশে জানুয়ারির রোদে ঝকঝক করছিল মাইলের পর মাইল অলিভ আর কমলার বাগান। মনরিয়েল শহরটি যেন পাহাড়ের ওপর এক নির্জন দুর্গ। সেখানকার ক্যাথেড্রালটি দেখে মনে হলো যেন কোনো জাদুকর তার জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে বিশাল এক সোনার পাহাড়কে গির্জায় রূপ দিয়েছে। ছয় হাজার বর্গমিটারেরও বেশি এলাকা জুড়ে কেবল মোজাইকের কাজ। আনাহিতা তার আঙুল তুলে যখন সেই দেওয়ালে আঁকা নূহের নৌকার গল্প বা আদম-ইভের চিত্রগুলো দেখাচ্ছিল, তখন মনে হলো ইতিহাস সেখানে আর কেবল বইয়ের পাতা নয়, জীবন্ত এক ক্যানভাস।সিসিলি মানেই শুধু পাথর আর মোজাইক নয়, সিসিলি মানে হলো তার মানুষের জীবন। আমরা যখন পাহাড় থেকে নিচে পালেরমোর বন্দরের দিকে তাকালাম, দেখলাম ভূমধ্যসাগর তার সবটুকু নীল নিয়ে বিছিয়ে রয়েছে। এই সেই সমুদ্র, যা দিয়ে একসময় ফিনিশীয় বণিকরা আসত, যার বুক চিরে ক্রুসেডারদের জাহাজ যেত পবিত্র ভূমির দিকে।

জানুয়ারির শীতের বিকেলে আমরা পালেরমোর 'পিয়াজ্জা প্রেতোরিয়া'র ধারে বসলাম। চারপাশে তখন গোধূলির আলো আর প্রাচীন মূর্তিদের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে। পাশেই কোনো এক ক্যাফে থেকে ভেসে আসছিল সিসিলিয়ান লোকগান। সেই সুরের মধ্যে এক গভীর বিষাদ আছে, আবার আছে বেঁচে থাকার অদম্য জেদ। মাফিয়াদের সেই অন্ধকার দিনগুলোর গল্প আজ ফিকে হয়ে এসেছে, এখন পালেরমো যেন তার পুরনো আভিজাত্য নিয়ে আবার জেগে উঠতে চাইছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আমরা হোটেলের দিকে ফিরছি, তখন ফারজানা একটা কথা বলল, "এই শহরটা যেন কোনো একটা অসমাপ্ত কবিতা।" কথাটার সত্যতা সেদিন হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলাম। প্যারিসের ছক-কাটা জ্যামিতিক সৌন্দর্যের চেয়ে সিসিলির এই অগোছালো, রুক্ষ অথচ প্রাণবন্ত রূপটা আমাদের মনের অনেক বেশি গভীরে দাগ কেটে যাচ্ছিল। পালেরমোর প্রতিটি গলির বাঁকে যেন এক একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য।

মানুষ চলে যায়, সাম্রাজ্য ধুলোয় মেশে, কিন্তু এই পাথরগুলো কীভাবে সময়ের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে?

পালেরমোর ঘিঞ্জি অলিগলি আর রাজকীয় গির্জাগুলোর গাম্ভীর্য পেছনে ফেলে আমরা যখন মন্ডেলো (Mondello)-র দিকে এগোলাম, তখন আকাশ আর সমুদ্রের নীল মিলেমিশে একাকার। প্যারিসের কনকনে জানুয়ারির সেই ধূসরতার সাথে এই রোদেলা সিসিলির কোনো তুলনাই চলে না। ফারজানা বলছিল, "কে বলবে এটা শীতকাল? মনে হচ্ছে বসন্তের কোনো এক অলস দুপুর।"

মন্ডেলো এককালে ছিল মৎস্যজীবীদের গ্রাম, আজ তা পালেরমোর সবচেয়ে অভিজাত সৈকত। বালুকাবেলার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের সেই বিখ্যাত 'কুবো' (The Charleston) যা সমুদ্রের ওপর ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের জল এখানে এতটাই স্বচ্ছ যে তলার নুড়ি পাথরগুলোকেও গোনা যায়। আনাহিতা সৈকতে বালু নিয়ে খেলায় মত্ত, আর আমরা দুজনে সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় খুঁজে পাচ্ছিলাম এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

কিন্তু সিসিলি মানেই তো কেবল সুন্দরের আরাধনা নয়, এ হলো সেই দ্বীপ যেখানে পা রাখলে মহাকালের পদধ্বনি শোনা যায়।

পালেরমোর ঠিক বাইরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট পেলেগ্রিনো। গ্যেটে এই পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "The most beautiful promontory in the world"। আমরা যখন আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম, তখন পায়ের

নিচে পুরো পালেরমো শহরটা যেন এক খেলনা নগরী হয়ে ধরা দিল। একপাশে টাইরেনিয়ান সাগরের অসীম বিস্তার, আর অন্যপাশে কনকা দ'অরো বা 'সোনার উপত্যকা'।

সেখান থেকে আমরা গেলাম সিসিলির এক রহস্যময় অধ্যায়ের দিকে—সেজেস্তা (Segesta)। পালেরমো থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল গ্রিক মন্দির। অবাক করা বিষয় হলো, হাজার বছর পার হয়ে গেলেও এই মন্দিরের ছত্রিশটি ডোরিক স্তম্ভ আজও অবিচল। অথচ এই মন্দিরটির ছাদ কোনোদিন তৈরিই হয়নি, ইতিহাসের কোনো এক অজানা কারণে এর নির্মাণকাজ মাঝপথে থেমে গিয়েছিল। ফারজানা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে বিড়বিড় করে বলছিল, মানুষ চলে যায়, সাম্রাজ্য ধুলোয় মেশে, কিন্তু এই পাথরগুলো কীভাবে সময়ের সাথে লড়াই করে টিকে থাকে?

মন্দিরের পাথরে হাত রাখলে এক অদ্ভুত শিহরণ হয়—মনে হয় যেন প্রাচীন গ্রিসের কোনো দার্শনিক বা যোদ্ধা ঠিক এই পাথরটিই ছুঁয়েছিলেন কয়েক হাজার বছর আগে।

বিকেলের দিকে আমরা ফিরলাম পালেরমোর এক প্রাচীন ক্যাফেতে। সিসিলির ভ্রমণ পূর্ণ হয় না যদি না এখানকার 'ক্যানোলো' (Cannoli) আর 'অ্যারানচিনি'র স্বাদ নেওয়া যায়। সেই মুচমুচে পেস্ট্রির ভেতরে মিষ্টি রিকোটা পনিরের পুর আর ওপরে ছড়ানো পেস্তা—এ যেন এক স্বর্গীয় আস্বাদ। আমি ভাবছিলাম, এই যে আরবরা এখানে লেবু আর চিনির চাষ শুরু করেছিল, তারই তো বিবর্তিত রূপ আজকের এই বিশ্ববিখ্যাত সিসিলিয়ান মিষ্টি।

> **ভ্রমণ তো কেবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নয়, ভ্রমণ হলো নিজেকে চেনা। সিসিলির এই রুক্ষ মাটির ঘ্রাণ আর ইতিহাসের ভার আমাদের ভেতরটাকে যেন খানিকটা বদলে দিয়ে গেল।**

জানুয়ারির সূর্য যখন পালেরমোর বন্দরে ডুব দিচ্ছিল, তখন দিগন্তজুড়ে সিঁদুরে মেঘের আভা। ধ্বংসের ভেতরেও এক অদ্ভুত শিল্প থাকে। প্রতিটি ভাঙা দেওয়াল, প্রতিটি জীর্ণ অট্টালিকা এখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে নিজের আভিজাত্যের কথা ঘোষণা করে। পালেরমোর এই কয়েকদিনের অবস্থান আমাদের জীবনের ডায়েরিতে এক অমলিন অধ্যায় হয়ে রইল। রায়্যান এয়ারের সেই ছোট্ট বিমানে চড়ে আসা সার্থক হলো যখন দেখলাম আনাহিতা ঘুমের ঘোরেও হাসছে—হয়তো ওর স্বপ্নে তখন সিসিলির সেই রূপালী সমুদ্র আর সোনার ক্যাথেড্রালগুলো ডানা মেলছে।

আরবরা এনেছিল সেচ আর জ্যামিতি, গ্রিকরা এনেছিল দর্শন আর নাট্যশালা, আর নরম্যানরা এনেছিল রাজকীয় গাম্ভীর্য। এই সবকিছুর নির্যাসই হলো আজকের সিসিলি—যেখানে প্রতিটি জীর্ণ দেওয়াল আভিজাত্যের কথা বলে।

ভ্রমণ তো কেবল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া নয়, ভ্রমণ হলো নিজেকে চেনা। সিসিলির এই রুক্ষ মাটির ঘ্রাণ আর ইতিহাসের ভার আমাদের ভেতরটাকে যেন খানিকটা বদলে দিয়ে গেল।

আমরা একটা স্থানীয় রেস্তোরাঁয় বসলাম। আমাদের পাতে এল 'পাস্তা আল্লা নরমা' (Pasta alla Norma)—সিসিলির নিজস্ব স্বাদের পাস্তা, যাতে আছে ভাজা বেগুন, টমেটো আর নোনতা রিকোটা পনিরের স্বাদ।

প্যারিসের বুভে বিমানবন্দরে যখন আবার ফিরে এলাম, সিসিলির সেই রোদটা যেন আমাদের গায়ে লেগে ছিল আরও কয়েকটা দিন। আনাহিতা তার ব্যাগে ভরে নিয়ে এসেছিল সমুদ্রের কয়েকটা ঝিনুক, আর আমাদের মনে রয়ে গেল হাজার বছরের পুরনো এক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি।

ট্রেনের জানালার বাইরে দিয়ে যখন সেফালু আর পালেরমোর সেই আদিম পাথুরে পাহাড়গুলো দ্রুত পেছনে সরে যাচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল আমরা যেন কোনো এক জাদুকরের ডায়েরি থেকে বেরিয়ে আসছি।

যাত্রার শেষ লগ্নে এসে মনে হলো, সিসিলি আমাদের শিখিয়েছে যে ইতিহাস মানে কেবল যুদ্ধ বা জয়-পরাজয় নয়; ইতিহাস হলো সংস্কৃতির সেই পাঁচফোড়ন যা শত শত বছর ধরে ধীর আঁচে রান্না হয়। আরবরা এনেছিল সেচ আর জ্যামিতি, গ্রিকরা এনেছিল দর্শন আর নাট্যশালা, আর নরম্যানরা এনেছিল রাজকীয় গাম্ভীর্য। এই সবকিছুর নির্যাসই হলো আজকের সিসিলি—যেখানে প্রতিটি জীর্ণ দেওয়াল আভিজাত্যের কথা বলে।

জাঁস্কার ভ্যালি

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভ্রমণে গিয়ে প্রথমবার কোনো জায়গা দেখলেই আমাদের ভেতরের রোমান্টিক মনটা ডুকরে ওঠে—"আহা! এই তো সেই স্বপ্নসুন্দরী, এটাই জীবনের সেরা আবিষ্কার!" কিন্তু মুশকিল হলো, পরের গন্তব্যে পা রাখা মাত্রই সেই 'সেরা' তকমাটা পুরনো খবরের কাগজের মতো খসে পড়ে।

তবুও পুরনো জায়গাগুলো পুরোপুরি ডিলিট হয়ে যায় না। স্মৃতির আলমারিতে ঠিক সেই পুরনো শার্টটার মতো গুটিয়ে থাকে—যা ছোট হয়ে গেছে জেনেও আমরা ফেলি না, মাঝেমধ্যে আলমারি গুছোতে গিয়ে হঠাৎ বের করে একটু গায়ে দিয়ে দেখি 'ফিট' হচ্ছে কি না! তাই সুরু ভ্যালির সেই মায়াবী দৃশ্যগুলো যখন আস্তে আস্তে ব্যাকস্টেজ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন মঞ্চে রাজকীয় এন্ট্রি নিল আমাদের নতুন হিরো—পাদুম। ভাবখানা এমন, যেন সুরু ভ্যালি ছিল জাস্ট 'ওপেনিং অ্যাক্ট', আসল ধামাকা তো এই পাদুম সাহেব!

পাদুম, জাঁস্কারের সদর শহর। পদ্মসম্ভবের নাম থেকে নামকরণ—মানে আধ্যাত্মিক ব্র্যান্ডিং তখনও দাপটের সঙ্গে চালু ছিল। একসময় রাজধানীও ছিল দুটো—একটা এখানে, আরেকটা জাংলায়। কারগিল থেকে ২৩৫ কিমি আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে আসতে হয়। এখন আবার নতুন নিম্মু-পাদুম দারচা হাইওয়ে হচ্ছে। দেখে মনে হলো শিগগিরই গুগল ম্যাপে পপ-আপ আসবে—"Shortcut available!"

শহরের চারদিকে কার্শা, স্টংডের মতো প্রাচীন মঠ, আর ছাদর ট্রেক এখান থেকেই শুরু। পাহাড়ের বুক থেকে ঝরনা নেমে আসছে টলমল করে—যেন প্রকৃতি ফ্রি এয়ার-কন্ডিশনার চালু করে দিয়েছে।

গাড়ি ছুটছে, আমি জানালায় মুখ গুঁজে ভাবছি—"এই এক পাহাড়ে চার ঋতুর কম্বো-অফার চলছে নাকি?" এমন সময় পেছন থেকে ডাক এল—"এই, নামতে হবে!" আমি হকচকিয়ে বললাম—"প্রকৃতির ডাক, না টয়লেট ব্রেক?"

নামতেই দেখি চারপাশে নির্জন অথচ মন-ভোলানো পাহাড়। প্রকৃতির ডাক ভুলে গিয়ে সবাই রাস্তায় বসে পড়ল। একেবারে ঝটপট পিকনিক! কেউ সেলফি তুলছে, কেউ আবার পোজ দিয়ে বলছে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অ্যাঙ্গেলটা একদম জমে গেছে, এখন দিচ্ছি ক্যাপশন 'মাউন্টেন ভাইরাস'।" আমার তো মনে হলো, রাস্তাই বুঝি নতুন ক্যাফে—চেয়ার নেই, টেবিল নেই, কিন্তু ফ্রি-ফাইভস্টার মুড ঠিকঠাক!

এরপর কেউ বলল—"চলো খেয়ে নিই, সাড়ে বারোটা বাজে।" অন্যজন জবাব দিল—"ও মা! পেটের অ্যালার্ম আর ঘড়ির অ্যালার্ম একসাথে বাজছে।"

ড্রাইভার শিরিন, স্থানীয় ছেলে, এমন আত্মবিশ্বাসে বলল—"চলুন, সামনে রেস্টুরেন্ট আছে।" শুনে মনে হলো খোদ গুগল ম্যাপও ওর কাছ থেকে লোকেশন শিখেছে। আমার তো মনে হচ্ছিল যদি জিজ্ঞেস করি—"এই রুক্ষ পাহাড়ে কোথাও ফুচকার দোকান আছে?" ও চোখ বন্ধ করে বলে দেবে—"দশ কিলোমিটার এগিয়ে বাঁদিকে।"

অবশেষে আধঘণ্টা পর একখানা দোকান দেখা গেল। দেয়ালে বোর্ড ঝোলানো—"লা হিমালয়া রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড গেস্ট হাউজ।" নাম শুনে ভাবলাম প্যারিসের ফাইভ-স্টার, ঢুকেই দেখি তিনটে বেঞ্চি আর আধভাঙা টেবিলের মেলা।

কাউন্টারে বসা লোকটা দেখে মনে হলো বহুদিন আগেই জল-মিলন পর্ব বাদ দিয়েছে। তবুও সে খাতায় অর্ডার লিখছে এমন ভঙ্গিতে—যেন খোদ সম্রাট অশোকের শিলালিপি খোদাই করছে। তবে দোকানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ খাবার নয়—বাথরুম আছে! খবরটা শুনেই সবাই দৌড়ে গেল, যেন ওটাই তীর্থযাত্রার মূল মন্দির।

আমি খাবার খেতে চাইছিলাম না, শীলা কিছু অর্ডার দিল। হঠাৎ দেখি—এক আধুনিক যুবতী ল্যাপটপ খুলে দিব্যি কাজ করছে। গন্ডগ্রামে এই দৃশ্য দেখে মনে হলো আমি ভুল করে গুগলের অফিসে ঢুকে পড়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, "নেট কোথায় পেলেন?" সে হেসে বলল—"হটস্পট।" আমি হতাশ হয়ে মনে মনে বললাম—"আমারও যদি হটস্পট থাকত, এই ভ্রমণকাহিনী না লিখে লাইভ টেলিকাস্ট করতাম!"

আলাপ জমল। জানা গেল, তিনি দু-বছরের জন্য একটা প্রজেক্টে এসেছেন। গবেষণার বিষয়—পরিবেশ আর স্থানীয় জীবজন্তু। শুনে হাঁ—এখানে স্নো লেপার্ড, বেয়ার, মানুষের সঙ্গে তাদের সহাবস্থান! ভাবলাম, আমরা পাহাড় দেখে ফটো তুলেই খুশি, এরা আবার টিকটিকি-মশা পর্যন্ত নিয়ে রিসার্চ করে!

বেরিয়ে দেখি—এক আমেরিকান ও এক ইংলিশ কাপল বাইকে চড়ে এসেছে। ভাবলাম, আমরা বিদেশে গিয়ে নাকে রুমাল চেপে ঘুরি, আর বিদেশিরা এদেশে এসে ধুলো-ধোঁয়া, খচ্চর, ভেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে হেসে খুশি।

শেষমেশ মনে হলো—'লা হিমালয়া'ই আসল রেস্টুরেন্ট। এখানে খাবারের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা, অবাক হওয়া আর নিজেকে প্রশ্ন করার মতো মুহূর্ত ফ্রি পাওয়া যায়!

এখান থেকে সামনেই রংদুম মনাস্ট্রি— মোটে সাত কিলোমিটার। শুনতে যত সহজ, পৌঁছতে গিয়ে হাঁপ ধরলে যেন পাহাড় নিজেই দাঁড়িয়ে হেসে বলে, "কী হলো, এখনই হাঁটু কাঁপছে?" রংদুম মঠ আসলে একেবারে চিনি-লাউফের মতো খাড়া পাহাড়চূড়ায় বসানো বৌদ্ধ গুরুজনদের "সিক্রেট হেডকোয়ার্টার"। গেলুগপা সম্প্রদায়ের এই তিব্বতি মঠ দাঁড়িয়ে আছে ৪,০৩১ মিটার (১৩,২২৮ ফিট) উচ্চতায়— যেখানে নিঃশ্বাস নিতে গেলে বুক বলে ওঠে, "বাবা রে, একটু অক্সিজেন ধার দাও তো!"

পাশেই ছোট্ট জুলিডক গ্রাম— নামে ছোট, কিন্তু ঠিকানা মনে রাখার মতো। আর মাত্র ২৫ কিমি দূরে পেনসি লা, যেখানে ওঠার পথে হাঁটু প্রায়শই ইউনিয়নের মতো ধর্মঘট ডাকে। ২০১৭ সালে সূর্যদেব নিজেই এসে বিদ্যুতের যোগান দিলেন— সৌরশক্তিতে মঠের ঘরে ঘরে আলো জ্বলল। ইতিহাসও মজাদার— রাজা সেওয়াং নামগ্যাল ও (১৭৫৩–১৭৮২)-এর আমলে গ্যালেক ইয়াশি তাকপা সাহেব এই মঠ বানিয়ে গিয়েছিলেন। মানচিত্রে সুরু ভ্যালি হলেও, মনের দিক দিয়ে সে পুরো জাঁস্কারি—শরীর একদিকে, মন অন্যদিকে!

ভাগ্যিস ওপরে ওঠার পরেই লোকজন জানাল—"এখানকার উচ্চতা ৪০৩১ মিটার, মানে ১৩,২২৮ ফিটেরও ওপরে।" আগে যদি বলত, তাহলে অন্তত একটু প্রাণায়াম কোর্স সেরে নেওয়া যেত। এখন শুনছি, সামনে যেখানে যাচ্ছি তার উচ্চতা নাকি ১৬,০০০ ফিট! খবরটা কানে আসতেই বুক বলল, "তুই পারবি তো?" আর হাঁটু বলল, "আমাদের ছাড়!"

পেনসি লা পাস—রংদুম মঠ থেকে মোটে ২৫ কিমি দূরত্ব। সুরু ভ্যালির একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মঠই যেন গেটকিপারের মতো ইশারা করছে—"চল, এবার জাঁস্কারে ঢুকি।" তাই মানসিক প্রস্তুতি শুরু হলো, ভাবলাম এ একেবারে ১৬,০০০ ফিট ক্লাবের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প। অবশেষে যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন

অবশ্য চোখ-মুখ এমন হাঁ হয়ে গেল যে মনে হলো ভেতরে পুরো চক্ষু চড়কমেলা বসে গেছে!

পেনসি লা পাসের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে হঠাৎই যেন এক স্বপ্নের দরজা খুলে যায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে দুই যমজ হ্রদ— লাং টিসো (Lang Tso) ও স্তাত টিসো (Stat Tso)। এই পাসই জুড়ে দিয়েছে জাঁস্কার উপত্যকার রুক্ষ অথচ মায়াময় সৌন্দর্যকে সুরু উপত্যকার নীরব বিস্তৃতির সঙ্গে।

লাদাখের নাম শুনলেই আমাদের মনে পড়ে যায় তুষারাবৃত পাহাড়, আকাশছোঁয়া নিস্তব্ধতা। কিন্তু এই দুই হ্রদ সেই সৌন্দর্যকে যেন অন্য মাত্রা দেয়। নির্মল, স্বচ্ছ জলরাশির বুক জুড়ে জাঁস্কারের তুষারশৃঙ্গের প্রতিবিম্ব আঁকা—যেন প্রকৃতির হাতে লেখা এক শাশ্বত কবিতা।

জীবনানন্দ দাশের পঙ্‌ক্তি কানে বাজতে থাকে—

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে— এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়।"

দিনের আলোয় হ্রদের নীল রঙ বদলে যায় মুহূর্তে মুহূর্তে— কখনও গভীর নীলা, কখনও বা সবুজাভ। চোখে এখন শুধুই বিস্ময়। হাতে ক্যামেরা থাকলেও বারবার মনে হয়— এই সৌন্দর্য ছবি দিয়ে ধরা যায় না, কেবল অনুভবেই তা ধরে রাখা যায়। লাং টিসো ও স্তাত টিসো— এই দুই হ্রদ শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়, তারা যেন ভ্রমণকারীর হৃদয়ে চিরন্তন প্রশান্তির দুই অক্ষর, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ ডায়েরির দুটি নীল পৃষ্ঠা।

শিরিন তাড়া দেয়, চলুন চলুন আরও ভালো জিনিস দেখাবো, কে জানে সেখানে গিয়ে আবার বলে না বসেন আমরা এখানেই থাকবো। গাড়িতে বসে পড়লাম। গাড়ি চলে আবার পাহাড়ি পথ ধরে। লক্ষ্য ড্রাং-ড্রুং গ্লেসিয়ার।

ড্রাং-ড্রুং হিমবাহ কোনো "দুটি হ্রদের" পাশে নয়—এটি আসলে জাঁস্কার অঞ্চলের গর্ব, এক বিশাল বরফের নদী। ২০১০ সালের পর থেকে এর পশ্চাদপসরণের ফলে সম্মুখভাগে গড়ে উঠেছে এক নীলাভ প্রোগ্লেশিয়াল লেক—যেন হিমবাহের বুকের সামনে প্রকৃতির গোপন আয়না।

প্রায় ২৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই বরফশিরা চোখে পড়ে কার্গিলজাঁস্কার সড়ক ধরে আসতে আসতেই, পেন্সি লা পাস পার হওয়ার পরপরই। প্রথম দর্শনে মনে হয়—পাহাড়ের বুকের উপর শুয়ে আছে অনন্ততার সাদা স্রোত। সেই মুহূর্তে খুব

স্বাভাবিকভাবেই কানে যেন বাজে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

“আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।” কিন্তু এই নদী জলের নয়— এটি বরফের, শাশ্বত ও মহিমান্বিত।

ওমশিলার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও মনের ভেতর তখন পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারের রিল ঘুরছে। শরীরটা হয়তো হোটেলের ঘরে, কিন্তু আত্মাটা তখনও ওই পেন্সি লা-র বরফ-নদীতে স্কি করছে!

হিমবাহের দিকে তাকিয়ে চোখ ভরে ওঠে বিস্ময়ে। কী করব বুঝতে পারছি না। বসবো, শুধু দেখবো, নাকি ছুটবো, তার কাছে গিয়ে ছুঁয়ে আসব তাকে, কানে কানে বলে আসব তাকে আমার মনের অবস্থাটাকে।

এই বরফনদী, এই নীল হ্রদ, এই নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়ে ড্রাং-ড্রং যেন প্রকৃতির অক্ষয় কবিতা। ভ্রমণকারীর বুক থেকে তখন শুধু একটাই আর্তনাদ বেরোয়—এত সৌন্দর্য, এত বিস্ময়—এ পৃথিবীতে চোখ মেলে দেখার সুযোগ পেলাম বলেই জীবন সার্থক। কিন্তু ইচ্ছে না থাকলেও এই বিস্ময় ছেড়ে আবার এগোতে হলো পরের জন্য, আমরা যে যাযাবর সেখানে এই আকর্ষণের মূল্য কতটুকুই বা।

শিরিনকে হাঁক দিলাম এবার কোথায়? চলুন নিয়ে যাচ্ছি জংখুল মঠে। জংখুল মঠ বা জংখুল গোম্পা লাদাখের জাঁস্কার অঞ্চলের স্টড উপত্যকায়, পাদুম শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সানি মঠের মতোই এটি তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের দ্রুক্‌পা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাচীনকাল থেকেই জংখুল মঠ খ্যাতনামা যোগীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে সুপরিচিত। এটি এক প্রশস্ত উপত্যকার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে উমাসি-লা নামের একটি পাসের পথ শুরু হয়। এই পাসই জাঁস্কার ও কিস্তোয়ারকে যোগ করেছে। পাহাড়ের গায় বেশ উঁচুতে মঠটি। আহামরি কিছু নয় তবে ওই যে পাহাড়ে চড়ার একটা অজানা তাগিদ! সেই উৎসাহ যোগায়। শিরিন মাঠ ঘাট নদী নালা পেরিয়ে এক সময় এসে হাজির করল মঠের কাছে। যথারীতি অনেকেই পাহাড়ে চড়তে অনিচ্ছুক। আমি, সোমালি, রুদ্র, শর্মিষ্ঠা, নীলাঞ্জনা, সুমিত ও সুশান্ত এগিয়ে চললাম পাহাড়ের সেই মঠের দিকে কিন্তু বেশ খানিকটা চড়ার পর জানা গেল মন্দির খোলা নেই। অগত্যা সেখানেই দাঁড়িয়ে প্রকৃতির দৃশ্য, ছবি তোলার পর্ব শেষ করে নেমে এলাম।

কিন্তু মঠের আসল হিরো হলো শিলাজিৎ। পথে পাহাড়ের গায় যেখানে সেখানে কালো আলকাতরার মতো দাগ দেখলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম—“এতো কনস্ট্রাকশন! দাগ কাটল নাকি কেউ?” শিরিন হেসে বলল—“না না, এ সব প্রকৃতির দান, এগুলো শিলাজিৎ।” শুনে মনে হলো—ওরে বাবা! পাহাড়ের মধ্যেই তো ফার্মাসি! এখানকার শিলাজিৎ এত বিখ্যাত যে সবটাই বাইরে চলে যায়।

শিলাজিৎ বহু প্রাচীনকাল থেকেই আফগানিস্তান, ভারত, ইরান, চীন, নেপাল, মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও তিব্বতে লোকজ ও বিকল্প চিকিৎসায় ব্যবহৃত। চার হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অসুখের নিরাময়ের কাজে লাগছে। অ্যারিস্টটল, রাজি, বিরুনি, ইবনে সিনা—সবার লেখাতেই শিলাজিতের কথা। ১৭ শতকে ডি’হারবেলট বলেছিলেন, পারস্যবাসীরা ভাঙা হাড় সারাত মুমিয়া ব্যবহার করে।

সন্ধ্যের আবছা আলো নামতেই আমরা গুটিগুটি পায়ে এগোলাম আমাদের আস্তানা—পাদুমের 'ওমশিলা' হোটেলের দিকে। শরীরের হাল তখন বেশ শোচনীয়; হাঁটু দুটো রীতিমতো ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার জন্য তৈরি, আর ফুসফুস বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সে ৮,৯০০ ফুটে থাকতে অভ্যস্ত নয়!

দাঁত কিড়মিড় করে যখন হোটেলের সিঁড়ি ভাঙছি, তখন মনে হচ্ছিল—কে যেন আমার হাড়ের জয়েন্টে গ্রিজের বদলে আঠা লাগিয়ে দিয়েছে। তবুও অদ্ভুত ব্যাপার, সেই ক্লান্ত মুখেও একটা ‘আহ্লাদে’ আটখানা হাসি লেগেছিল। কারণ, আমরা বুঝে গিয়েছিলাম— আমাদের রক্তে এখন কোনো হিমোগ্লোবিন নয়, বরং জাঁদরেল এক “মাউন্টেন ভাইরাস” বাসা বেঁধেছে!

এই ভাইরাসের কোনো ওষুধ নেই, কোয়ারেন্টাইনও নেই। এর একমাত্র লক্ষণ হলো—যতবার শরীর বলবে ‘আর পারছি না’, মন ততবারই গুগল ম্যাপ খুলে বলবে ‘সামনে আর কী আছে?’ তাই

ওমশিলার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েও মনের ভেতর তখন পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চারের রিল ঘুরছে। শরীরটা হয়তো হোটেলের ঘরে, কিন্তু আত্মাটা তখনও ওই পেন্সি লা-র বরফ-নদীতে স্কি করছে!

লেক প্লিটভিস: জাদুকরী জলের জগৎ

ফরিদুর রহমান

জ্যাডার থেকে লেক প্লিটভিস ন্যাশনাল পার্কের পথে যাত্রা সমুদ্রের নীল জলের শহর থেকে দুপাশের ধূসর পাহাড়ের গায়ে সবুজ বনভূমি আর ছোট ছোট গ্রামের চলমান ছবির ভেতরের দিয়ে শেষে এক জাদুকরী জলরাজ্যে পৌঁছানো।

শুরুটা হয়েছিল সাত সকালে। ট্যুর অপারেটরের নির্দেশনা অনুসারে নগর দেয়ালের প্রথম তোরণ পার হয়ে একটা কফিশপের সামনে থেকে মিনিবাস ছেড়ে যাবার কথা। জায়গা মতো দাঁড়ালাম, কিন্তু না, কোথাও কেউ নেই। মিনিট পাঁচেক পরে গাইড স্টিফেনসহ গাড়ি এসে দাঁড়ালেও দুজন সহযাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে হলো। বাঙালির চেয়ে ধীরগতির মানুষ পৃথিবীতে আছে ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। অবশেষে শেষ দুজন এসে উঠে পড়লে নির্ধারিত সময়ের আট মিনিট পরে পনেরোজন পর্যটক নিয়ে যাত্রা শুরু হলো।

জ্যাডার শহরের তিন দিকেই আড্রিয়াটিক সাগর। এখানে শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকে লোনা হাওয়া আর নরম রোদের ঝিলিক। শহর ছাড়িয়ে চলতে শুরু করার পরেই দৃশ্য বদলাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সমুদ্র হারিয়ে যায়, জায়গা নেয় উঁচু-নিচু পাহাড় আর বিস্তৃত বনভূমি। পথের বড় অংশ জুড়ে ভেলেবিট পর্বতমালার ধার ঘেঁষা মসৃণ সড়ক। এখানে পাহাড়গুলো খুব উঁচু না হলেও এক ধরনের সৌন্দর্য চোখে কাড়ে। পাথুরে ঢাল, মাঝে মাঝে গাঢ় সবুজ গাছপালার স্তর, কোথাও খোলামেলা তৃণভূমি। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, সুন্দর, বিস্তৃত। প্রতিটি বাঁকেই নতুন দৃশ্য।

গাইড ভেলেবিট পর্বতমালার ভৌগোলিক বিবরণ আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিবরণ দিতে শুরু করেছিল। আমার মনে হলো চোখের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি তার বিবরণে মনোযোগ না দিয়ে দুচোখ ভরে দেখে নেয়াটাই ভালো। কাছের পাহাড়ে কালচে সবুজ গাছপালার আধিক্য থাকলেও দূরের পাহাড়ের চূড়ায় শ্বেতশুভ্র তুষার। কাছাকাছি বেঁটে খাটো সবুজ পাহাড়ের অপরিসর মাথায় বিশাল এক প্রস্তরখণ্ড দেখে মনে হয় হঠাৎ যদি এই পাথর গড়িয়ে পড়ে তাহলে ক্ষুদ্র মিনিবাস গুঁড়িয়ে দেয়া কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। ঠিক এই সময়েই স্টিফেন আমার আশঙ্কার গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে বলল, 'গতকাল এই এলাকায় একশ ত্রিশ কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে গেছে। পাথর গড়িয়ে পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশি কিলোমিটারের মতো ঘুরে বিকল্প পথে লেক প্লিটভিস পৌঁছাতে হয়েছে। সময় লেগেছে দেড় ঘণ্টা বেশি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকে তেমন কোনো সম্ভাবনা?' 'না না, আজ দেখছো না কেমন চমৎকার ওয়েদার। ঝকঝকে রোদ!' স্টিফেনের তাৎক্ষণিক উত্তর।

বনভূমির অংশে ঢুকলে স্টিফেন ধারাবিবরণী বন্ধ করলে পরিবেশটা হঠাৎই শান্ত হয়ে যায়। ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে সূর্যের আলো ঝিলিক দিয়ে যায়। রাস্তার পাশে গ্রাম, কাঠের ঘর আর চিমনির ধোঁয়া, সব মিলিয়ে এক শান্ত গ্রামীণ জীবনচিত্র। পথের ধারে রঙিন ত্রিভুজ আকারের ছাদের যে ছোট ছোট বাড়ি দেখা যায়, সেগুলো আধুনিকতা আর গ্রামীণ জীবনের মাঝামাঝি কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট বাজার, লাল ছাদের বাড়ি আর দূরে খোলা মাঠ। শহর না, পুরো গ্রামও না। একটা শান্ত, নিস্তরঙ্গ নিজস্ব ছন্দে চলা জনপদ। হঠাৎ করে মনে হয়, আহা এই সুন্দর ছবির মতো বাড়িতে কারা থাকে? কেমন তাদের জীবন!

লেক প্লিটভিস ন্যাশনাল পার্কের দূরত্ব জ্যাডার থেকে প্রায় একশ ত্রিশ কিলোমিটার। বেলা দশটার কিছু আগে পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। ভেতরে ঢুকতেই মনে হলো আমরা এক রূপকথার রাজ্যের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। বাইরে থেকেই বোঝা যায়, ভেতরে আছে নীল-সবুজ হ্রদ, জলপ্রপাত আর কাঠের পাটাতন বিছানো পথের এক অসাধারণ জগৎ। প্রকৃতির গভীর নীরবতার ভেতরেও এখানে দেখা মেলে একটি সুসংগঠিত পর্যটন কাঠামোর। লেক প্লিটভিসে দুটি প্রধান প্রবেশ পথ থাকলেও আমাদের গাইড বেছে নিয়েছিল দ্বিতীয় প্রবেশ পথ লাদোভিনা। এদিকটা তুলনামূলক শান্ত ও বিস্তৃত। প্রবেশপথে টিকিট কাউন্টার, পুরো এলাকার ম্যাপ, বৃত্তাকার কাঠের ঘরে ক্যাফে এবং প্রক্ষালন কক্ষ। সবকিছুই খুব পরিপাটি ও পরিকল্পিত। এই আধুনিক ব্যবস্থার মধ্যেও প্রকৃতির সৌন্দর্য একটুও কমে না, বরং মনে হয়, মানুষ এখানে কেবলই দর্শক, প্রকৃতিই প্রকৃত মালিক।

বাস থেকে নামার পরপরই আমরা পনেরোজন অন্তত পাঁচ দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। স্টিফেন অবশ্য দশ মিনিটের মধ্যে গোলঘরের সামনে সকলকে জড়ো হতে পই পই করে বলে দিয়েছিল। ঠিক দশ মিনিটে না হলেও দ্রুত সকলে সমবেত হলে প্রথমেই ব্রেকফাস্ট প্যাকেট বিতরণ। প্রত্যেকের হাতে হাতে সবুজ রঙের বক্স ধরিয়ে দেবার

ফাঁকেই তালিকা দেখে আমাদের দুজনের হাতে তুলে সে দিল গোলাপি রঙের বাক্স। বুঝতে পারলাম, ট্যুর বুক করার সময়েই ওরা আমাদের নামের পাশে একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছিল। তারপরেও জিজ্ঞেস করলাম, "আমাদের রঙ ভিন্ন কেন?" স্টিফেন হেসে বলল, 'তোমাদের জন্যে হালাল ব্রেকফাস্ট!'

প্রাতঃরাশের প্যাকেট হাতে করে একটা কাঠের সেতু পার হয়ে আমরা ঘন বনের দিকে এগিয়ে চললাম। পুরো লেক এলাকার একটা বড় আকারের ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে যাবার পরে স্টিফেন আমাদের যাত্রা পথের ব্যাখ্যা দেবার সাথে সাথে জাতীয় উদ্যানে থাকাকালীন কী করা যাবে আর কী কী করতে মানা সে সম্পর্কেও একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছিল। মানচিত্র আঁকা বোর্ডের পাশেই সতর্ক বার্তায় স্পষ্ট লেখা আছেঃ Take nothing but pictures, leave nothing but footprints and use nothing but time. স্টিফেনের বক্তব্যের মধ্যেই পতাকাওয়ালা এক গাইডের পেছনে পেছনে চীনা পর্যটকদের বিশাল দল দিব্যি আমাদের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলল। গাইডের বলা "করণীয় এবং বর্জনীয়" শেষ হলে আমরা আরও একটা ছোট কাঠের সেতু পার হয়ে অভ্যন্তরের বাসস্টপে এসে পৌঁছলাম। ইউরোপের শহরগুলোতে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট যেমন দেখা যায়, তেমনি সাদা রঙের দুই ট্রেইলার বিশিষ্ট বাসগুলো আমাদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

একটা বাস একটু আগেই ছেড়ে গেছে, সকল চীনাম্যানের স্থানসংকুলান না হওয়াতে আমাদের বাসেও কয়েকজন আগে থেকেই জায়গা নেয়। উঠে বসতেই চলতে শুরু করল অভ্যন্তরীণ বাহন। চলতি বাসে স্টিফেন কিছু বলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চীনাদের চ্যাং চুং বাক্যালাপ এবং অন্যদের উচ্চস্বরে কোলাহলে কিছু শোনা গেল না। বুঝতে পারলাম, এদের কাছাকাছি থাকলে আজ আর কোনো ধারাবিবরণী শোনা যাবে না।

শুরুতে সম্ভবত দাপ্তরিক কয়েকটা ভবন পার হবার পরেই একটু ঢেউ খেলানো দীর্ঘ সবুজ প্রান্তর। বেশ পরিপাটি করে সাজানো ঘাসের মাঠ অনেকটা গলফ কোর্সের মতো। কে জানে এখানে ক্রোয়েশিয়ার সেনা কর্মকর্তা কিংবা শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা গলফ খেলতে আসেন কি না। সবুজ তৃণভূমির পরে প্রথমে দীর্ঘ গাছের সারি ক্রমেই ঘন হতে হতে অরণ্যের রূপ নিতে থাকে। মিনিট দশেক এভাবে চলার পরে থেমে গেল বাস, নেমে পড়লাম একটা বাঁধানো চত্বরের পাশে। চারিদিকে ওক কিংবা ফার জাতীয় দীর্ঘ গাছে ঘেরা প্রায় বৃত্তাকার সবুজ মাঠে সারি সারি কাঠের বেঞ্চ আর টেবিল সাজানো। নরম রোদের ভেতর দিয়ে হেঁটে আমরা যে যার হাতের সবুজ অথবা গোলাপি ব্রেকফাস্টের প্যাকেট নিয়ে বসে পড়লাম। প্যাকেট খুলে কলা-রুটি, সেদ্ধ ডিম, চিকেন সসেজ আর ফ্রুট জুসের বোতল টেবিলে রাখতে না রাখতেই কাছাকাছি কোথাও জলস্রোতের ঝিরঝির কানে এলে ছুটলাম সেই বয়ে চলা শব্দের উৎস সন্ধানে। বৃক্ষলতায় ঘেরা সবুজ মাঠের একপ্রান্তে গাছপালার ফাঁকে শীর্ণ এক প্রবহমান ধারা নুড়ি পাথরের বিছানা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ নিম্নগামী স্রোতের

সেই ধারাজলে চোখ রেখে আর কান পেতে ঝরনার গান শুনে ফিরে এলাম সবুজ মাঠে হলুদ রঙের টেবিলে। মিষ্টি রোদে বসে নাস্তাপর্ব শেষ করার পরে শুরু হলো পায়ে হেঁটে লেক প্লিটভিস অভিযান।

২

একটা বড় আকারের নির্দেশক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে স্টিফেন আবার পথের দিশা দেবার চেষ্টা করছিল। আমি জানি অচেনা অরণ্য জনপদে এইসব মানচিত্র এবং পথনির্দেশ কোনো কাজে লাগে না। কাজেই তার কথায় মনোযোগ না দিয়ে পদাঙ্ক অনুসরণই যুক্তিযুক্ত মনে হলো। এবারে লেকের বুক জুড়ে পাতা কাঠের দীর্ঘ ট্রেইল। আমাদের ডান পাশে বিস্তৃত ছায়াময় অরণ্য। বাঁ দিকে বাঁশজাতীয় গাছ, নলখাগড়া আর লম্বা ঘাসের বনের হঠাৎ হাওয়া মাঝে মাঝেই দোল দিয়ে যাচ্ছে। হলদে ঘাস এবং নীলচে ফার্নের মতো বিস্তৃত তৃণভূমি পেরিয়ে স্বচ্ছ নীল জলের হ্রদ। পায়ে হাঁটা কাঠের আঁকাবাঁকা সরু সড়ক অনেকটা বড় একটা বাঁক নিয়ে ডান দিকে ঢুকে যায়। আমরাও ক্রমেই ঢুকে পড়ি বনের গভীরে। আমরা হাঁটছি হলদে সবুজ ঘাসের বন পেরিয়ে, নীলচে সবুজ গাছপালার পাশ দিয়ে আর দূরে চোখে পড়ে পাহাড়ের গায়ে কালচে সবুজ গাছের সারি। এই পথে উঁচু গাছগুলো মাথার ওপর ছাতা ধরে আছে, আর মাটিতে পড়া আলো-ছায়ার খেলায় পুরো পথটাই যেন চলমান ক্যানভাস। বাতাস এখানে ঠান্ডা, একটু আর্দ্র, মনে হয় অরণ্যের নিঃশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বিপরীত দিক থেকে এক দুজন করে ভ্রামণিক আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন আর আমরা এগোচ্ছি। কিছু পরেই গাছপালার ফাঁকে দেখা দেয় শান্ত, গভীর, আয়নার মতো স্থির বিশাল এক জলাধার। চারপাশের পাহাড় আর বনভূমি জলের ওপর প্রতিফলিত হয়েছে নিখুঁতভাবে। আরও একটু এগিয়ে আবার পেরিয়ে যাই ছোট্ট একটা জলের ধারা। পাহাড়ে ঘেরা আরও এক নীল জলের হ্রদের পাশে থমকে দাঁড়াতেই হয়। লাল হলুদ আর সবুজ পাতায় রোদের ঝিলিমিলি আর নীল জলের বুকে হাওয়ার মৃদু কম্পন যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। পথ চলতে চলতেই চোখে পড়ে গাছ-পাতার ফাঁক দিয়ে অঝোর ধারায় নেমে এসেছে প্রপাত।

এখানে পাহাড়, বনাঞ্চল, তৃণভূমি এবং জলাধার মিলিয়ে প্রায় ২৯৬ বর্গ কিলোমিটারের বেশির ভাগ জায়গাতে কখনোই মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। নেহায়েত পায়ে চলার পথ তৈরি বা অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি স্থাপনা নির্মাণ ছাড়া বনের প্রায় শতকরা আশিভাগ জুড়ে থাকা গাছের কাণ্ড কখনো কাটা বা ডালপালা ছাঁটা হয়নি। কোথাও কোথাও গাছের গুঁড়ি বা ভেঙে পড়া শাখা প্রশাখা স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আবার কোথাও চোখে পড়ে পুরোনো গাছের ফসিল। প্রাচীন বৃক্ষের এমনি একটা ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে হাতের ডাইনে সরোবর এবং বাঁয়ে পাহাড় রেখে এগোচ্ছি। এখানে পায়ের নিচের পথটা এবড়োখেবড়ো নুড়ি পাথরের টুকরা টাকরায় ভরা। তবে সারা পথ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আন্দোলিত শাখার ছায়া আর সাথে বয়ে যাওয়া ঝিরিঝিরি হাওয়া।

একটু এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। নীল জলের সরোবরে জলে ঝিলমিল করছে সূর্যের কিরণ।

ভাঙাচোরা পাথুরে পথের পরে আবার দীর্ঘ ওয়াকওয়ে। আমরা কাঠের পাটাতন ধরে হাঁটছি। বাঁদিকে পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে আছেন এক বৃদ্ধ দম্পতি। ডাইনে ট্রেইলের নিচের জলাধার থেকে উঠে এসেছে দুটি হাঁস। মহিলা তাঁর হাতের পাউরুটি থেকে ছোট ছোট টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন হাঁসের দিকে। একটি হাঁস চটপট পাউরুটির টুকরো খেয়ে ফেলছে। অন্যটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হয়তো মানুষের খাবারের প্রতি তার আগ্রহ নেই অথবা লেকে শামুক গুগলি খেয়ে পেট আগেই ভরিয়ে ফেলেছে।

এখানে ঘন অরণ্যের ভেতরে কোথাও খানিকটা উঁচু থেকে উদ্দাম বেগে নেমে আসছে জলের ধারা, আবার কোথাও ধীরে বয়ে চলা শীর্ণ জলস্রোত এক সময় মিশে যাচ্ছে বড় লেকের নীল জলে। এই অংশে লেকগুলো ছড়িয়ে আছে একের পর এক বিভিন্ন উচ্চতায়। ধাপে ধাপে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা প্রতিটি লেক যেন আরেকটি স্রোতের সাথে গোপনে যুক্ত। কাঁকর বিছানো মাটির পথ ছেড়ে আমরা আবার কাঠের পাটাতন বিছানো পথে এগোতে থাকি। ডান দিকে একটি বাঁক পেরোবার পরে চোখের সামনে খুলে যায় বিস্ময়ে ভরা এক জলের জগৎ। হঠাৎ করেই সমস্বরে হর্ষধ্বনি শুনে বুঝতে পারি আমরা একটি অনিন্দ্য সুন্দর দৃশ্যের জগতে এসে পৌঁছে গেছি।

প্লিটভিস লেকস ন্যাশনাল পার্কের আপার লেকস এলাকার গাছপালার ভেতর দিয়ে ১০-১২টি ধারায় নেমে আসা ১৮ মিটার উঁচু এই চমৎকার জলপ্রপাতটির নাম মালি প্রস্টাভাক। "মালি" এর অর্থ "ছোট", এবং "প্রস্টাভাক" এসেছে ক্রোয়েশীয় শব্দ থেকে, যার অর্থ ছিটিয়ে পড়া। কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়ে মনে হয়, প্রকৃতি এখানে প্রতি মুহূর্তে উন্মোচন করে চলেছে তার সমস্ত শক্তি ও মুগ্ধতা। ভিউপয়েন্টে কাঠের তৈরি শক্তপোক্ত ওয়াকওয়ে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছিল দর্শনার্থীর চাপে পাটাতন ভেঙে পড়তে পারে। ওয়াকওয়ে না ভাঙলেও রেলিং-এ সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়ানো নিয়ে রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি চলছিল। রেলিং ঘেঁষে ট্রাইপড বসানো নিয়ে একজন জাপানি এবং একজন চাইনিজ ট্যুরিস্টের মধ্যে বচসা শুরু হয়ে গেল। দুজনেই প্রায় দুর্বোধ্য ইংরেজিতে কথা বললেও কে জাপানি আর কে চীনা তা বুঝতে পারলাম না। দুজন নারীর মধ্যে একজন পুরুষ হিসাবে মধ্যস্থতা করতে যাওয়া উচিত কি না ভাবতে ভাবতেই একজন রণে ভঙ্গ দিয়ে ট্রাইপড উঠিয়ে নিলে বুঝলাম ইনি জাপানি, কারণ চীনারা সহজে কোনো দাবি ছাড়তে রাজি হয় না।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ভিড় একটু পাতলা হতেই রেলিং-এ চেপে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে শুরু করলাম। গাছপালার ফাঁকে পাথরের শরীর বেয়ে অঝোর ধারায় নেমে আসছে জলের প্রবাহ। এক এক করে গুনে দেখলাম পাশাপাশি অন্তত পনেরোটা অপ্রশস্ত স্রোতধারা সশব্দে ঝরে পড়ছে। রোদের কিরণে সেই জলস্রোতের ভেতরে ফুটে উঠছে নানা রঙের আলোর ঝিলিমিলি। একজন সদাশয় ভ্রামণিক নিজে থেকেই

আমাদের দুজনকে দাঁড়াতে বলে বেশ কয়েকটা যুগল ছবি তুলে দিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবারো আমাদের এগিয়ে যাবার পালা। মালি প্রস্টাভাকের পরেই একটা থাক কাটা পাথুরে পথ দিয়ে হুড়মুড় করে তুমুল গর্জনসহ নেমে আসা একটা ঝরনা পার হতেই হঠাৎ চারিদিক শান্ত হয়ে গেল।

এখানে দীর্ঘ কাঠের ট্রেইল খুঁটির উপরে অনেকটা উঁচুতে। দুপাশে ঘন সবুজ জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘাস জাতীয় লতাগুল্মের আস্তরণ। তবে পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা গাছপালা এবং ঝুলে থাকা লতাপাতা অনেকটা ম্রিয়মাণ, শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে তৃণভূমি। নিচে শান্ত নীল জলের সরোবর। ভীষণ নৈঃশব্দের ভেতর দিয়ে হাঁটার সময় পায়ে চলার শব্দ, বাতাসের ঝিরিঝিরি আর গাছ থেকে খসে পড়া পাতার শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। পাখির ডাক শোনার জন্যে আমি কান পেতে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু না, পাখিদের কোনো সাড়াশব্দ পাইনি এ পথে। কিছু দূর এগিয়ে দেখলাম দূরে পাহাড়ের মাথা থেকে জল ঝরে পড়ছে। কয়েকজন উৎসাহী পর্যটক কাঠের ট্রেইল ছেড়ে জলাভূমির ভেতর দিয়ে হেঁটে ঘাসের বন পেরিয়ে পৌঁছে গেছে পাহাড়ের পায়ের কাছে। স্টিফেন পেছনে পেছনে আসছিল। আমাদের দলের দুই তরুণী হঠাৎ থেমে দূরে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি ওই পাহাড়ের কাছাকাছি যেতে পারি না?' স্টিফেন উত্তর দিল, 'কেন নয়! নিশ্চয়ই যেতে পারবে, তবে সেক্ষেত্রে তোমরা ঘাটে পৌঁছে ফেরি পাবে না, ফেরি মিস করলে লেক কোজাক পারাপারে দেরি হবে, কোজাক পার হতে না পারলে গ্যাভানোভাক লেকে পৌঁছাতে পারবে না, সেখান থেকে ভেলিকি্ল্যাপে পৌঁছাতে না পারলে তোমাদের লেক প্লিটভিস আসাই বৃথা।'

তরুণীদ্বয় কোনো কথা না বলে আমাদের সাথে চলতে শুরু করলে কিছু পরেই আমরা একটা ফেরিঘাটে পৌঁছে গেলাম।

৩

সুদৃশ্য ফেরিঘাটে কাঠের পাটাতন বিছানো পথ বনভূমির প্রান্ত থেকে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ঘেরা ভাসমান পন্টুন পর্যন্ত চলে গেছে। পন্টুনের গায়ে থেমে আছে পারাপারের খেয়া। কমবেশি চল্লিশ জনের মতো ভ্রামণিক একে একে ফেরিতে উঠে বসলে যাত্রা শুরু করল নিঃশব্দ নৌযান। এই ফেরি বোটটির আকার আকৃতি ঠিক জাহাজ বা প্রচলিত ধারার নৌকার মতো নয়। প্রায় চতুষ্কোণ বৈদ্যুতিক বাহনটি হ্রদের আকাশী নীল রঙের জল কেটে তিরতির করে বয়ে চলল। আমরা পাড়ের ঘন সবুজ গাছপালা আর হ্রদের পাড় ঘেঁষে অনুচ্চ ঘাসের বন দেখতে থাকি। কিছুক্ষণ পরেই জলের রঙ বদলাতে শুরু করে। প্রথমে কোবাল্ট ব্লু ধীরে ধীরে সবুজ হতে থাকে। একই সাথে পাড়ের গাছপালাও বদলে যায়। ছোট ছোট ঘন গাছের পরিবর্তে দেখা দেয় দীর্ঘ গাছের সারি। পাড়ের কাছে হঠাৎ করেই তৃণভূমি আর নলখাগড়ার মতো জলজ উদ্ভিদ উধাও হয়ে যায়। চোখে পড়ে পাথরের ছোটবড় চাঁই সাজানো পাড়। এখানে সম্ভবত জলের তোড়ে ভাঙন ঠেকাবার জন্যে এই ব্যবস্থা। এরপর আবারো জলের রঙ বদলে যায়। গাঢ় নীল নিস্তরঙ্গ জলে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, পাড়ের বৃক্ষলতা দুলতে থাকে

হাওয়ার দোলায়। মিনিট পনের পরেই স্বল্প সময়ের নৌবিহার শেষে আমাদের ছোট তরী বোটস্টপের পন্টুনে এসে ভিড়লো।

কাঠের রেলিং ঘেরা পথ দিয়ে এক এক করে নেমে আমরা এগিয়ে চললাম প্লিটভিসের জনপ্রিয় বিশ্রাম এলাকা পি-থ্রি স্টপে। চারিদিকে গাছপালা এবং কয়েকটি ছোট ছোট কাঠের কুটিরে ঘেরা সকালের ব্রেকফাস্ট এলাকার মতো সবুজ মাঠ কাঠের টেবিল ও বেঞ্চ দিয়ে সাজানো। পার্কের বড় লেকটির তীরে বসে খাবার খাওয়া বা দীর্ঘ ভ্রমণের পর একটু জিরিয়ে নেওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা এখানে। অনেকেই দুপুরের মিষ্টি রোদে তাদের লাঞ্চবক্স নিয়ে বসে পড়েছে, আবার কেউ কেউ পাশের আউটলেট থেকে খাবার কিনে নিয়ে আসছে। বনের ভেতরে পাখির দেখা না মিললেও এখানে পাখিদের ওড়াউড়ি চোখে পড়ার মতো। আমরা একটা টেবিলে বসে কমলা খেতে খেতে দেখছিলাম কয়েকজন কিশোরী উড়ে আসা কবুতরের দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নির্ধারিত বিরতির সময় শেষ হয়ে গেলে স্টিফেন সকলকে জড়ো করে জানিয়ে দিল, এবারে আমাদের গন্তব্য ভেলিকি ফলস, তবে তার আগে পার হতে হবে গ্যাভানোভাক লেকের দীর্ঘ ওয়াকওয়ে।

পিকনিক স্পট থেকে বেরোতেই আবার ঢুকে পড়লাম ঘন বনের মধ্যে। কিছুটা দূরে দূরে প্রায় ভূমির সমান্তরালে আবার কোথাও আমাদের ওয়াকওয়ের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জলের ধারা। পাহাড়ের গায়ে ও বৃক্ষলতায় ছড়িয়ে পড়েছে সবুজ রঙ। দূরেও দেখা যায় কোথাও গাছের ডালপালের ভেতর দিয়ে, আবার কোথাও পাথরের শরীর বেয়ে অঝোরে ঝরছে জলের স্রোত। এইসব ছোট বড় প্রবাহ নানা দিক থেকে নেমে যাচ্ছে হ্রদের পানিতে। একটা বাঁক ফিরতে হঠাৎ করেই তুমুল বেগে এবং বিপুল গর্জনে নেমে আসা একটা চওড়া ধারার পাশে থমকে দাঁড়াতেই হয়। এখান থেকে চারিদিকে তাকালে শুধু জলপ্রপাত, জলের প্রবাহ, জলের ধারা, আর কানে আসে জলের শব্দ, জলের কলতান ও জলের গান। এ যেন এক জলের জাদুকরী জগৎ। এখান থেকেই শুরু হয়েছে গ্যাভানোভাক লেক।

গাঢ় গ্যাভানোভাক কিছুটা রহস্যময়। চারপাশের খাড়া পাথুরে দেয়াল আর গভীর জল, এখানে প্রকৃতির এক ভিন্ন, প্রায় প্রত্নযুগের আবহ পাওয়া যায়। গাভানোভাক হ্রদ ক্রোয়েশিয়ার প্লিটভিস লেকস ন্যাশনাল পার্কের চারটি হ্রদের মধ্যে একটি, যা একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গাভানোভাক হ্রদের আয়তন ০.৮ হেক্টরের মতো এবং সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ১০ মিটার। "গ্যাভানোভাক" নামটি এসেছে স্থানীয় কিংবদন্তির গ্যাভান নামের এক ব্যক্তির নাম থেকে। আমাদের গ্রামাঞ্চলের সকল পুরোনো দিঘির জলের তলায় যেমন গুপ্তধন লুকিয়ে রাখার গল্প আছে, ঠিক তেমনি এই হ্রদের গভীর জলের তলায় কোথাও লুকানো আছে গাভানের গুপ্তধন। আমরা রেলিং ঘেরা জলের ঠিক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সর্পিল কাঠের পথ ধরে হাঁটতে থাকি। মাঝে মাঝেই স্বচ্ছ জলের বিভিন্ন গভীরতায় সাঁতার কাটা মাছের স্পষ্ট দৃশ্য দেখা যায়। হাঁটতে হাঁটতেই আমার মনে হয় এই পথগুলোই

প্লিটভিসের প্রাণ। জলের ওপর কাঠের সরু সেতু, নিচে স্বচ্ছ পানি, রঙিন মাছগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, দূরে দূরে পাথুরে পাহাড়। আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলপ্রপাত পথের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ওয়াকওয়ে ধরে আরও একটু এগিয়ে মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই পৌঁছে গেলাম সেই প্রতীক্ষিত দৃশ্যের সামনে। ভেলিকি স্লাপ ক্রোয়েশিয়ার সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত। আটাত্তর মিটার উঁচু থেকে গর্জন করে অন্তত ডজনখানেক জলের ধারা নেমে আসছে। বিপুল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ধারাজল, নিচে সাদা ফেনার রাশি, বিরতিহীন জল-পতনের শব্দ, আর অভূতপূর্ব সুন্দর দৃশ্য, সবকিছুতেই ছড়িয়ে আছে অসাধারণ গাম্ভীর্য। সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, প্রকৃতি এখানে তার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য প্রতি মুহূর্তে উন্মোচন করে চলেছে। পরপর তিনটি পাহাড়ের মাথায় মরা গাছের ডালপালা ছাড়া পাহাড়ের শরীরে কোনো সবুজের চিহ্ন নেই।

ভেলিকি স্ল্যাপের ভেলকি দেখাতে এখানে দলে দলে পর্যটক এসে ভিড় জমিয়েছেন। তবে ভেলিকির সামনে চীনা পর্যটকদের লম্ফঝম্প ভেলিকি প্রপাতের চেয়ে কম দর্শনীয় নয়। এখানে কোনো ভিউপয়েন্ট নেই। অনেকটা সেমি-সার্কেলে সাজানো কয়েকটি পাথুরে পাহাড়ের শীর্ষ থেকে ঝরে পড়া প্রপাত এমনিতেই অনেক দূর থেকে দৃশ্যমান। মাঝখানের পাহাড়ের মুখোমুখি দুটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড, যার বড়টিকে ছোটখাটো পাহাড়ই বলা যায়। প্রস্তরখণ্ড দুটির পরে যেখানে ঝরনার জল ঝরে পড়ছে সেই জঙ্গলাকীর্ণ খাদের কিনারা বরাবর ইট-পাথরের অনুচ্চ দেয়াল। চৈনিকেরা সেই ছোট বড় পাথরের টুকরায় উঠে পড়েছে। নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে, বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দিয়ে ছবি তুলছে। এমনকি তারা পুরো দেয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমরা পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে ঝরা জলের প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু পটভূমিতে ভেলিকি স্ল্যাপ রেখে ছবি তোলার কোনো সুযোগ নেই। স্টিফেন আমাদের দলকে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো ওরা এক জায়গায় খুব বেশিক্ষণ থাকে না।' সত্যিই একটু পরে হৈ হৈ করে চীনারা সামনে থেকে সরে গেলে আমরা পাহাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার সুযোগ পেলাম। তবে মনে প্রয়োজনীয় সাহস এবং পায়ে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় ছোট বড় কোনো প্রস্তরখণ্ডের উপরে উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি।

পায়ে শক্তি না থাকলেও আরও একবার ঘন ঘাসের তৃণভূমি এবং হ্রদে বিছানো কাঠের ট্রেইলে হেঁটে সারিবদ্ধ পাহাড়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। উপরের দিকে তাকিয়ে প্রথমে একটু দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে প্রায় ৫০-৬০ ধাপ উপরে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে আরেকবার বিস্মিত হলাম। জল ও জঙ্গলের বিচিত্র কারুকাজ ছড়িয়ে আছে লেক প্লিটভিসের জাতীয় উদ্যান জুড়ে।

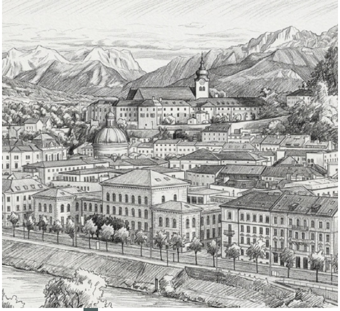

মোৎজার্ট-এর শহরে

স্বপন ভট্টাচার্য

আমি প্রথমবার অস্ট্রিয়া যাই ২০০৫-এ। ভিয়েনাতে একটা দু-সপ্তাহের কনফারেন্স ছিল ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারে। আমার মোৎজার্ট ভ্রমণ সেখান থেকেই শুরু হয়ে যায় বলা চলে। উলফগ্যাং আমাদিউস মোৎজার্ট অবশ্য যতটা অস্ট্রিয়ার, ততোটা জার্মানির, ততোটাই ইউরোপের এবং ততোটাই সারা পৃথিবীর। তবে তিনি জন্মেছিলেন ১৭৫৬ সালে অধুনা অস্ট্রিয়ার এক ছবির মতো ছোট্ট শহরে যার নাম সালজবুর্গ। সঙ্গীতবিশ্ব তাঁর সার্ধদ্বিশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ করছে সারা পৃথিবী জুড়েই। ভিয়েনায় দেখছি দোকানে-বাজারে, পানশালা থেকে অপেরা হাউসে, সেলসম্যান, ওয়েটার —সবাই মোৎজার্ট। সোনালি জরির কাজ করা লাল লং কোট আর পাটের সোনালি তন্তুর মতো পরচুলা তাদের সবার পরনে। কনফারেন্স হলেও বিক্রি হচ্ছে মোৎজার্ট কনচের্টোর টিকিট। সবচেয়ে কম দামের টিকিট পঁয়ষট্টি ইউরো, তবে ছাত্র ও সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য কিছু ছাড় আছে। কাগজে কলমে তখনো সিনিয়র হইনি, তবু সন্ধেবেলায় একবার হাঁটতে হাঁটতে গেলাম অপেরা হাউসে। কাউন্টারে বসে থাকা মেয়েটি স্বাগত জানালে বলি —দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি সিনিয়র!

সে বলল —পাসপোর্ট!

সেটা সঙ্গেই ছিল, কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বললাম —ওহো, সে তো হোটেলে?

মেয়ে বলে —তাহলে আর কী করা!

বললাম —তাহলে ধরে নাও স্টুডেন্ট!

সে মৃদু হেসে বলে —কিসের?

—ধরে নাও সঙ্গীতের।

কী মনে হলো তার কে জানে, একটা টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল —এর পর থেকে স্টুডেন্ট আইডি নিয়ে ঘুরো কিন্তু। আপাতত বাইশ ইউরো। এক-তৃতীয়াংশ দামে টিকিট পেয়ে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল, বললাম —অবশ্যই, কাল আনবো, কিন্তু তোমাকে তো থাকতে হবে এই কাউন্টারে!

আহা, তখন তো আর আজকের মতো মোবাইল ছিল না হাতে হাতে, নইলে আলাপ কাউন্টারের বাইরে গড়াবার ষোলো আনা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পরদিন আমি কনফারেন্স ডুব মেরে মোৎজার্ট শহর ঘুরে আসার ছক কষে নিয়েছি, ফলে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আর পেকে উঠলো না। মনে সেই চিনচিনে ব্যথা নিয়েই পরদিন আমি হোটেল থেকে সক্কাল সক্কাল বেরিয়ে পড়লাম ভিয়েনা ওয়েস্টব্যানহফ স্টেশনের উদ্দেশ্যে। ভিয়েনা থেকে দ্রুতগতির ট্রেনে সালজবুর্গ তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ, ভাড়া তখনই ছিল আশি ইউরোর মতো। কিন্তু আমার অমোঘ 'আমাদিউস' টান আমাকে অন্তত আজ ব্যয়কুণ্ঠ হতে বারণ করছে, সুতরাং খুঁজে পেতে বসে পড়লুম একটা স্মোকিং এনক্লেভের সিটে এবং একটা লম্বা টান মেরে দেখলুম আহা —বার্গার, ফল, বিয়ার বা ওয়াইন নিয়ে দূর থেকে উঁকি মারছে প্লেনের মতো পুশ কার্ট ট্রলি!

সালজবুর্গ স্টেশন নেহাতই ছোট এবং কিছুটা অপরিচ্ছন্ন আর নিরালা দেখেছি তখন। একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সিটি, কিন্তু স্টেশনটা অনেকটাই মিতকথনের মতো লেগেছিল। এখানে কোথায় আমি মোৎজার্ট বা সাউন্ড অফ মিউজিকের স্পন্দন পাবো? বাইরে একটা চত্বরে কয়েকজন উপমহাদেশীয় চেহারার লোক বসে গল্পগুজব করছে। জিগ্যেস করলুম —এখানে মোৎজার্ট মেমোরিয়াল কোথায়? তারা প্রথমেই জানতে চাইল কোন দেশের লোক আমি। ইন্ডিয়ান শুনে খুশি হলো, উর্দুতে বলল —আমরা পাকিস্তানি, কিন্তু যে নাম বললে সেটা তো বুঝলাম না, তবে এই মোড় ঘুরেই একটা গার্ডেন আছে, মিরাবেল গার্ডেন, প্রচুর লোকজন ওটাতে যায়।

আমার হাতে সময় কম, ফলে আলাপ আর বাড়ার সুযোগ না দিয়ে আমি চললাম মিরাবেল গার্ডেন-এর দিকে এবং সেখানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সালজবুর্গ আমার সামনে উন্মোচিত হতে শুরু করল। এই তো সেই সাউন্ড অফ মিউজিকের গার্ডেন! গার্ডেন আসলে মিরাবেল প্যালেসেরই অংশ, তবে প্যালেস এখন সরকারি রেজিস্ট্রি অফিস। ১৬৯০ সালে ফিশার ভন আর্লাচ নকশা করেছিলেন এই বাগানে। ঝোপ দিয়ে বানানো গোলকধাঁধা আর বাঁধানো পাথরের বঙ্কিম পথ, ফুলের কেয়ারি আর সারিবদ্ধ বামনদের বিচিত্র মূর্তির সম্ভার মিরাবেল গার্ডেনকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

রেজিস্ট্রি অফিসটায় পরের বার গিয়ে দেখেছি (২০১৯) কনসার্টের আয়োজন হয় প্রতি সন্ধ্যায়।

উদ্যান থেকে বেরিয়ে কালো পাথরের রাস্তা দিয়ে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম এক নাতিপ্রশস্ত নদীর পারে — সালজাক নদী। ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দর নদীগুলোর মধ্যে পড়ে এই সালজাক নদী। নদীর ওপর এক রোমান্টিক সেতু। সেটার ওপর দাঁড়ালে বাম দিকে দেখা যায় আল্পসের দিক থেকে তার নেমে আসার পথ। ভূতাত্ত্বিকের কথা ধার করে বললে বলতে হয়, আল্পসের গ্লেসিয়ার গলে জল গিয়ে পুষ্ট করে সালজবুর্গ নামের এক হ্রদকে, যা থেকে উপচে নেমেছে এই সালজাক নদী এবং শহর সালজবুর্গ গড়ে উঠেছে এই নদীরই অববাহিকায় যা ভূগোলের ভাষায় একটা ফাটল বা ফল্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান। এই ফল্টের দুই পাশে শহরের দুই ভাগ, তবে সেতুটায় দাঁড়িয়ে বোঝাই যাচ্ছিল শহরের প্রাণ রয়েছে আসলে ওপারটা, যার শীর্ষবিন্দুতে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওগো প্রাচীন বটের মতো এক দুর্গ —হোহেনসালজবুর্গ দুর্গ। নদীর পার বরাবর অনেকটা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে সালজবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়। বছর কুড়ি আগে যখন প্রথমবার গেছি তখন নদীর পারে কেবল বারোক স্থাপত্যের নিদর্শনগুলিই দেখা যেত, পরের বার দেখেছি সেখানে দৃষ্টি আড়াল করে বসে গেছে সারি সারি চীনাদের দোকান। এত চীনা এখানে এল কী করে এবং কীভাবে এত অল্পায়াসে এবং অল্প সময়ের ভেতর সালজবুর্গের ভেতরে-বাইরে সিংহভাগ ব্যবসার দখল নিল তা ভেবে বিস্মিত হই যারপরনাই। প্রথমবার কিছু জাপানি পর্যটক পেলেও পেয়ে থাকবো, চীনা একেবারেই দেখিনি। পরের বার বাসবোঝাই ঝাঁকে ঝাঁকে চীনাকে পেয়েছি। তাদের বাক্যালাপের একবিন্দু বোধগম্য না হলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম থেকে থেকেই 'দো-রে-মি' 'দো-রে-মি' করে যাচ্ছে। আমেরিকান ট্যুরিস্টদেরও দল বেঁধে গাইতে শুনলাম 'হাউ ডু ইউ সলভ এ প্রবলেম লাইক মারিয়া'। বুঝলাম পঞ্চাশ বছরেরও আগে মুক্তি পাওয়া একটি চলচ্চিত্র সালজবুর্গকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে যে জায়গা দিয়েছে তাতে মোৎজার্ট সাহেব 'অলসো র‍্যান'-এর ভূমিকায় না চলে গিয়ে থাকেন! কিন্তু ২০০5 ছিল অন্যরকম, সেটা মোৎজার্ট-এর জন্মের আড়াইশো বছর পূর্তি পালনের বছর এবং ভিয়েনা থেকেই সেই উত্তাপ টের পেয়েছি।

নদী পেরিয়ে পথ আমায় নিয়ে এল শহরের মূল কেন্দ্রে যার একদিকে রয়েছে রেসিডেন্সপ্লাৎজ এবং অন্য দিকে মোৎজার্টপ্লাৎজ নামের দুটি খোলা চবুতরা একে অন্যের হাত ধরাধরি করে আছে। এক দিকে রয়েছে রেসিডেনজ (Residenz) যা ১১২০ থেকে আর্চবিশপের প্রাসাদ হিসেবে কাজ করে এসেছে। সালজবুর্গ সিটি পাস তখন ছিল একুশ-বাইশ ইউরো, এক পাসে যেসব স্পট ঘুরে নেওয়া যায় সারাদিনে এটি তার মধ্যে একটি। ভিতরে একটা এক-দেড় কিলোমিটারের ট্রেক, অডিও গাইড নিয়ে শুনতে শুনতে ঘুরে নেওয়া যায় এবং চিনে নেওয়া যায় জে এম রটমায়ারের করা অপূর্ব সিলিং পেইন্টিং আর ফ্রেস্কোগুলি। মোৎজার্টপ্লাৎজ-এ রয়েছে

মায়েস্ত্রোর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি। ১৮৪২ সালে গড়া সেটা। প্রথমবার দেখেছিলাম মূর্তির ভিত্তিস্তম্ভে অজস্র ফুলের তোড়া, মেলোডির ব্যাকরণ আঁকা রিবনে মোড়া, ছোট খেলনা ভায়োলিন-গিটার রেখেছে ভ্রমণার্থীরা। পরের বার তাঁকে আর অত মনোযোগ পেতে দেখিনি। বেলা এগারোটা বাজলে রেসিডেনজ থেকে ভেসে এল গ্লোকেনস্পিয়েল বা 'সালজবুর্গ ক্যারিলন'-এর সুর। ৩৫টি বেল-এর স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিন মেলোডি রোজ দিনে তিনবার বাজে ১৭০৩ থেকে। আগে তা বাদকরাই বাজাতেন এবং এই বাদনসজ্জাটিও দেখে নেওয়া যায় স্বতন্ত্র টিকেটে। যখন বাজে, তখন মোৎজার্টও ধ্বনিত হন কোনো না কোনো সময়ে, যেমন এখন শুনতে পেলাম বাজছে তাঁর অতি পরিচিত সৃষ্টি ৪০ নম্বর সিম্ফনি।

মোৎজার্টপ্লাৎজ ছাড়িয়ে আমি পাহাড়ের পথ ধরি। সেই পথ একেবারেই ফাঁকা। একটু উঠলেই র‍্যাম্পের মতো জায়গাগুলো থেকে চোখে পড়ে অদূরে ঘুমিয়ে আছে আদিগন্ত আল্পস। তার গহীন সবুজ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মাথায় বরফের ফসফরাস জমে আছে। বাভারিয়ান আল্পসের মতো সুন্দর প্রাকৃতিক নিসর্গ আর হয় না। সুইস আল্পসের মতো কনে-সাজানো চেহারা নয় তার, বরং অনেকটাই দামাল পুরুষ যেন। সালজবুর্গ দূরত্বের নিরিখেও মিউনিখ থেকে অনেক কাছে, বরং ভিয়েনাই দূর বহুদূর। পথের পাশে বেঞ্চ পাতা, ভূতাত্ত্বিক বিবরণও দেওয়া আছে একটা বোর্ডে নদী, উপত্যকা আর শহরের উৎসের — কিন্তু পড়ে আর কে! মাঝে মাঝে দু-একজন প্রেমিক-প্রেমিকা নিরিবিলি খুঁজে চলে আসে, আর এই পথই যেহেতু হোহেনসালজবুর্গ দুর্গে যাবার পথ, সেহেতু যে দু-একজন সে পথের পথিক ওঠানামা করছেন তাঁরাও। দুর্গটি বিখ্যাত। সারা ইউরোপে সংরক্ষিত দুর্গ যা রয়েছে এটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ১০৭৭ সালে আর্চবিশপ গেরহার্ড এটা তৈরি করিয়েছিলেন। আমি যখন গেছি তখন দুর্গে ঢোকা বন্ধ, রেস্টোরেশনের কাজ হচ্ছে। আমার তাড়াও রয়েছে, মোৎজার্টের মুখোমুখি হবার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। পরে জেনেছি দুর্গে উঠতে ফিউনিকিউলার হয়েছে, খাড়া রেলপথে উঠে যাবেন, কিন্তু পায়ে চলা পথের রম্যাণি বীক্ষ আর তাতে কী পাওয়া যাবে?

কী খাই কী খাই করতে করতে নিচে নেমে নদীর পার থেকে ঢালে একটা স্যান্ডউইচের দোকান খুব পছন্দ হলো। বসে খাওয়া যায়। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক যত্ন করে সার্ভ করলেন স্যান্ডউইচ ও কফি। তৃপ্তি করে খেলাম, নদীর পারে বসে লম্বা একটা সিগারেটও। এক দশক পরে যখন গেছি, সঙ্গে শ্রীমতীও এবার, খাবার দোকানের খোঁজে আমি আবার সেখানে এসে দেখি সমস্ত ইমারতি উল্লাসকে তুড়ি মেরে দোকানটা তখনো রয়ে গেছে। তবে চালাচ্ছে একটি অল্পবয়সী ছেলে। বললাম — দশ বছর আগে কি তোমার বাবাকেই দেখেছি স্যান্ডউইচ বানিয়ে সার্ভ করতে? সে বলল — ঠিকই ধরেছেন, তবে বাবা নন, তিনি শ্বশুর আমার আর ওই হলো শ্বশুরের মেয়ে। দেখি কাপ-প্লেট পরিষ্কার করা, টেবিল গোছানো এবং কাউন্টারে পয়সা নেবার কাজ করছে সেই মেয়ে। এস ওয়াজেদ আলি কোথায় আর নেই বলুন!

সালজবুর্গের সবচাইতে সুন্দর যেটা তা হলো তার কালো কবলস্টোনে মোড়া পথ, আর পথের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হলো গেট্রাইডেগ্যাসে, যার অর্থ হলো শস্য-পথ, ইংরেজি করলে গ্রেইন লেন। সালজবুর্গ এককালে প্রসিদ্ধ ছিল বাণিজ্যের জন্য এবং বাণিজ্যের মধ্যে প্রধান ছিল লবণ। লবণকে বলা হতো সাদা সোনা —হোয়াইট গোল্ড। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সল্ট মাইনিং শুরু হয় সেখানে এবং পুরোটাই আর্চবিশপের নিয়ন্ত্রণে আসে। সারা বাভারিয়ার লবণ সরবরাহকারী ছিল এই শহরের বণিকরা এবং তাদের দৌলতে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে নাম করেছিল এই ছোট্ট শহরটি। গেট্রাইডেগ্যাসে হলো সেই পথ যার দুপাশে নুন, তেল, দানাশস্যাদি ছাড়াও সোনা-রুপার দোকান, অলঙ্কার ও স্ফটিকের কাটাইঘর, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবসাকেন্দ্র চালু ছিল পারিবারিকভাবে। এখন সেই পারিবারিক ব্যবসাকেন্দ্রগুলোই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সবথেকে নামী নামী ব্র্যান্ডের শোরুম। পথ থেকে বোঝার উপায় নেই এক-একটার বিস্তার কতটা গভীর। রাস্তা সংকীর্ণ এবং উঠে গেছে পাহাড়ের দিকে, পাশাপাশি দু-তিনজন হাঁটাই মুশকিল। কিন্তু এই রাস্তার শপিং সারা পৃথিবীর শপাহোলিক নারী-পুরুষকে টেনে আনে সালজবুর্গ শপিং ফেস্টিভ্যালে। এই পথের সব থেকে বিখ্যাত বাড়িটির নম্বর ৯, গেট্রাইডেগ্যাসে। মোৎজার্ট জন্মেছিলেন এই বাড়িতে। চাপা পারিপার্শ্ব, যেন দম নিতে কষ্ট হচ্ছে এমন প্রতিবেশে উজ্জ্বল হলুদ আর টারকোয়েজ ব্লু রঙের এই বাড়িতে শুরু হয়েছিল প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর। বলা দরকার, শহরে আরও একটা মোৎজার্ট হাউস আছে এবং সময় থাকলে দুটোই দেখা উচিত, তবে অধিকাংশ ভ্রমণার্থী এটা করেনই, অন্যটা সময় পেলে তবেই। মোৎজার্টের বাবাও ছিলেন খ্যাতনামা, তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁর বইগুলো তখন ছিল বেস্টসেলার। দোতলার ঘরগুলো কিছুটা অপ্রশস্ত এবং আসবাব নেই বললেই চলে। রয়েছে তাঁর ভায়োলিন, চুলের কৃত্রিম বিনুনী, একটি পিয়ানো ইত্যাদি। বেশি সুন্দর বরং নিচের তলার ফ্যামিলি স্তমগুলো। এখানে রয়েছে দুটো ঘর জুড়ে একটা মডেল অপেরা হাউস এবং আদি থেকে আধুনিক পর্যন্ত অপেরার বিবর্তনের একটা চেহারা। সাউন্ড বুথে শুনে নেওয়া যায় মায়েস্ত্রোর নানা পিস। আমার প্রথমবারের অভিজ্ঞতা ছিল সঙ্গীতময়, দ্বিতীয়বার সঙ্গীত চাপা পড়েছে ক্যাকোফোনির তলায়। কী আর করা! বাইরে বেরিয়ে পেলাম সারিবদ্ধ চকোলেটের দোকান। টোবলারোন চকোলেটের বিশাল শোরুম, সেলসের লোকেরা সবাই মোৎজার্ট সাজে। বড় বক্স থেকে শুরু করে গোলাকৃতি চ্যাপ্টা চকোলেট কয়েন —সব মোৎজার্ট র‍্যাপারে মোড়া। আমি স্মৃতি কিছু নিয়ে যাই ভেবে চাইলাম মোৎজার্ট কয়েনবার। সেলসম্যান ওজন করে মোড়কে ভরতে ভরতে বলল —হুইচ কান্ট্রি স্যর? বললুম —ইন্ডিয়া। শুনে সে আমাকে চমকে দিয়ে বললে —মিঠুন চক্রবর্তী? দু-কলি গেয়েও দিল —আই অ্যাম এ ডিস্কো ড্যান্সার!

বলে কী! এ যে আমাদের উত্তর কলকাতার গৌরাঙ্গ চক্কোত্তির কথা বলছে!

—তুমি জানলে কী করে? হিন্দি মুভি দেখ? তার কাজ চালানো ইংরেজিতে আলাপ দীর্ঘ হবার সুযোগ ছিল না, তবে জানা গেল তুর্কি যুবক সে, বলিউড রিক্রিয়েশন

তার। মোৎজার্টের বাড়ির ঠিক পাশে বসে, মোৎজার্ট পোশাকে তার ডিস্কো ড্যান্সার নাচ দেখার সুযোগ হাতছাড়া হলো —এই আক্ষেপ আমার আজও যায়নি! হেলব্রুন প্যালেস, ফ্রান্সিসকান চার্চ আর কলেজিয়েট চার্চের কথা এই লেখায় আর বলার সুযোগ থাকল না। তবে যেকোনো দিনই মায়াবী সালজবুর্গের সেসব রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাবেন ওই তো হাতে ছোট্ট চামড়ার স্যুটকেস হাতে দো-রে-মি গাইতে গাইতে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে মারিয়া নামের মেয়ে।

অরুণোদয়ের অরূপতীর্থপথে...

কামরুল হাসান

শৈশব থেকেই জানি জাপান সূর্যোদয়ের দেশ। সূর্যরশ্মির স্পর্শ পাওয়া প্রথম দেশ জাপান। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পড়েছিলাম আণবিক বোমায় ধ্বংস হওয়া হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ও মহাযুদ্ধের নির্মমতার বিবরণ। জাপানি জনগণের প্রতি মমত্ব গড়ে উঠেছিল সে থেকেই। আরও বড়ো হয়ে জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সাথে জাপানের আত্মিক যোগাযোগ এবং সে দেশে কবিগুরুর মর্যাদা। দু-দুটো আণবিক বোমার আঘাতে পর্যুদস্ত দ্বীপ দেশটির বিধ্বস্ত অর্থনীতি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো এবং ক্রমে এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হয়ে ওঠার বিস্ময়কর পরিবর্তনও জেনেছি। আরও পরে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ব্যবস্থাপনা পড়তে এসে জেনেছি জাপানে প্রবর্তিত কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের দর্শন ও প্রয়োগ।

জাপান সম্পর্কে তাই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক আর যখন বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ পর্যটক তাদের দেখা দেশসমূহের মাঝে জাপানকে তালিকার এক নম্বরে রাখেন তখন দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। শৈশবে ক্যালেন্ডারে জাপানের যেসব ছবি দেখেছি সেগুলো ফুল ও উদ্যানের অনন্য শৈল্পিক মাধুর্য মেলে ধরেছিল, ছিল আইকনিক বরফচূড়ার পর্বত ফুজিয়ামা আর জাপানি প্যাগোডার দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য!

একবার কথা বলছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সাথে। তিনি তখন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য। দুনিয়ার অনেক দেশ ঘুরে দেখা অধ্যাপক ফকরুল আলমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম

তাঁর দেখা সবচেয়ে সুন্দর দেশ কোনটি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'জাপান'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের কৃতি অধ্যাপক ড. এ বি এম শহিদুল ইসলামেরও একই অভিমত। তিনি কনফারেন্সে যোগ দিতে কয়েকবারই জাপান গিয়েছেন। জাপানের প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন তিনি আমাকে জাপানে নিয়ে যাবেন। আমার মন নেচে উঠেছিল এশিয়ার গর্ব জাপান দেখার আগ্রহে।

বছর গড়ায়, সুযোগ আর আসে না। সে সুযোগ এলো এমন একটি বছরে যে বছর আমার ব্যক্তিগত ভ্রমণভাগ্য অনন্য। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমি সফর করেছি মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যমণি, মুসলিম দুনিয়ায় মর্যাদাপূর্ণ দেশ সৌদি আরব। জুনে ভ্রমণ করেছি দুনিয়ার এক নম্বর, সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অক্টোবরে এলো এশিয়ার অহংকার জাপান যাবার আহ্বান। আহ্বান জানালেন ড. এ বি এম শহিদুল ইসলাম।

সোশ্যাল বিজনেস, সোশ্যাল প্রযুক্তি ও সোশ্যাল স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কনফারেন্স হবে জাপানের ঐতিহাসিক নগরী হিরোশিমায়। সেখানে গৃহীত হয়েছে ড. এ বি এম শহিদুল ইসলামসহ আরও কয়েকজনের লেখা পেপার। আমার নামও সে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন তিনি। টোকিওর সোফিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ান বাংলাদেশি শিক্ষক ড. ফরহাদ হোসেন বিপু, যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং কনফারেন্স পেপারটির একজন লেখক। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় আমার নামে আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিলেন আয়োজক কমিটির ডা. মশিউর রহমান। ফি মাত্র ১২০০০ টাকা। তা পাঠিয়ে দিলে আমাকে কনফারেন্সে যোগদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হলো অর্থাৎ আমি তালিকাভুক্ত।

রইল বাকি জাপানি ভিসা। এই প্রথম ভিসা আবেদন করতে গিয়ে এক অদ্ভুত আবদার শুনলাম। আমি একজন নিয়মিত করদাতা কি না তার প্রত্যয়নপত্র অর্থাৎ ট্যাক্স সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। তাও সর্বশেষ তিন বছরের। ট্যাক্স জমা দিলেও সার্টিফিকেট সবসময় নেওয়া হয় না। আমি ছুটলাম সেগুনবাগিচা ট্যাক্স অফিসে। আমাদের ভিসা প্রসেসিং করে দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা যিনি এসব কাজে দক্ষ। ভিসা পেলাম এমন এক সময়ে যখন ফ্লাইটের বাকি দশদিন। স্বভাবতই বিমান টিকেটের দাম চড়ে গেছে, এমনকি জাপান রুটে সবচেয়ে ইকোনমি এয়ারলাইনস চায়না ইস্টার্নেও কোনো ইকোনমি সিট নেই। কারণ অক্টোবরের প্রথমদিকে চীনাদের কী এক উৎসব ছুটি; বাংলাদেশে কর্মরত হাজার হাজার চীনা ছুটেছে স্বদেশ অভিমুখে, চায়না ইস্টার্নে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই। আছে, তবে তা হলো বিজনেস ক্লাস, দাম দ্বিগুণ।

মনটা দমে গিয়েছিল। উদ্ধারে এলো বনানীস্থ ফার্স্ট গ্লোবাল সার্ভিস নামের ট্রাভেল এজেন্সির বিপণন কর্মকর্তা সাইফুল হাসান। আমাকে তিনি পরামর্শ দিলেন সরাসরি হিরোশিমা না গিয়ে টোকিও যেতে, সেখান থেকে বুলেট ট্রেনে হিরোশিমা যেতে। আইডিয়াটি চমৎকার, কারণ তাতে যেমন বুলেট ট্রেনে চড়া হবে, তেমনি দেখা হবে জাপানের ভূ-প্রকৃতি, জনপদ। থাই এয়ারওয়েজের প্লেন যাবে তার হাব ব্যাংকক হয়ে। টিকেটের দাম চড়া হলেও সে মুহূর্তে ওটাই ছিল সাশ্রয়ী।

সুবিধা ছিল হিরোশিমায় কনফারেন্সের তারিখ আর দুর্গাপূজার ছুটি মিলে যাওয়া। কিন্তু অতদূর গিয়ে, অত রৌপ্যমুদ্রা গুনে, অত আতশবাজি পুড়িয়ে কনফারেন্স শেষেই ফিরে আসলে পোষাবে? ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে সবে হেমন্তকালীন সেমিস্টার শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চান না, না চাওয়াই স্বাভাবিক, কোনো শিক্ষক সেমিস্টার শুরুর দিনগুলোয় অনুপস্থিত থাকুক। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক বিচক্ষণ মানুষ, তাঁর সহমর্মিতা প্রবল, উপলব্ধি প্রগাঢ়। তিনি আমার দরখাস্তে অতিরিক্ত ৪ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন।

আমি খুঁজতে লাগলাম কাকে কাকে বলা যায় জাপানি সংযোগ আবিষ্কার করতে। প্রথমেই মনে এলো কমরেড আবদুল হালিম খানের কথা, যিনি কয়েক বছর, বিক্রমপুরের আরও অসংখ্য মানুষের মতো, জাপানে ছিলেন। আশাবাদী মানুষটি যে উৎসাহ নিয়ে মানুষকে ভালোবাসেন, তার প্রতিদান প্রায়শই পান না। প্রিয় ভক্তদের নীরবতা তাঁকে সইতে হলো বিব্রত হয়ে। আমি মাহমুদ হাফিজের সুবাদে চিনতাম শেখ এমদাদকে, তিনিও নীরব রইলেন। তিনি অবশ্য এখন ঢাকায়। অপর যে মানুষটিকে আমি জাপানের সাথে সমার্থক ভাবি, তিনিও বিক্রমপুরের। তার নাম আবদুল হান্নান খান। পদ্মাপাড়ের মানুষটির উদ্দীপনার অন্ত নেই। তিনি মেসেঞ্জারে কানেক্ট করে দিলেন টোকিও প্রবাসী মিলনের সাথে।

> আমার পায়ের তলে সর্ষে। লুবনা ঘরকুনো। আমি সূর্যকে চাদরের মতো জড়িয়ে নিয়ে পথে বের হই, লুবনা চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রাখে রোদ যেন গায়ে না লাগে। আমি পাহাড় দেখলে লাফিয়ে উঠি, লুবনা দমে যায়।

আমার চাচা জিয়াউল কুদ্দুসকে জানাতে তিনি বললেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার এক আত্মীয় অধ্যাপনা করে। সে ভদ্রমহিলা আমাকে প্রচুর পরামর্শ দিতে থাকলেন। ভাবলাম তিনি আমার লোকাল গাইড হবেন। প্রকৃতপক্ষে কনফারেন্সে যোগদানে আমাকে যথোপযুক্ত সাহায্য করেছেন ড. ফরহাদ হোসেন বিপু। তিনিই ছিলেন আমার জাপান কন্টাক্ট।

আমার মনে পড়ল চিত্রশিল্পী রফি হক ও চলচ্চিত্র বোদ্ধা কবি দিলদার হোসেন জাপানে গিয়েছিলেন। দিলদার হোসেনের সাথে শাহবাগে দেখা করার কথা বলেও যেতে পারলাম না সময়াভাবে। রফি হক ব্যস্ত ছিলেন অন্য কাজে। আমার এক বোনঝি মুমু থাকে জাপানে, টোকিওর বাইরে মফস্বলে। তার ঠিকানা সংগ্রহ করলাম।

দুর্ভাগ্য যে আমার জাপান সফরের মেন্টর অধ্যাপক এ বি এম শহিদুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন, এতটাই যে তিনি আর জাপান যেতে পারলেন না। মন বিষণ্ন হয়ে গেল। একবার ভাবলাম আমিও যাব না। তিনি কিন্তু আমাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন আমি যেন যাই। কারণ এটাই আমার প্রথম জাপান সফর আর তিনি জাপানে গিয়েছেন কয়েকবার।

অরুণোদয়ের অরূপতীর্থে যাত্রা হলো শুরু!

২. আজ দু'জনার দুটি পথ দুটি দিকে গেছে বেঁকে

বহুকাল লুবনাবিহীন একা একা বিদেশ ঘুরে আমি পেয়েছি স্বার্থপর স্বামীর তকমা। স্ত্রীকে ডাঙায় রেখে সাগরে ভাসা নাবিক যার প্রিয় সংগীত হলো 'ওরে নীল দরিয়া...'। লুবনার বান্ধবীদের নিয়ে তৈরি করা জুরি বোর্ড আমাকে আজীবন সশ্রম কারাদণ্ডের স্থগিত রায় দিয়েছে।

বহুকাল পরে সুযোগ মিলেছিল একসঙ্গে ওড়ার। ভিসাও পেয়েছিলাম একসঙ্গে একদেশে যাওয়ার। মহাদেশের মতো এক দেশ সেটা। সেখানে আমাদের যমজ ছেলেদের একজন প্রান্ত পড়াশোনা করতে গিয়েছিল দু-বছর আগে। এই অক্টোবরের মাঝামাঝি তার সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রান্ত চেয়েছিল মা-বাবা দুজনেই উপস্থিত থাকুক তার জীবনসাফল্যের একটি মাহেন্দ্রক্ষণে। আমার পায়ের তলে সর্ষে। লুবনা ঘরকুনো। আমি সূর্যকে চাদরের মতো জড়িয়ে নিয়ে পথে বের হই, লুবনা চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রাখে রোদ যেন গায়ে না লাগে। আমি পাহাড় দেখলে লাফিয়ে উঠি, লুবনা দমে যায়।

পর্যটনে আমি ক্লান্তিহীন, লুবনা বিশ্রাম খোঁজে। আমি জানি ভ্রমণ শারীরিক সুখ দেবে না, উপহার দেবে কষ্ট ও ক্লান্তি, লুবনা অত ঝামেলায় জড়াতে চায় না। আমি থাকতে পারি রেলস্টেশনে, ঘুমাতে পারি ক্যাপসুল হোটেলে, লুবনার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আমাদের একত্রে না বেড়ানোর আরেক কারণ হলো মা, ছানাপোনাদের ছাড়া ঘুরতে পারে না, চায়ও না। বাবা অত সকাতর নয়, তার হৃদয় পাষাণেমোড়ানো না হলেও স্বার্থমোড়ানো। সকলকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণের সাধ তারও আছে, সাধ্য নেই। সে একাকী ঘোরে কেননা সে ভাবে তার ভ্রমণ পরিবারের জন্য যতখানি প্রয়োজন, বৃহত্তর পাঠকদের জন্যও তা কম প্রয়োজনীয় নয়।

কপোত-কপোতী উড়তেই পারত, তবে ছয়জনকে নিয়ে ওড়ার ক্ষমতা তাদের একবারই হয়েছিল। সেবার আমরা মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেছিলাম।

এবার দুজনের একসঙ্গে সিডনি যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, কিন্তু Man proposes, God disposes প্রবাদ ফের সত্যি হলো। প্রান্তর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি এমন সময়ে এলো যখন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে হেমন্তকালীন সেমিস্টার কেবল শুরু হবে। এমন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি মঞ্জুর করবে না, আর করলেও এক সপ্তাহের বেশি নয়। অতগুলো মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে অত তেল (পড়তে হবে টাকা) পুড়িয়ে অতদূর দেশে গিয়ে এক সপ্তাহ কাটালে কি পোষাবে? পোষাবে না।

দৈবের কী যোগ জাপানের কনফারেন্সের আমন্ত্রণ এলো অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যক্তিগত ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করলেও কনফারেন্সে যোগ দেওয়াকে উৎসাহিত করে, কারণ এটি একাডেমিক। জাপানের ভিসা মিলল আর কনফারেন্সের তারিখ পড়ল দুর্গাপূজার ছুটির ভেতর। সিডনি থেকে প্রান্ত ওর মায়ের

জন্য যে টিকেট পাঠিয়েছিল তার উড্ডয়ন তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। জাপান যাবার জন্য আমি যে টিকেট কিনলাম তার তারিখও ৩০ সেপ্টেম্বর। শুধু তারিখ নয় দুটো ফ্লাইটের সময়ও কাছাকাছি। বিগত দিনটির মধ্যরাত পেরিয়ে নতুন দিনটির সূর্য-না-ওঠা প্রথম প্রহরসমূহে।

লুবনা যেহেতু কখনো একা একা ভ্রমণ করেনি, সে বিমানে চড়ার বিবিধ আনুষ্ঠানিকতা, একাধিক ঘাটে নৌকা (লাগেজ ট্রলি) ভিড়ানো ইত্যাদি নিয়ে সংশয়ে ছিল। ঢাকা এয়ারপোর্টে সে দ্বিধা কেটে গেল আমি সঙ্গে থাকায়। লুবনার ক্যারিয়ার ক্যাথে প্যাসিফিক, আমার থাই এয়ারওয়েজ। ক্যাথে প্যাসিফিক সিডনি যাবে হংকং হয়ে, থাই এয়ারওয়েজ টোকিও যাবে ব্যাংকক হয়ে।

একটি বিমান উড়বে পূর্বদিকে, অপরটি দক্ষিণ-পূর্বদিকে। ওর ডিপারচার গেট ৭, আমারটি ১১। আমরা একসঙ্গে ইমিগ্রেশন পার হই, স্কাই লাউঞ্জে গিয়ে আপেলের রস ও স্যুপ খাই। লুবনাকে ওর ডিপারচার গেটে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে আসি আমার শকটের প্রবেশ দরজায়। লুবনার বিমান যখন উড়ে গেল আমি তখনো বিমানবন্দরে। আমিও উড়ব একটু পরেই।

লুবনার ক্যারিয়ার ক্যাথে প্যাসিফিক, আমার থাই এয়ারওয়েজ। ক্যাথে প্যাসিফিক সিডনি যাবে হংকং হয়ে, থাই এয়ারওয়েজ টোকিও যাবে ব্যাংকক হয়ে।

আজ দুজনার দুটি পথ সত্যি দুটি দিকে গেছে বেঁকে।

৩. ব্যাংকক সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে

বিমানবন্দরটির নাম সুবর্ণভূমি। ভারী সুন্দর, ভারী মহাভারতীয় নাম। কাল ভোর তিনটারও পরে এক বিপুলদেহী এয়ারবাসে উড়ে এখানে যখন পৌঁছাই তখন ভোর। মেঘসাম্রাজ্য অরুণ বরুণ কিরণমালা হয়ে উঠছে।

ঢাকা ছেড়ে এসেছি তিন ঘণ্টার কম সময়, অথচ দুটো এয়ারপোর্টের মাঝে আকাশপাতাল তফাৎ। অথচ দুটোই এশিয়ার বিমানবন্দর। ব্যাংকক যদি হয় বিউটি কুইন, ঢাকা তবে পেঁচি।

সব এয়ারলাইনসই সুযোগ পেলে স্ব স্ব হাবে এনে ফেলে। জাপান যাচ্ছি থাই এয়ারওয়েজে চড়ে। ব্যাংককে আসা সে কারণেই। আমার ট্রানজিট বেশ দীর্ঘ, পনেরো ঘণ্টার। আমি অবশ্য অখুশি নই, কারণ এই বিমানবন্দরটি স্থাপত্য সৌন্দর্যে এতই আকর্ষণীয় যে তা দেখেই কাটানো যায় পনেরো ঘণ্টা। উপরন্তু রয়েছে সারি সারি হংসবলাকা অর্থাৎ প্লেনসারি। রয়েছে জৌলুশভরা সব দোকানপাট, আর সারা পৃথিবীর মানুষজন, তাদের কিছু কিছু নমুনা। বিগত রাতে ঘুম হয়নি সম্পূর্ণ, ভোরবেলা তার কিছুটা পূরণ করি ওয়েটিং জোনের বেঞ্চিতে ঘুমিয়ে।

পরে শাটল ট্রেনে চড়ে চলে আসি মূল টার্মিনালে। এখানে প্রথম যে বিপত্তির মুখোমুখি হই তা হলো মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে যাওয়া। মোবাইল সচল নেই তো আপনি দুনিয়ার বাইরে। কামেল নামক এক অস্ট্রেলীয় যুবক আমার (মোবাইলে) জীবন ফিরিয়ে আনে তার পাওয়ার ব্যাংক ধার দিয়ে।

সকালে ব্রেকফাস্ট হয়নি তার দরকারও ছিল না, কেননা ভোর পাঁচটায় থাই এয়ারওয়েজের বেগুনিবর্ণা বালিকারা ডিনারই সাজিয়ে এনেছিল ট্রেতে। পরে দুপুর নাগাদ ক্ষুধা লাগলে এক কোরিয়ান রেস্তোরাঁয় বসে কোরিয়ান ফুড খাই যা ছিল মূলত নুডলস, সঙ্গে ডিম ও সসেজ। গরম আর ঝাল ছিল বলে স্বাদ বেশি। দোকানটির নাম Bonchon, বিপরীত জাপানি রেস্তোরাঁটির নাম Kosuke।

৪. জাপানি সৌজন্যবোধ

নারিতা বিমানবন্দরে নেমে ইমিগ্রেশন ফরমালিটি সমাপ্ত ও লাগেজ সংগ্রহ শেষে আমার প্রথম কাজ হয় জাপান রেলের পাস সংগ্রহ করা। বাংলাদেশ থেকে কিনতে পারিনি সময়াভাবে, পারলে ভালো হতো। কারণ এখন সেটি কিনতে হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে। কাউন্টারে রেলের টিকেট দিবে, রেল পাস দিবে না। যেখানে লোকেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে টিকেট কাটছে। ইস্টার্ন জাপান রেলের বৃহৎ কাউন্টারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি প্রৌঢ় বয়সের। তিনি আমাকে ওয়েবসাইটের কিউআর কোড স্ক্যান করে ফর্ম ফিলাপ করতে বলেন। ফর্মটি যতবার ওপেন করি ততবার প্রথমে একটা ইমেল ঠিকানা চায়। আমার দুটি জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে। কোনোটিই সিস্টেম গ্রহণ করে না। বলে, অ্যাকাউন্ট আইডি আর পাসওয়ার্ড মিলছে না। সেখানে নতুন ইমেল আইডি খোলার অপশন আছে, সেটাও কাজ করে না। আমাকে রেল পাস পেতে টোকিও থেকে টেলিফোনে সাহায্য করছিল ফরাজি মিলন। সে এতটাই আন্তরিক যে নিজের ইমেল আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়েছিল, সেটাও কাজ না করলে হতাশ হয়ে পড়ি। সেই প্রৌঢ় জাপানি আমাকে প্রতিবার কিউআর কোডটি স্ক্যান করার জন্য এক প্লাস্টিক ফোল্ডার থেকে পাতাটি বের করে সম্মুখে মেলে ধরেন। আর চেষ্টা করেন আমাকে সাহায্য করতে। প্রতি মুহূর্তে গেটে রেলযাত্রীরা আসছে, তিনি তাদের গাইড করছেন, কাউকে ভেতরে ঢোকাচ্ছেন, কাউকে দূরের কাউন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর ফাঁকে ফাঁকে আমাকে সাহায্য করছেন। আমি তিক্ত-বিরক্ত হই, হতাশা প্রকাশ করি, ক্লান্ত হই। তিনি ক্লান্তিহীন। তার মূলমন্ত্র হলো 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। আমি দশবার চেষ্টা করে JR Pass পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করি। প্রৌঢ় মানুষটি তখনো আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

হিরোশিমা রেলস্টেশনে নেমে মানি এক্সচেঞ্জ খুঁজছিলাম। যা খুঁজে পেলাম তা হলো একটি মানি এক্সচেঞ্জ মেশিন। প্রথমত এমন মেশিন আমি কখনো ব্যবহার করিনি, দ্বিতীয়ত পর্দায় ভাসা নির্দেশনা জাপানি ভাষায় লেখা, মেশিনের গায়েও জাপানি বর্ণমালা। পাশের এটিএম মেশিনে টাকা তুলছিল এক জাপানি মেয়ে। টাকা তোলা শেষ হলে আমি তাকে অনুরোধ করি আমাকে সাহায্য করতে। সে পর্দায় ভেসে

ওঠা বাটন টিপে। মেশিন পাসপোর্ট চায় (তখনি লক্ষ করি জাপানি ভাষার পাশে ইংরেজি নির্দেশনাও আছে)। আমি পাসপোর্ট স্ক্যানারে রাখি, স্ক্যানার তা পাঠ করে না (মেশিনকে সবুজ পাসপোর্ট বিদ্বেষী বিদেশি অভিবাসন কর্মকর্তা মনে হয়)। এরকম কয়েকবার ব্যর্থ হলে মেয়েটি পাশে রাখা টেলিফোন তুলে মানি এক্সচেঞ্জ হেল্পলাইনে কথা বলে। তারা পাসপোর্ট রাখার সঠিক নিয়মটি বলে দেয়। অতঃপর আমি ডলার ভাঙাতে পারি। কুড়ি ডলারের একটি নোট মেশিন স্লটে ঢুকিয়েছিলাম, এক হাজার ইয়েনের দুটো কড়কড়ে নোট এলো অন্য স্লটে আর ঝমঝম করে কয়েন ঝরল মুদ্রা সংগ্রহের পাত্রে। আমার জন্য জাপানি মেয়েটি ব্যয় করল কমপক্ষে দশ মিনিট। সামান্য বিরক্তি নেই, নেই কোনো তাড়া।

পরদিন ভোরবেলা হিরোশিমা ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের কনফারেন্স ভেন্যুতে যাব। আমাকে গুগল ম্যাপ দেখে যে যুবকটি পথনির্দেশনা লিখে দিল সে অবশ্য কোরিয়ান। নিসিকি বিয়ো মি নামের বাসস্টপেজটি আর খুঁজে পাই না। সেখান থেকে ১৩০ নম্বর বাস যাবে হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে। নিজের বাস মিস করে আমাকে দিক বলে দিয়েছিলেন একজন জাপানি ভদ্রমহিলা। তার নির্দেশিত পথে গিয়ে দেখি বাসস্ট্যান্ড নেই। কনফিউজড হয়ে গাঢ় নীল উর্দিপরা হিরোশিমা রেডক্রস হসপিটালের এক সিকিউরিটি গার্ডকে জিজ্ঞেস করি। এখানে সমস্যাটি হলো ভাষার। প্রথমজন সামান্যতম ইংরেজি জানে না। সে টেলিফোন করে তার এক সহকর্মীকে। সুগুরা নামের, ইনিও প্রৌঢ়, আমাকে নিয়ে যান হাসপাতালের রিসেপশন কাউন্টারে। রিসেপশনিস্ট জাপানি মেয়েটি দীর্ঘাঙ্গিনী, পুতুলের মতো দেখতে। তারা জাপানি ভাষায় অনেকক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বের করে বাসস্টপেজটি কোথায়। সেটি রেডক্রস হাসপাতালের পেছন দিকটায়। পুতুলসদৃশ মেয়েটি জাপানি ভাষায় লেখা একটি কাগজে মুদ্রিত এক পাতার ম্যাপ বের করে তাতে আমরা কোথায় আছি আর কোথায় আমাকে যেতে হবে কলম দিয়ে বৃত্তাবদ্ধ করে তীর চিহ্ন দিয়ে পথটি এঁকে দেয়। সঙ্গে হাতের নির্দেশনাও। কাউন্টার থেকে সোজা যে প্রশস্ত করিডোর গেছে তা ধরে বাইরে যেতে হবে। আমাকে অবাক করে মি. সুগুরা আমার সাথে হাসপাতালের বাইরে আসেন। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেন সড়কের অপরপার্শ্বে কিছুটা দূরের বাস টার্মিনালটি। সুগুরা যৎসামান্য ইংরেজি বোঝেন। ওপাড়ে যেতে দুটো সড়ক জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হতে হবে আর এরপরে একটু হাঁটতে হবে। আমি নির্দেশনা মেনে চলি সেই পথে যে পথ রিসেপশনিস্ট মেয়েটি মানচিত্রে এঁকে দিয়েছিল আর হাতের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মি. সুগুরা। সড়ক পারাপারের জন্য তার হাতের মুদ্রাটি ছিল হাতকে ধনুকের মতো বাঁকা করে সম্মুখপানে গতিশীল করা।

এদের সৌজন্যবোধের শেষ নেই, আমার শেখারও শেষ নেই। জাপানি মানুষেরা আমাকে চমৎকৃত করে চলে বাকি দিনগুলোয়...।

ইনকাদের দেশে

আবদুর রব

স্বপ্নযাত্রার শুরু এবং পথের ধকল

সেবার আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম টিম-২-এর মিটিং ঠিক হলো পেরুর কাহামারকায় (Cajamarca—'জে'-কে এরা 'হ'-এর মতো উচ্চারণ করে)। ইনকা সভ্যতার দেশ পেরু ভ্রমণ নিয়ে আমি আগে থেকেই ভীষণ উৎসাহী ছিলাম। এই যাত্রায় ইউকে, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, জিম্বাবুয়ে, সুদান এবং পেরুসহ বিভিন্ন দেশ থেকে সহকর্মীরা যোগ দেবেন। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন আর কাজের দায়িত্ব—এই দুয়ের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিল এই সফর। দীর্ঘদিন ধরে বইয়ের পাতায় পড়া ইনকাদের রহস্যময় সাম্রাজ্য অন্তত ১৫ দিন স্বচক্ষে দেখতে পাব ভেবে ভেতরে ভেতরে দারুণ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

যাত্রার শুরুতেই দেখা দিল বিপত্তি। ভিসা এবং মিটিংয়ের প্রস্তুতিতে বেশ ধকল পোহাতে হলো। ইনভিটেশন লেটার নিয়ে দিল্লি গিয়েও পেরু দূতাবাস থেকে খালি হাতে ফিরতে হলো, কারণ চিঠি সরাসরি দূতাবাসেই পাঠানোর নিয়ম। অগত্যা আমাদের পেরু অফিসের সহযোগিতায় ভিসা যখন পেলাম, হাতে সময় তখন খুব কম। ট্রাভেল এজেন্সি এমনভাবে রুট প্ল্যান করল যাতে নতুন করে আর কোনো দেশের ট্রানজিট ভিসা না লাগে। প্ল্যান অনুযায়ী ইত্তেহাদ এয়ারলাইন্সে ঢাকা থেকে আবুধাবী হয়ে জোহানেসবার্গ, সেখান থেকে সাউথ আফ্রিকান এয়ারলাইন্সে সাওপাওলো এবং সবশেষে টাকা (TACA) এয়ারলাইন্সে লিমা। ভিসা জোগাড়

করার এই দুঃসাধ্য দৌড়ঝাঁপ এবং এতগুলো দেশের আকাশসীমা পেরিয়ে যাওয়ার রুট প্ল্যান আমার কাছে ওডিসিউসের বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার মতো মনে হলো। যাত্রার শুরুতেই এসব ঝক্কি আমাকে বেশ ক্লান্ত করে তুলেছিল; কিন্তু গন্তব্য যখন ইনকাদের দেশ, তখন কোনো বাধাই আর বাধা মনে হচ্ছিল না।

আবুধাবীতে যাত্রাবিরতি ছিল দীর্ঘ সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। সেখানে আমার কলিগ নাহারের স্বামী কালাম জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। তিনি আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন এবং বিকেলের দিকে আমরা সমুদ্র সৈকতে ঘুরলাম। ১৬ই জুন ২০০৭, রাত দুটো পঁচিশে ইত্তেহাদের ফ্লাইটে রওনা দিয়ে পরদিন সকালে জোহানেসবার্গে পৌঁছলাম। সেখান থেকে সাওপাওলো হয়ে যখন বিকেলে ব্রাজিলের মাটিতে পা রাখলাম, তখন দেখা হলো জিম্বাবুয়ের অ্যালেক্স এবং নেপালের পূর্ণ ছেত্রীর সঙ্গে। আমরা তিনজনই টাকা (TACA) এয়ারলাইন্সে লিমা যাব। টাকা এয়ারলাইন্স ল্যাটিন আমেরিকাজুড়ে জনপ্রিয় এবং সাশ্রয়ী। কিন্তু কাউন্টারে গিয়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—ফ্লাইট ওভারবুকড, আমাদের সিট নেই! ওরা বলল পরদিন যেতে, কিন্তু আমাদের তো ব্রাজিলের ভিসা নেই! অচেনা এক মহাদেশের ট্রানজিট লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ছিলাম, অথচ বাইরে বের হওয়ার কোনো আইনি অনুমতি নেই—ভেবে সেই মুহূর্তে নিজেদের যে কতটা অসহায় লাগছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শেষমেশ অনেক চেঁচামেচি করে আমরা লিমার ফ্লাইটে ওঠা নিশ্চিত করলাম।

রাত প্রায় নয়টার দিকে আমরা লিমা পৌঁছালাম, কিন্তু নাটকের শেষ অংক তখনও বাকি ছিল। ইমিগ্রেশন শেষে দেখা গেল পূর্ণ ও অ্যালেক্সের ব্যাগ এলেও আমার ব্যাগ আসেনি। এর আগে বার্মিংহামেও আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তবে সেবার এমিরেটস এয়ারলাইন্স পরদিন সকালেই আপিংহাম গ্রামে গিয়ে ব্যাগ পৌঁছে দিয়েছিল। সেই আশায় বুক বেঁধে, ব্যাগেজ ক্লেইম ফর্ম পূরণ করে আমরা যখন অফিসের গাড়িতে হোটেল 'হোসে অ্যান্টোনিও'-তে পৌঁছালাম, তখন রাত সাড়ে এগারোটা। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে কাতর। তার চেয়ে বড় সমস্যা, আমার গায়ে বা হ্যান্ডব্যাগে শীতের কোনো কাপড় নেই, অথচ লিমায় অনেক শীত। কনকনে ঠান্ডায় ভিনদেশে লাগেজ ছাড়া অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতি চরম যন্ত্রণাদায়ক। ভেবেছিলাম ১-২ দিনেই ব্যাগ পেয়ে যাব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৪-৫ দিন খোঁজ নিয়েও ব্যাগের সন্ধান মেলেনি। অগত্যা জরুরি ভিত্তিতে কিছু কাপড় কিনে পেরু সফর শেষ করতে হয়েছিল। দেশে ফিরে ঢাকায় কমপ্লেইন করার প্রায় ২০ দিন পর জেনেছিলাম যে ব্যাগটি জোহানেসবার্গেই পড়ে ছিল। দীর্ঘ বিমানযাত্রা, ফ্লাইট মিস করার শঙ্কা আর লাগেজ হারানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা শুরুতে কিছুটা হতাশা তৈরি করলেও, নতুন একটি দেশ দেখার রোমাঞ্চ আমাকে ভেতরে ভেতরে উজ্জীবিত করে রেখেছিল।

২. লিমাঃ প্রশান্ততীরে প্রকৃতির ঝুলবারান্দা

এতসব ঝক্কি-ঝামেলার পরেও, পরদিন সকালে যখন লিমার রাস্তায় বের হলাম, সব ক্লান্তি যেন ধুয়ে গেল। টিম মিটিং শুরু হওয়ার কথা ১৮ তারিখ থেকে, তাই ১৭ তারিখ সারাদিন আমরা লিমা ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম। লিমা পেরুর রাজধানী ও বৃহত্তম শহর, যা চিলোন, রিমাক এবং লুরিন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। আমরা সকালের নাস্তা সেরে মিরাফ্লোরেস সি বিচের দিকে ছুটলাম। মিরাফ্লোরেস এলাকাটি সমুদ্রের সমতলে নয়, বরং সাগরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিশাল খাড়া পাহাড় বা 'ব্লাফ'-এর (Bluff) ওপর অবস্থিত। শহরটি যেন এক সুউচ্চ প্রাকৃতিক বারান্দা, আর তার ঠিক নিচেই আছড়ে পড়ছে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউ। প্রশান্ত মহাসাগরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটি ব্লাফের ওপর অবস্থিত এই বিচটি সার্ফার এবং প্যারাগ্লাইডারদের কাছে খুব জনপ্রিয়।

অনেকেই বিচ বলতে নরম বালুর কথা ভাবেন, কিন্তু মিরাফ্লোরেসের সৈকত বা 'কোস্টা ভের্দে' (Costa Verde) পুরোটাই মসৃণ গোল নুড়ি পাথরে (Pebbles) ঢাকা। এখানে খালি পায়ে হাঁটা এক ধরনের আকুপাংচারের মতো কাজ করে বা অবস্থা হয়! সাগরের ঢেউ যখন এই পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন এক অদ্ভুত সুন্দর 'ঝনঝন' শব্দ শোনা যায়, যা অন্য কোনো বালুকাময় সৈকতে পাওয়া যায় না। নুড়ি পাথরের ফাঁক গলে সাগরের জল যখন ফিরে যায়, তখনকার সেই ছন্দময় ঝনঝন শব্দ যেন সব নৈরাশ্যকে প্রশান্ত মহাসাগরের অতলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হাঁটার সময় মাথার ওপর তাকালে দেখা যায় পাখির মতো মানুষ উড়ছে! কারণ, মিরাফ্লোরেস লিমার একমাত্র জেলা যেখানে প্যারাগ্লাইডিং করার অনুমতি আছে। আমরা এখানকার বিখ্যাত 'লারকোমার' (Larcomar) শপিং মলের পাশ দিয়েও হাঁটলাম। একে বলা হয় 'নিনজা মল' বা অদৃশ্য শপিং মল। কারণ এটি মাটির ওপরে নয়, বরং পাহাড়ের খাদের (Cliff) ভেতরে গর্ত করে বানানো হয়েছে। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় শুধুই পার্ক, কিন্তু নিচে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে ঝুলে আছে বিশাল এক মার্কেট।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা 'পার্ক অফ লাভ' (Parque del Amor)-এ গেলাম। এখানে 'দ্য কিস' নামের বিশাল এক ভাস্কর্য আছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে এই পার্কে 'সবচেয়ে দীর্ঘ সময় চুমু খাওয়ার' প্রতিযোগিতাও হয়! পার্কটি ১৯৯৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি (ভালোবাসা দিবসে) উদ্বোধন করা হয়।

কেনাকাটার জন্য আমরা গেলাম অ্যাভিনিউ পেটিট থুয়ার্সে। তবে এটি কেবল অ্যাভিনিউ নয়, মার্কেটের গোলকধাঁধা! অ্যাভিনিউ পেটিট থুয়ার্সের ৫২ থেকে ৫৫ নম্বর ব্লক পর্যন্ত এলাকাটিকে বলা হয় 'মার্কেট প্যারাডাইস'। এখানে পাশাপাশি অনেকগুলো আর্টিজান মার্কেট (যেমনঃ ইনকা মার্কেট, ইন্ডিয়ান মার্কেট) রয়েছে, যা আসলে কয়েক হাজার ছোট ছোট দোকানের সমষ্টি। ভেতরে ঢুকলে মনে হবে এক রঙিন গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেলাম! যেহেতু আমার লাগেজ আসেনি এবং

বেশ ঠান্ডা, তাই বাধ্য হয়ে বেবি আলপাকার পশমে তৈরি বটল গ্রিন রঙের একটা চমৎকার সোয়েটার কিনে ফেললাম। আমার কলিগ দানিয়েল রদ্রিগস আসল বেবি আলপাকার এই সোয়েটারটা কিনতে সাহায্য করে। দানিয়েল বলল, এখানে কেনাকাটার সময় একটি খুব প্রচলিত কৌতুক বা সাবধানবাণী আছে। অনেক দোকানদার সিন্থেটিক উলকে 'আলপাকা' বলে চালিয়ে দেয়। অভিজ্ঞ পর্যটকরা তাই মজা করে বলেন, এটি কি 'বেবি আলপাকা' নাকি 'মেবি (Maybe) আলপাকা'? আসল বেবি আলপাকার পশম হাত দিলে মনে হবে মাখনের মতো নরম এবং এটি শরীরে একটুও কাঁটার মতো বিঁধবে না।

এখানে কোনো কিছুর দাম ফিক্সড নয়। দোকানদার প্রথমে যে দাম বলবে, তার অর্ধেক বা ৬০% দাম বলাটাই নিয়ম। দরদাম করাটা এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ খেলার মতো। দোকানিদের হাঁকডাক, নানা রঙের হস্তশিল্পের সমাহার আর ইনকা সংস্কৃতির নানা প্রতীকের ছড়াছড়ি—সব মিলিয়ে এই মার্কেটটি যেন পেরুর প্রাচীন ও আধুনিক জীবনের এক জীবন্ত জাদুঘর। আপনি যদি একটু হেসে স্প্যানিশে দু-একটা কথা বলতে পারেন, তবে বড় ডিসকাউন্ট পাওয়া নিশ্চিত! পোশাক ছাড়াও এখানে এমন কিছু অদ্ভুত জিনিস পাওয়া যায় যা সচরাচর অন্য কোথাও মেলে না। যেমনঃ প্রাচীন হাঙরের দাঁতের ফসিল (Fossilized Shark Teeth), ইনকা ক্যালেন্ডার খোদাই করা লাউ বা কারুকার্যময় 'রেতাবলোস' (Retablos - ছোট কাঠের বাক্সে পুতুল দিয়ে তৈরি দৃশ্য)। এখানে ৯৫০ সিলভারের গহনা খুব বিখ্যাত, যা সাধারণ ৯২৫ স্টার্লিং সিলভারের চেয়েও বিশুদ্ধ। বিশেষ করে 'চাকানা' (Chakana) বা ইনকা ক্রস চিহ্নের লকেট এখানে খুব জনপ্রিয়, যা ইনকাদের মতে পৃথিবী ও স্বর্গের সংযোগকারী সেতু। স্থানীয় কারিগরদের নিখুঁত এই কাজগুলো যেন তাদের প্রাচীন সভ্যতার নীরব সাক্ষী হয়ে আজও টিকে আছে।

৩. পেরুর উদ্দাম সন্ধ্যা ও পিসকো রাতের গল্প

লিমায় মিটিং শেষে সন্ধ্যায় আমরা স্থানীয় বারে গিয়ে পেরুর ঐতিহ্যবাহী পানীয় 'পিসকো' (Pisco)-এর স্বাদ নিই। এটি আঙুরের রস দিয়ে তৈরি এক ধরনের বর্ণহীন বা হালকা হলুদাভ ব্র্যান্ডি। স্থানীয়রা দারুণ এক নিয়মে এটি পান করে। প্রথমে কিছুক্ষণ ল্যাটিন মিউজিকের তালে উদ্দাম নাচ, তারপর এক শট পিসকো, এবং আবার নাচ! ল্যাটিন সংস্কৃতির এই প্রাণবন্ত রূপ মুহূর্তেই আমাদের মুগ্ধ করে ফেলল।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতেই আমাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে জানলাম পানীয়টির চমৎকার সব ইতিহাস, যার শুরুটা এর নামকরণ থেকেই। "পিসকো" শব্দটি মূলত আদিবাসী কেচুয়া শব্দ 'pisqu' বা "ছোট পাখি" থেকে এসেছে। পেরুর উপকূলের সামুদ্রিক পাখি এবং অ্যালকোহল সংরক্ষণের পাত্র তৈরি করা প্রাচীন আদিবাসী মৃৎশিল্পীদের নামের সঙ্গে এর গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, "পিসকো" নামের উৎপত্তি ও একচেটিয়া অধিকার নিয়ে পেরু ও চিলির মধ্যে শত শত বছরের তীব্র সাংস্কৃতিক বিবাদ রয়েছে। পেরুভিয়ানদের কাছে এটি নিছক পানীয় নয়, বরং গভীর জাতীয় আবেগের প্রতীক। পেরুর পরিচয়ের সঙ্গে এর গুরুত্ব তুলে ধরে ২০০৭ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কালচার (INC) এটিকে দেশের 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। প্রতি বছর পেরুর মানুষ তাদের এই সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী পানীয়টি উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ দিন পালন করেঃ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম শনিবার হলো 'জাতীয় পিসকো সাওয়ার দিবস'। এই উদযাপনটি পিসকোর উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক বিশাল উৎসবে স্থানীয় ও বিদেশিদের এক কাতারে মিলিয়ে দেয়।

আন্দিজের বিশুদ্ধ বাতাস আর চারপাশের রুক্ষ অথচ রাজসিক পাহাড়ের রূপ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মেঘের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন সময়ের টাইম মেশিনে চড়ে হাজার বছর পেছনের কোনো অচেনা গ্রহে এসে পড়েছি।

পিসকোর উৎপাদন প্রক্রিয়াও বেশ অনন্য ও কঠোর। এটি সরাসরি চূড়ান্ত অ্যালকোহল মাত্রায় চোলাই করা হয়। পেরুর আইন অনুযায়ী, এতে এক ফোঁটা জল বা অন্য কোনো কিছু মেশানো সম্পূর্ণ বেআইনি; এটি শুধুই মজানো আঙুরের খাঁটি নির্যাস। আঙুরের আসল সুবাস ও স্বচ্ছতা অটুট রাখতে একে কখনোই কাঠের ব্যারেলে পুরোনো (aging) করা হয় না, বরং কেবল কাঁচ, স্টিল বা ঐতিহ্যবাহী মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে, চিলির নিয়মে কাঠের ব্যারেলে রাখা এবং জল মেশানোর অনুমতি রয়েছে।

এই পানীয় তৈরিতে কারিগরদের চরম ধৈর্য ও শ্রমের প্রয়োজন হয়, কারণ মাত্র ৭৫০ মিলিলিটারের এক বোতল পিসকো তৈরি করতে ৭ থেকে ১০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত আঙুর লেগে যায়।

নাচ-গানের ফাঁকে ফাঁকে পিসকোর এই অজানা গল্পগুলো আমাদের পেরুভিয়ান সংস্কৃতির অভিজ্ঞতাকে আরও স্মরণীয় ও জীবন্ত করে তুলেছিল।

৪. কাহামারকা: আন্দিজের কোলে উষ্ণ প্রস্রবণ

পরদিন ভোরে আমরা কাহামারকার ফ্লাইট ধরলাম, কারণ আমাদের মূল টিম মিটিং সেখানেই। কাহামারকা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২,৭০০ মিটার (৮,৯০০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত। এত উচ্চতায় অনেকের 'এলটিচ্যুড সিকনেস' বা উচ্চতাজনিত অসুস্থতা হতে পারে, তাই আমাদের আগেই সতর্ক করা হয়েছিল। প্লেন থেকে নামার পর সত্যিই আমার মাথা ঘুরছিল এবং বমি বমি ভাব হচ্ছিল। আমাদের প্রচুর জল পান

করতে বলা হলো এবং কফি বা অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো। উচ্চতাজনিত শারীরিক অস্বস্তির মধ্যেও আন্দিজের বিশুদ্ধ বাতাস আর চারপাশের রুক্ষ অথচ রাজসিক পাহাড়ের রূপ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মেঘের এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, যেন সময়ের টাইম মেশিনে চড়ে হাজার বছর পেছনের কোনো অচেনা গ্রহে এসে পড়েছি।

আমরা উঠেছিলাম 'লেগুনা সেকা' নামের একটি বিলাসবহুল হোটেলে। হোটেলের রুমগুলো ছিল অদ্ভুত সুন্দর, বাথরুমে সরাসরি হট স্প্রিং বা গরম জলের ঝর্ণার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড়ি কনকনে শীতের মাঝে প্রাকৃতিক উষ্ণ জলের এমন ছোঁয়া নিমিষেই সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। মাটির নিচ থেকে উঠে আসা এই উষ্ণতা যেন আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, পৃথিবীর উপরিভাগ যতই রুক্ষ আর শীতল হোক না কেন, তার গভীরে লুকিয়ে আছে অদ্ভুত এক জীবনীশক্তি।

কাহামারকার 'বানোস দেল ইনকা' (Baños del Inca) বা ইনকা বাথ খুব বিখ্যাত। এটি দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সেরা থার্মাল স্পা। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণগুলোর জল আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে প্রাকৃতিকভাবে গরম হয়ে আসে এবং তাপমাত্রা ৭০°C থেকে ৭৫°C পর্যন্ত হয়। এই জলে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও সালফারের মতো খনিজ উপাদান থাকে, যা বাত ও ত্বকের রোগ সারাতে উপকারী।

বানোস দেল ইনকার কিছু কিছু প্রাকৃতিক কুণ্ডের জল এতটাই গরম, তাপমাত্রা প্রায় ফুটন্ত বিন্দুর কাছাকাছি। স্থানীয় ও পর্যটকরা মজার ছলে এই প্রাকৃতিক গরম জলে ভুট্টা এবং ডিম সেদ্ধ করে খায়! মাটির নিচ থেকে আসা এই ফুটন্ত জল দেখার অভিজ্ঞতা সত্যিই রোমাঞ্চকর। ১৫৩২ সালে স্প্যানিশরা যখন আক্রমণ করে, তখন ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা যুদ্ধের ক্লান্তি দূর করতে ঠিক এই উষ্ণ প্রস্রবণে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এখানে আজও একটি পাথরের তৈরি বিশেষ চৌবাচ্চা আছে, যা 'পোজো দেল ইনকা' বা সম্রাটের ব্যক্তিগত স্নানাগার নামে পরিচিত।

তবে আলোর নিচেই ছিল অন্ধকার। আমাদের বিলাসবহুল হোটেলের পাশেই দেখলাম বাচ্চারা ড্রেনের কালো জলে নামছে, আর মহিলারা সেই ময়লা জলেই কাপড় ধুচ্ছে। হোটেলের জানালা দিয়ে প্রায়ই দেখতাম আর মনটা খারাপ হয়ে যেত। গ্রামের দিকে গিয়েও দেখলাম অনেক শিশু ও মহিলার মুখে ঘা, যা তাদের চরম অপুষ্টির লক্ষণ। পর্যটকদের জন্য সাজানো চকচকে মোড়কের আড়ালে সাধারণ মানুষের এই বেঁচে থাকার লড়াই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যে সবার কাছে পৌঁছায় না। এই বৈপরীত্য মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে, পর্যটকদের জন্য সাজানো চকচকে মোড়কের আড়ালে এক ভিন্ন, কঠিন বাস্তবতা লুকিয়ে আছে।

প্রতিদিন মিটিং শেষে আমরা কাহামারকা শহর ও তার আশেপাশের দর্শনীয় স্থানগুলো দেখতে বের হতাম। একদিন গেলাম শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত প্লাজা ডি আরমাস (Plaza de Armas)-এ। এটি শহরের সবচেয়ে সুন্দর স্কোয়ার, যা জটিল নকশার গির্জা, রঙিন ভবন এবং বাগান দিয়ে ঘেরা। এখানকার ভবনগুলোর

বেশিরভাগই স্থানীয় আগ্নেয়গিরির শিলা দিয়ে তৈরি। স্কোয়ারের এক পাশে ক্যাথেড্রাল এবং অন্য পাশে ইগলেসিয়া ডি সান ফ্রান্সিসকো—যার কারুকাজ অত্যন্ত চমৎকার এবং ক্যাথেড্রালের চেয়েও আকর্ষণীয়। এই গির্জাটি সম্পর্কে একটি মজার ভুল ধারণা আছে। অনেকেই এর বিশালতা দেখে একে ক্যাথেড্রাল মনে করেন, কিন্তু এটি আসলে 'সান ফ্রান্সিসকো চার্চ'। ১৬৯৯ সালে তৈরি এই গির্জাটি সম্পূর্ণ পাথর খোদাই করে বানানো, আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পাথর আনা হয়েছিল সান্তা আপোলিনিয়া পাহাড় থেকে! গির্জার ডানপাশে যে লাল গম্বুজটি দেখা যায়, সেটি হলো 'ভার্জেন দে লস ডলোরেস'-এর চ্যাপেল। পাথরের গাঁথুনিতে তৈরি এই বিশাল উপাসনালয়গুলো শত শত বছর ধরে যেন ঔপনিবেশিক শক্তির নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা 'সান্তা আপোলোনিয়া' পাহাড়েও উঠেছিলাম, যেখান থেকে পুরো শহরের এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে শহরের দৃশ্য দেখছিলাম, তা সান্তা আপোলিনিয়া হিলের একেবারে ওপরের অংশ। এটি শহরের একটি ঐতিহাসিক ভিউপয়েন্ট। স্থানটি সূর্যাস্ত দেখার জন্য পর্যটকদের কাছে খুব জনপ্রিয়। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত সাদা ক্রসটির (গাছে কিছুটা ঢাকা পড়েছে) কাছে পৌঁছাতে আমাদের দীর্ঘ সিঁড়ি পাড়ি দিতে হয়েছিল, যেখানে প্রায় ৩০০টির মতো ধাপ! স্থানীয়দের বিশ্বাস, ভক্তিভরে এই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে 'ভার্জিন অফ ফাতিমা'-র কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তা পূরণ হয়। পাহাড়ের চূড়ার কাছেই পাথর কেটে বানানো একটি বিশেষ আসন, যাকে বলা হয় 'সিলা দেল ইনকা' বা 'ইনকা আসন'। লোককথা অনুযায়ী, ইনকা সম্রাট এই পাথরের আসনে বসেই নিচে পুরো শহর ও তার প্রজাদের পর্যবেক্ষণ করতেন। যদিও ঐতিহাসিকরা মনে করেন এটি মূলত একটি বেদীর অংশ ছিল। পাহাড়ের প্রবেশপথেই রয়েছে হ্যাট ও পনচো পরা একটি পাথরের মূর্তি, যা কাহামারকার গ্রামীণ নারী বা 'চোলিতা' (Cholita)-র প্রতীক। এমনকি শোনা যায়, এই পাহাড়ের নিচ দিয়ে নাকি ইনকাদের গোপন সুরঙ্গ ছিল, যা দিয়ে রাজারা নিরাপদে যাতায়াত করতেন! এখান থেকে লাল টালির ছাদওয়ালা বাড়িগুলোর দিকে তাকালে পুরো কাহামারকা শহরের এক অপূর্ব প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়, যেন শত শত বছরের ইতিহাস এই লাল ছাদের বাড়িগুলোর মাঝে আজও জেগে আছে। মজার ব্যাপার হলো, ইনকাদের আসার বহু আগে থেকেই এই প্রাচীন চাভিন (Chavín) সভ্যতার মানুষের কাছে এটি একটা পবিত্র স্থান ছিল এবং তারা সেখানে উপাসনা করত।

৫. কামবেমায়োঃ সহস্রবর্ষী রহস্যময় পাথুরে জঙ্গল

সপ্তাহান্তে শহরের কোলাহল পেছনে ফেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটার উঁচুতে অবস্থিত 'কামবেমায়ো'-তে পৌঁছাতেই মনে হলো, যেন টাইম মেশিনে করে পৃথিবীর বাইরের সম্পূর্ণ অন্য কোনো গ্রহে এসে নেমেছি। স্থানীয়রা ভালোবেসে একে বলে 'স্টোন ফরেস্ট' বা পাথরের জঙ্গল, তবে এর আসল রূপ কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি মোহময়। হাজার হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির

উত্তপ্ত লাভা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে এই শিলাগুলোকে এমন অদ্ভুত ও জ্যামিতিক আকৃতি দিয়েছে, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য। বিশাল আকৃতির এই পাথরের স্তম্ভগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন শত শত সন্ন্যাসী মাথা নিচু করে নীরবে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে।

পাহাড়ি হিমেল বাতাস যখন এই পাথরের খাঁজে খাঁজে ধাক্কা খায়, তখন এক অদ্ভুত শিস দেওয়ার মতো শব্দ তৈরি হয়, যা চারপাশের পরিবেশটিকে আরও রহস্যময় করে তোলে। তবে কামবেমায়োর সবচেয়ে বড় বিস্ময় কেবল এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, বরং এর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা প্রাচীন মানুষের নিখুঁত প্রকৌশল। এখানে রয়েছে হাজার হাজার বছরের পুরনো প্রাচীন খাল বা অ্যাকোয়াডাক্ট (Aqueduct)। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ১০০০ বছর আগে কাহামারকা সংস্কৃতির মানুষ কোনো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই, কেবল হাতের নিপুণতায় আগ্নেয়গিরির শক্ত পাথর কেটে এই দীর্ঘ ও নিখুঁত জলের পথ তৈরি করেছিল। প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালের কিছু অংশের বাঁকগুলো এমন নিখুঁত 'জিগজ্যাগ' (zigzag) প্যাটার্নে কাটা, যা জলের প্রবল গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করে ভূমিক্ষয় রোধ করত। খালের আশেপাশের পাথরের গায়ে আজও খোদাই করা রয়েছে রহস্যময় সব 'পেট্রোগ্লিফ' বা প্রাচীন প্রতীক, যার অর্থ আজও গবেষকদের কাছে এক অমীমাংসিত রহস্য।

পাহাড়ি হিমেল বাতাস যখন এই পাথরের খাঁজে খাঁজে ধাক্কা খায়, তখন এক অদ্ভুত শিস দেওয়ার মতো শব্দ তৈরি হয়, যা চারপাশের পরিবেশটিকে আরও রহস্যময় করে তোলে।

দিনের বেলায় যা রুক্ষ ও প্রাচীন, রাতের বেলায় সেই জায়গাটিই এক অদ্ভুত মায়াবী রূপ ধারণ করে। মেঘমুক্ত পাহাড়ি আকাশে তারার মেলা আর চাঁদের আলো যখন এই পাথরের জঙ্গলে ঠিকরে পড়ে, তখন মনে হয় চারপাশের অন্ধকারে যেন লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট বাল্ব জ্বলছে। এই অপার্থিব নীরবতা আর আলোর খেলা এক মোহময় আবেশ তৈরি করে।

হাজার বছরেরও বেশি পুরনো এই প্রাকৃতিক স্থাপত্য ও মানবসৃষ্ট আশ্চর্যের সামনে দাঁড়ালে আধুনিক যুগের মানুষের সমস্ত প্রযুক্তিগত অহংকার যেন এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাথরের বুক চিরে তৈরি করা সেই নিখুঁত জলের পথ আর বিশাল পাথুরে স্তম্ভগুলো যুগ যুগ ধরে এই সত্যই প্রমাণ করে আসছে যে, প্রকৃতির বিশালতার কাছে মানুষ কত ক্ষুদ্র; অথচ প্রাচীন মানুষের প্রজ্ঞা, একাগ্রতা ও প্রকৌশল কতটা উন্নত আর বিস্ময়কর ছিল!

৬. গ্রানহা পোরকন ও ইয়ানাকোচা: স্বর্ণখনি বনাম সবুজ বিপ্লব

কাহামারকার ‘গ্রানহা পোরকন’ (Granja Porcón) এবং ‘ইয়ানাকোচা স্বর্ণখনি’ (Yanacocha Gold Mine) পরিদর্শন করতে গিয়ে পেরুর অর্থনীতি, পরিবেশ এবং জনজীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি চিত্র আমার চোখে পড়ল; যা একদিকে যেমন আশাজাগানিয়া, অন্যদিকে তেমনি বিষণ্ণতার।

> **পাথরের বুক চিরে তৈরি করা সেই নিখুঁত জলের পথ আর বিশাল পাথুরে স্তম্ভগুলো যুগ যুগ ধরে এই সত্যই প্রমাণ করে আসছে যে, প্রকৃতির বিশালতার কাছে মানুষ কত ক্ষুদ্র; অথচ প্রাচীন মানুষের প্রজ্ঞা, একাগ্রতা ও প্রকৌশল কতটা উন্নত আর বিস্ময়কর ছিল!**

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফুট (৩,০০০ মিটারেরও বেশি) উচ্চতায় অবস্থিত ‘গ্রানহা পোরকন’ গ্রামে পা রাখতেই মনে হলো যেন একখণ্ড সবুজ স্বর্গে এসে পড়েছি। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় ১০ হাজার হেক্টরজুড়ে ছড়িয়ে আছে বিশাল এক পাইন বন! একসময়ের রুক্ষ এই পাহাড়গুলোকে বেলজিয়ান একটি প্রজেক্টের আওতায় নিউজিল্যান্ড থেকে আনা পাইন চারা দিয়ে সবুজে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এখানকার মানুষগুলো মূলত ‘সেভেন্থ্-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট’ (Seventh-day Adventist) বা বিশ্বাসভিত্তিক কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করে। তাদের শৃঙ্খলা দেখে মনে হয় যেন কোনো আর্মি ক্যাম্পের বাসিন্দা, কিন্তু ব্যবহারে তারা মাখনের মতো নরম। এখানকার মহিলারা বাড়িতে বসেই চিজ, মাখন আর দই বানায়, যার স্বাদ বিশ্বের যেকোনো নামী ব্র্যান্ডকে হার মানাবে।

এই কৃষি সমবায়টির নাম বেশ চমকপ্রদ—‘কো-অপারেটিভা আগ্রারিয়া আতাহুয়ালপা জেরুসালেম’। ইনকা সম্রাট ‘আতাহুয়ালপা’র ঐতিহাসিক শৌর্য আর বাইবেলের পবিত্র নগরী ‘জেরুসালেম’-এর নামের এমন অদ্ভুত অথচ সুন্দর সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায় না। এই বিশাল পাইন বনের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বিশেষ এক ধরনের মাশরুম জন্মায়, যা ‘পোরকন মাশরুম’ নামে বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত; এটি এই সম্প্রদায়ের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বনের ভেতরের নিস্তব্ধ পথ ধরে হাঁটার সময় আমরা দেখলাম পেরুর জাতীয় প্রাণী এবং বিশ্বের সবচেয়ে দামি পশমের অধিকারী ‘ভিকুনা’ (Vicuñas)। পেরুর জাতীয় প্রতীকেও (National Coat of Arms) এই প্রাণীটির ছবি থাকে। বনের মধ্যে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখাটা ভাগ্যের ব্যাপার। বনের নিস্তব্ধতার মাঝে এই প্রাণীগুলোর অবাধ বিচরণ যেন পেরুর বন্য, আদিম ও স্বাধীন সত্তার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আমরা এখানে ট্রাউট মাছের খামারে যাই। পাহাড়ি ঝর্ণার ঠান্ডা পানিতে ট্রাউট মাছ চাষ করা এই অঞ্চলের জনপ্রিয় সংস্কৃতি। আমি নিজের হাতে জাল দিয়ে মাছ ধরি

এবং দুপুরের খাবারে সেই তাজা মাছ ভাজা বা ‘Trucha Frita’, স্থানীয় আলু ও ভাতের সঙ্গে খাদ্যের স্বাদ নিলাম। লাকড়ির চুলায় রান্না করা খাবার, বিশেষ করে আলুর চিপস ছিল অসাধারণ। আমরা খাবার টেবিলে যে ভুট্টা (Mote) খেয়েছি, তা সাধারণ কোনো ভুট্টা নয়। পেরুতে প্রায় ৫৫ রকমের ভুট্টা জন্মায়! এর মধ্যে কিছু ভুট্টার রঙ বেগুনি (Purple Corn), যা দিয়ে ‘চিচা মোরাদা (Chicha Morada),’ নামে এক ধরনের মিষ্টি পানীয় তৈরি হয়। উল্লেখ্য, কাহামারকার খাবারেও রয়েছে বৈচিত্র্য, যেমন—‘কুই ফ্রিতো’ (গিনিপিগ ভাজা) এবং ‘মানজার ব্লাঙ্কো’ নামের সুস্বাদু মিষ্টি। এখানকার ৫০/৬০টি পরিবার মিলেমিশে কাজ করে এবং খুব সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। প্রকৃতিকে ধ্বংস না করে পরিবেশ ও মানুষের এমন টেকসই সহাবস্থান সত্যিই আধুনিক বিশ্বের জন্য এক চমৎকার মডেল।

গ্রানহা পোরকনের সেই স্নিগ্ধতার ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা গেল ইয়ানাকোচা স্বর্ণখনির দিকে যাওয়ার পথে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই উন্মুক্ত (open-pit) স্বর্ণখনিটির পরতে পরতে জড়িয়ে আছে এক ঐতিহাসিক অভিশাপ ও বঞ্চনার গল্প। ১৫৩২ সালে ইনকা সম্রাট আতাহুয়ালপা স্প্যানিশ বিজেতাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কাহামারকার ‘কুয়ার্তো দেল রেসকাতে’ বা র‍্যানসম রুম (Ransom Room) সোনা এবং রুপা দিয়ে ছাদ পর্যন্ত ভরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাহাড়সম সেই সোনা পাওয়ার পরেও লোভী স্প্যানিশরা কথা রাখেনি, সম্রাটকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

আশ্চর্যজনকভাবে, প্রায় ৫০০ বছর পরও সেই একই সোনার লোভে বিদেশিরা (মূলত আমেরিকান কোম্পানি) এখানে পাহাড় খুঁড়ে চলেছে। প্রতিনিয়ত খনি খননের ফলে সায়ানাইড ও অন্যান্য রাসায়নিকে পাহাড়ের বিশুদ্ধ জলের উৎসগুলো মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে, আর স্থানীয় আদিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব ও কৃষিকাজ বাঁচাতে আজও লড়াই করে যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে তৈরি করা এই বিশাল, রুক্ষ, খোলা খনিগুলো যেন ইনকাদের সেই পুরনো অভিশাপের দগদগে ক্ষতচিহ্ন হয়ে আজও পেরুর প্রকৃতিকে রক্তাক্ত করে চলেছে।

স্বর্ণখনি পার হয়ে ধুলোমাখা পথ ধরে আমরা পৌঁছালাম ইয়ানাকোচা গ্রামে। সেখানে এক কৃষক পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো, যারা স্থানীয় ডেইরি ফার্মিং সমিতির সদস্য। মহিলাটি জানালেন, তারা তাদের উৎপাদিত দুধ সমিতি-নিয়োজিত কালেক্টরের কাছে দেয়। এতে তাদের বেশ সুবিধা হয় এবং তারা তাদের দৈনন্দিন কাজে মনোযোগ দিতে পারে। পরিবারটি চিজও বানায়। শত অভাবের মাঝেও তারা সানন্দে আমাদের নিজেদের হাতে বানানো চিজ বা পনির খেতে দিল। আমরা যেন তাদের উঠোনে বসে চিজ খাওয়ার এক ছোটখাটো উৎসবে মেতে উঠলাম। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সোনার খনির পাশে বাস করা এই হতদরিদ্র মানুষগুলোর চোখের দিকে তাকালে বেঁচে থাকার এক তীব্র, নীরব আকুতি চোখে পড়ে। এত কষ্ট, বঞ্চনা আর শোষণের মাঝেও তাদের এই অকৃত্রিম আতিথেয়তা এবং সরল হাসি আমাকে মুহূর্তের জন্য আমার নিজের দেশের গ্রামের সহজ-সরল, খেটে খাওয়া মানুষদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

ফেরার পথে দেখলাম, দুর্গম পাহাড়ি পথে ঘোড়ায় চড়ে দুধ সংগ্রহ করছেন এক মিল্ক কালেক্টর। এই আধুনিক যুগেও, দুর্গম আন্দিজ পর্বতের বুকে ওয়েস্টার্ন মুভির কাউবয়দের মতো ঘোড়ায় চড়ে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দুধ সংগ্রহ করার এই দৃশ্য আমাকে আরেকবার গভীরভাবে বুঝিয়ে দিল, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা এই মানুষগুলোর জীবন ঠিক কতটা কঠিন আর অমসৃণ।

৭. বিদায়বেলাঃ স্মৃতির ক্যানভাসে পেরু

টিম মিটিং আর কাহামারকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে দেখতে আমাদের দেশে ফেরার সময় হয়ে এলো। পেরু অফিস ফেয়ারওয়েল ডিনারের আয়োজন করল। সকাল সকাল ডিনার সেরে আমি ফিরে এলাম রুমে। কারণ পরের দিন সকালে আমার ফ্লাইট। এই কয়দিনে কাহামারকা ও এখানকার কলিগদের ওপর এত মায়া পড়ে গেল যে প্লেনে মন খারাপ করে চুপচাপ বসে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, এ কয় দিন যেন স্বপ্নের ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

জোহানেসবার্গে এয়ারপোর্টে এসে বিক্ষিপ্তচিত্তে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে দেখি প্যাকেটজাত ড্রাই বিফ। বেশ চাহিদা, অনেকেই কিনছে। আমিও কিনলাম। তারপর আবার প্লেনে চড়ে দুবাই এলাম। এখানে এলে প্রবাসী বাঙালি ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা মানুষ দেখলে মনে হয় দেশে এসে গেছি। আর পিছনের সবকিছু ভুলে যেতে থাকি। দুবাই এয়ারপোর্টে এলে আমার এমনটাই মনে হয় বারবার।

পেরুর এই ভ্রমণে আমি কেবল ইনকাদের হারানো সাম্রাজ্য, স্প্যানিশদের রেখে যাওয়া স্থাপত্য বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই দেখিনি, দেখেছি এক চরম বৈপরীত্য। একদিকে বিলাসবহুল হোটেল ও সোনার খনি, অন্যদিকে দূষিত জলে খেলা করা শিশু এবং বেঁচে থাকার জন্য কৃষকদের নিরন্তর সংগ্রাম। এই ফিল্ড ভিজিট আমাকে আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, পরিসংখ্যানের প্রবৃদ্ধি সবসময় সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে না।

তবু আজও যেন কান পেতে শুনি লিমার সমুদ্রের গর্জন। কাহামারকার পাহাড়ের নীরবতা যেন আমাকে ডাক দিয়ে যায়। পৃথিবীর মানচিত্রে পেরু হয়তো অনেক দূরে, কিন্তু এই কটা দিনেই দেশটি এবং এর মানুষেরা আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটা জায়গা করে নিয়েছে। বিদায় পেরু, বিদায় ইনকাদের ঐশ্বর্যময় পুণ্যভূমি!

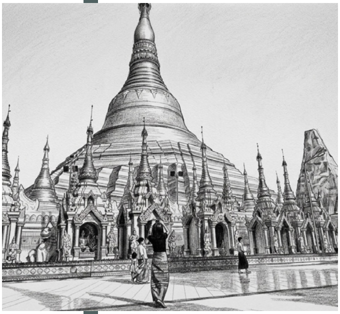

মগের মুল্লুক

হুসেইন ফজলুল বারী

কাঁচের বেষ্টনীর ওপার থেকে গাট্টাগোট্টা ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাসপোর্টের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন তো রয়েছেনই। একটু পর দুঁদে আধিকারিক ভ্রু কুঁচকে মিনমিনে চোখে আমাকে নিরিখও করলেন। আবার তিনি নিষ্ঠাবান গবেষকের মতো গভীর মনোযোগে আমার পাসপোর্ট উল্টে পাল্টে দেখছেন। বেশ কালক্ষেপণ হচ্ছে দেখে আমি প্রগলভ হয়ে বলি, আমার পাসপোর্টে কি বিশেষ কিছু খুঁজছেন বা কিছু জানতে চাইছেন? আমি কি মহোদয়কে কোন তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারি? অফিসার বিরসমুখে তর্জনী এঁকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করলেন। তার মুখের পাথুরে কাঠিন্য, মস্তকে কদমফুলের মতো কাঁচাপাকা চুল। ভদ্রলোকের চেহারায় কড়া ফৌজি ভাব দেখে নিশ্চুপই রইলাম। খানিক পর তিনি ভাঙা ইংরেজিতে প্রায় ধমকে উঠলেন, হ্যালো মিস্টার, আপনার ভিসা কই? তার আড়ষ্ট জিহ্বায় সম্ভবত 'ট' ধ্বনি উচ্চারণে সমস্যা হচ্ছে। আমার চিকিৎসক স্ত্রীর ভাষায়— জিহ্বার জড়তার এই সমস্যার নাম 'টাং টাই'। ভদ্রলোকের পেছনে একটা রঙিন টাই ঝুলছে বিসদৃশভাবে। তাঁর হলদেটে দাঁতে লালচে দাগ। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে পান চিবিয়েছেন। জানি, বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে মেজাজ হারানো সমীচীন নয়। মোলায়েম স্বরে বললাম, বাংলাদেশ আপনাদের নিকটতম প্রতিবেশী, আর সরকারি কর্মচারী বলে আমার অন অ্যারাইভাল ভিসা প্রাপ্য। তিনি ভ্রু কুঁচকে দাঁড়িয়ে উঠে অলস-অবহেলায়

কোঁচড় থেকে বের করলেন কালচে ওয়াকিটকি। অবাক হলাম, অফিসার সাহেব দুধসাদা শার্ট ইন করে বর্মাইয়া লুঙ্গি পরে আছেন! তিনি শুরু করলেন আরেক সহকর্মীর দীর্ঘ বাতচিত। কথার ফাঁকে এই অফিসার নাক-মুখ চুলকালেন। সম্ভবত তিনি দূরালাপনিতে কিছুটা খাজুরে আলাপও সেরে নিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী, হাসির ছররা বা কাইকুই শুনে আমার সেরকমই মনে হলো। একটু পরেই তিনি দশাসই হাতে পাসপোর্টে সজোরে সিল মেলে স্মিত হেসে ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, ওয়েলকাম টু ইয়াঙ্গুন।

মোড়ের দিকে সবুজপাতার বাঁশঝাড়— এর গায়ে আলতো ছোঁয়া দিয়ে নরম রোদ নেমে পড়েছে ধানের খেতে। নিচু মাঠে কাজ করছে মাথাল পরা শক্ত-সামর্থ্য কিষাণীর দল। এঁদের মুখে খানিকটা রুক্ষতার ছাপ। পথে কিছু গাড়ি চলছে রয়ে সয়ে।

ইয়াঙ্গুন বা সাবেক রেঙ্গুন বিমানবন্দরের বহির্গমন দ্বার পেরিয়ে ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে আমার পিলে চমকানোর দশা— হোটেলে যাবার ভাড়া কয়েক লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা! এদেশের মুদ্রার নাম কিয়াত। মোবাইলের ক্যালকুলেটরে হিসেব করেও কুলকিনারা পাই না— এক ডলারে ছয়-সাত হাজার কিয়াত। ঠিকঠাক মুদ্রার বিনিময় হিসেব করতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের দ্বারস্থ হওয়া লাগবে বুঝি! ভাড়ার একটা দফারফা করে গাড়িতে উঠলাম। দাদিজানের কাছে শুনেছি, নাবিক দাদাজান অকূল দরিয়ায় অভিযানে গিয়ে প্রথম পত্রখানা লিখতেন এই রেঙ্গুন থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত পূর্ববাংলার অনেকেই রেঙ্গুনে থাকতেন চাকরি-বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। আমার নাবিক দাদাজানও পাড়ি জমাতেন দূরদেশে— এডেন, পোর্ট সৈয়দ, ডাবলিন বা বিলেতের দিকে, তবে তাঁর প্রাথমিক স্টপওভার ছিল এই রেঙ্গুন।

রেঙ্গুন বিমানবন্দর পার হলে চোখে পড়ে লতাপাতা-শোভিত উদ্যান। রঙ্গিলা কচুপাতা, পাতাবাহার, মসলা গাছ, অর্কিড, বেরি, বুনো ঝোপঝাড়, নানা কিসিমের তৃণ, বাগানবিলাসে চারধার অপরূপ সাজে সেজেছে। রোদের রঙ কোমল হলুদ, বাতাসে কুসুমগন্ধ। প্রাণময় বসন্তে বৃক্ষরাজি অনিন্দ্য সবুজ হয়ে উঠেছে। রাস্তার দুপাশে আগাছার বন্যা। লতাপাতা টলছে মৃদুলয়ে। রাস্তাটা একটু ঘুরে গিয়ে আবার পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলে গেছে। কলাগাছে কচিপাতা ঝুলছে— রঙ গাঢ় সবুজ। জংলি কুলে ঠোকর দিচ্ছে বাবুই পাখি। লম্বা গাছের কালো ডালে ঝিম মেরে বসে আছে হলদে পাখি, এর ঠোঁট টকটকে লাল। এই বুঝি বেনে বউ? মোড়ের দিকে লাউয়ের ডগা বেড়ে উঠছে লকলক করে। দূর থেকে দেখা যায়, মূল শহরের উঁচু উঁচু

অট্টালিকা। মোড়ের দিকে সবুজপাতার বাঁশঝাড়— এর গায়ে আলতো ছোঁয়া দিয়ে নরম রোদ নেমে পড়েছে ধানের খেতে। নিচু মাঠে কাজ করছে মাথাল পরা শক্ত-সামর্থ্য কিষাণীর দল। এঁদের মুখে খানিকটা রুক্ষতার ছাপ। পথে কিছু গাড়ি চলছে রয়ে সয়ে। সড়কের দুপাশে ঝলমলে সোনালু গাছ। অজস্র হলুদ-সোনালি ফুল ঝুলে আছে আঁকাবাঁকা ডালে। কোথাও দেখি বাঁদরলাঠি দুলছে এদিক সেদিক। পথের সমান্তরালে বয়ে চলছে মৃদুমন্দ জলের ধারা। খালপাড়ে অসংখ্য বুনোফুল ফুটেছে— চৈতি, রক্তদ্রোণ, কলস, ধুতরা, কলকাসুন্দা। আরেকটা ফুলের ঝাড় দেখলাম অনেক বছর পর— ঝুনঝুনি। অদূরের জলাভূমির পাশে বেশ কয়েকটা গাছ সারা অঙ্গে লাল ঝালর নিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠিক ঠিক চিনতে পারলাম, এরা আমাদের অতি পরিচিত হিজল। গাড়ি থামালাম। আর বার বার তাকাই, আশ মেটে না। তালপাতায় লেগে লেগে বাতাসের সর সর শব্দ হয়। দূরে কোথাও তক্ষকও ডেকে উঠল। আমার গা ছমছম করে উঠল। কয়েকটা শ্যাওড়া ঝাড় দেখলাম। শুনেছি এই গাছে পেতনির বাসা। ছোটবেলার ভয়ার্ত নস্টালজিয়া এসে মাথায় ভর করে। মনে পড়ে, ভয় কাটাতে একবার এক স্বাস্থ্যবতী মগিনীর কাছ থেকে আমার জন্য একটা মাদুলিও নেয়া হয়েছিল। সুদূরের অদূর হতে কার যেন গলার আওয়াজ শোনা যেত— শিঙ্গা লাগবে, শিঙ্গা! শ্লথ বিষণ্নতা ছিল বলিষ্ঠ মগ নারীদের চলনে-বলনে। দুধসাদা প্রগাঢ় মেয়েরাও এখানে পথ চলছে একইভাবে— গলায় বা খোঁপায় রঙ্গিলা ফুল, মুখে সাদা চন্দন, চোখে সেই আগের মতো বিলোল কটাক্ষ। রেঙ্গুনের এক শহরতলিতে ট্যাক্সি থামলে আবারও ভ্যাবাচ্যাকা খাই। ঠিক যেন আমার শৈশবে দেখা নিঝুম গাঁ। সেই ছায়াঘন কাছারি ঘর, সুপারি বন আর হিজিবিজি জঙ্গল। বাঁশের সাথে বাঁশের ঘষা লাগে, কেমন যেন ঘর্ষণজাত শব্দ হয়— রি, রি। জলজ গুল্মের সবুজ ডগা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠল। বাজপাখি উড়ে গেল ঘরের চালের উপর দিয়ে। তেঁতুলতলায় ছায়া জমেছে। নারকেলবন গগনচুম্বী। রৌদ্রধোয়া পল্লবে বাতাসের ছোঁয়া

রেঙ্গুনের এক শহরতলিতে ট্যাক্সি থামলে আবারও ভ্যাবাচ্যাকা খাই। ঠিক যেন আমার শৈশবে দেখা নিঝুম গাঁ। সেই ছায়াঘন কাছারি ঘর, সুপারি বন আর হিজিবিজি জঙ্গল। বাঁশের সাথে বাঁশের ঘষা লাগে, কেমন যেন ঘর্ষণজাত শব্দ হয়— রি, রি। জলজ গুল্মের সবুজ ডগা বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠল। বাজপাখি উড়ে গেল ঘরের চালের উপর দিয়ে। তেঁতুলতলায় ছায়া জমেছে। নারকেলবন গগনচুম্বী। রৌদ্রধোয়া পল্লবে বাতাসের ছোঁয়া লাগে।

লাগে। এখানকার গাছপালার অন্তত পনেরো আনা আমার অতি পরিচিত। জংলি ডোবার দিকে ডাহুকের ডাক শুনি? হরিয়াল ডাকছে গাছের মগডালে? বড্ড চেনা এই কলস্বর। বুনো গন্ধের ভাপ চারধারে। ঝোপের দিকে দিনের বেলাতেই পতঙ্গ কাঁদছে একঘেয়ে সুরে। ফুল ফুটেছে ডালিম গাছে। হোগলা পাতায় বসে আছে ঘাস ফড়িংয়ের দল। উর্বর মাটিতে পোকামাকড়ের দল গুষ্ঠিশুদ্ধ বুঝি আস্তানা গেড়েছে? জলার দিকে ঝুপ করে ঘাই দিলো রাক্ষুসে মাছ। গাঙের উপর বাঁশের সাঁকো। অদূর পারে হালকা বন, ধানখেত, পানাপুকুর আর রিক্ত শ্মশান। একপাশের নিঃশব্দ জলধারা। সজল শাপলা মিইয়ে গেছে রোদের ছোঁয়ায়। বনবাগানে কাউ, ডেউয়া, বহেড়া, চালতা গাছ। দ্রোণ ফুলের রাজ্য পেরিয়ে একটা টং ঘর। নাকে লাগল প্রস্রাবের নোনা গন্ধ!

হলফ করে বলছি, প্রথম দর্শনে রেঙ্গুনকে ঠিক বিদেশ বলে মনে হয় না।

রেঙ্গুনের যে গেস্টহাউসে মৌরসিপাট্টা গেড়েছি, এর চারধারে কড়ই, জাম, কলাগাছে, ল্যান্টানা, মুসেন্ডা ও ভাঁট ঝোপের বন্যা। হাঁটতে বেরিয়ে মনটা পাখির পালকের মতো স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। অনেক দূর থেকে সোনালি রং দৃষ্টি কাড়ল। একটু নিরিখ করে বোঝা গেল, এগুলো আসলে রক্ত উদাল। ছায়াধূসর পথে অজস্র সোনালু ফুল পড়ে আছে অপরূপ আলপনার মতো। মোলায়েম রোদ গলিয়ে পড়ছে অসমতল চত্বরে। সবুজ ঝোপের বুকে নিজেদের অবস্থান জানান দিচ্ছে নীলমণিলতা, সোনাঝুরিলতা, হলুদ কর্ডিয়া, ভাদ্রা, ভুঁইকুমড়া, রুদ্রপলাশ, অ্যাজালিয়া, স্বর্ণকাঞ্চনসহ নানান কিসিমের ফুল। লাল, হলুদ, নীল, সাদা রঙের ফুলের সাথে বহুবর্ণা পাতাবাহার সব মিলিয়ে একেবারে রঙের ঝরনাধারা বয়ে যাচ্ছে সংলগ্ন ঝোপঝাড়ে। মূল শহরের কিছু আকাশচুম্বী অট্টালিকা বা চোখ ধাঁধানো ফ্ল্যাটবাড়ি বাদ দিলে এদিকে মূলত ছোট ছোট ঘরদোর। কোথাও বা পুরনো অট্টালিকা বা টং ঘর। এই সকাল বেলায় যুবকের দল হয়ত অঘোরে ঘুমুচ্ছে। যারা হাঁটছে সব বুড়ো মানুষের দল। সোনা-রোদ একটু একটু সরে যাচ্ছে, আকাশটা কোমল হয়ে গেছে। ওদিকে সাইকেল মেরামতের দোকান। নাকে লাগল গ্রিজ-লুব্রিক্যান্ট-মরিচার গন্ধ। একটা ছোকরা-মিস্ত্রি হাতুড়ি দিয়ে কী যেন পিটিয়ে পিটিয়ে তক্তা করছে। বুড়ো বট গাছ ঝুঁকে আছে জলার দিকে— মিশকালো তার গুঁড়ি আর ডালপালা। হলুদ, এলাচ, দোলনচাঁপা, শটির সৌরভে সকালবেলা মধুর হয়ে আছে। ছায়াধূসর পথে বনকলমির ঝাড়। কোত্থেকে যে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল একটা মাছরাঙা পাখি। ঘোলা জলে ভেসে বেড়ায় এক ঝাঁক শোলের পোনা। একটা মোটাসোটা গুইসাপ পড়িমরি করে ঝুপ করে নালায় নামল। একটু ছায়া নামে— রোদ বিমর্ষ হয়। সামনে একটি গেঁয়ো দোকান। কাঠের পাটাতনে বসে চা-বিস্কুট খেতে খেতে গুলতানিতে মগ্ন হয়েছে মঙ্গলীয় চেহারার কয়েকজন মানুষ। দোকানি-নারীর মুখে যেন চন্দনের আঁচ, মাথায় রঙিন ওড়না, গায়ের ব্লাউজ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে উদ্ধত বক্ষ। এগিয়ে

গিয়ে ইংরেজিতে বললাম, এক পেয়ালা টি হবে? একজন আড্ডাবাজ প্রৌঢ় হেসে বললেন, বর্মী ভাষায় কিন্তু চা। খানিক পরেই অবলীলায় ফিক করে পানের পিক ফেলে দোকানি এগিয়ে দিলেন এক পেয়ালা চা। মেহমান ভেবে দোকানি অতিরিক্ত দুধ-চিনি মিশিয়ে অখাদ্য বানিয়ে ফেলেছেন। চা পান অসমাপ্ত রেখেই হাঁটতে থাকি। রাস্তার পাশ ধরে এখানকার মানুষজন হাঁটে গদাইলস্করি চালে— কেউবা লুঙ্গি-উরু চুলকিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোয়। কী অবাক ব্যাপার, বাস এসে থেমেছে রাস্তার মাঝখানে! জানতে পারলাম, ব্রিটিশ শাসনামলে মায়ানমারে বাম দিক থেকে যান চলাচলের নিয়ম চালু করা হয়। এরপর আশির দশকে খুব বেশি হিসাব না কষেই জেনারেল মহাশয় নিয়মটা পরিবর্তন করে যান চলাচলের জন্য ডান দিক ধার্য করেন। জেনারেল সাহেবের গিন্নির জ্যোতিষী হাতের রেখা গুনে নিদান দিলেন, ডান দিকে যান চলাচল দেশের জন্য কল্যাণকর হবে।

পাকা রাস্তায় বা ফুটপাতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ দেখে আঁতকে উঠলাম। পথে-ঘাটে এতো এতো শোণিত চিহ্ন? স্বাস্থ্যবান ড্রাইভার গাড়ির গ্লাস খুলে বিশেষ কসরতে পানের লাল পিক ফেলল রাস্তার দিকে। এবার বুঝতে পারলাম, ফুটপাতে ও রাস্তায় পানের রসের চিহ্নগুলোকে আমার চোখে রক্তের চিহ্ন বলে বিভ্রম জাগিয়েছে। বর্মাইয়াদের মতো এমন পানখেকো জাত দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই। মাঠের কৃষক, মোড়ের দোকানদার, ঝলমলে তরুণী ও দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার, এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুকেও আপনমনে পান চিবুতে দেখেছি। মানুষজন মোড়ে মোড়ে বসে আড্ডা মারে। পান-তামাক ছাড়াও আরেকটা বিষয় আমার দৃষ্টি কেড়েছে— অফিস, আদালতে, বাজার ঘাটে সবার পরনে লুঙ্গি আর লুঙ্গি। রাস্তার মাঝখানে বাস থামিয়ে লোক উঠায়— পানরঞ্জিত ঠোঁটে কন্ডাক্টর বাসের গায়ে বাড়ি মেরে বলে, গম? আমাদের চাটগাঁর ভাষা? ঠিক বুঝতে পারি না।

বাস কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। পদব্রজে মোড় ঘুরতেই দেখি— মুখে থানাকা, পেলব বাহু, পাথুরে কুচ, খোলা কুন্তল আর প্রগাঢ় দৃষ্টির বান আর ফোলাফোলা ঠোঁটের দুই নারী। একজনের খোঁপায় সাঁটা রংচঙে ফুল।

এদিকে ঘন পাতার শামিয়ানা, ঝোপঝাড়, শেয়ালকাঁটা, ঢেঁকিশাক। একটু দূরে ধানি জমি, মাছের ঘের আর বাঁশবনের জটলা। ঘাসের উপর শুকনো পাতার স্তূপ জমেছে। জলবিলাসী মোষ গা জুড়িয়ে নিচ্ছে কালো জলে। মাথালপরা কিষাণী আপনমনে ধানের চারা রোপণ করছেন ভেজা খেতে। কেমন যেন শুটকি ভাজার গন্ধ পেলাম। মোড়ে মোড়ে বিক্রি হচ্ছে নুডলস আর নানাপদের সবজি। মহিলা দোকানির কোলে ফুটফুটে শিশু। নিচে দোকান, দোতলায় বা পিছনে এদের থাকার ঘর। এখানকার জনপ্রিয় খাবার মোহিঙ্গা— শুকনো মাছ, নারকেল, চালের গুঁড়ো, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ, ডিম ও কলা সহযোগে প্রস্তুতকৃত এই স্থানীয় পদ। এছাড়াও আছে আদা সালাদ আর রাইস নুডুলস। চিংড়ি ভাজা, ছাগমাংস,

মাংস-ভাজা, ভুট্টা, পাকা আম, নারকেল আর বিন্নি ভাতের নানান পদ দেখলাম এই হোটেলে। আমি এসব কিছুই খেতে সাহস করিনি, বরং একটু চেখে দেখি, চিংড়ির সাথে বাঁশের অঙ্কুর আর নানান কিসিমের মসলা দিয়ে তৈরি লোকাল সুপ। তবে সুপ খেতে গিয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না, বিবমিষা উদ্রেককারী গন্ধ পেয়ে মনে মনে আউড়াই— লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...

সুপের বাটি ঠেলে সামনে এগোই। দোকানি কিছুতেই দাম নেবে না। ভাবলাম, এতো ভদ্র আর অতিথিবাৎসল এই মগের মুল্লুকের মানুষেরা। এরাই আবার লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা খুন করে, জ্বালিয়ে মারে আর বাস্তুচ্যুত করে? লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে চলে এসেছি। জায়গাটা একটু নির্জন, কেমন যেন গাছপালায় ঠাসা। চারধার কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। মার্শাল আর্টের ড্রেস পরা একটা জওয়ান চলে গেল সাইকেল হাঁকিয়ে। একটু ভয় পেলাম— পকেটে তো টাকার বস্তা, এদিকে চুরি-চামারি হয় কী না। না, এসব কিছুই ঘটেনি। আবাসে ফিরে গৃহস্বামীর কাছে যা শুনলাম তা এই— রেঙ্গুনে নাকি চুরি, ছিনতাই আর রাহাজানির হার শূন্য। আগে নাকি এরূপ অপরাধ হরহামেশা ঘটত এই মফস্বল শহরে। সেনাশাসনের কড়া নজরদারিতে এখন নাকি পুলিশের চোখে ঘুম নেই। ছিনতাই, ডাকাতি বা খুব খারাবি হলে রেঙ্গুনের থানা-পুলিশকে আঞ্চলিক সামরিক কমান্ডারের কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হয়। পর্যটক কেউ ছিনতাইয়ের শিকার হলে তো আর রক্ষা নেই। স্থানীয় ওসি সাহেবকে মিলিটারি বাহিনীর বিস্তর জেরা এমনকি গালাগাল-মারধরের মুখেও নাকি পড়তে হয়। সামরিক জান্তার কতসব সমালোচনা শুনি। মানুষের নিরাপত্তার জন্য থানা-পুলিশের উপর মিলিটারি ফৌজের এরূপ খবরদারির খবর শুনে মজা পেলাম।

এদিকে ঘন পাতার শামিয়ানা, ঝোপঝাড়, শেয়ালকাঁটা, ঢেঁকিশাক। একটু দূরে ধানি জমি, মাছের ঘের আর বাঁশবনের জটলা। ঘাসের উপর শুকনো পাতার স্তূপ জমেছে। জলবিলাসী মোষ গা জুড়িয়ে নিচ্ছে কালো জলে। মাথালপরা কিষাণী আপনমনে ধানের চারা রোপণ করছেন ভেজা খেতে। কেমন যেন শুটকি ভাজার গন্ধ পেলাম।

বিকেলের দিকে উল্টোদিকে হাঁটতে গিয়ে লক্ষ করলাম, একটু পর পর অপরূপ সব সোনালি প্যাগোডা দাঁড়িয়ে আছে সুচালো শির উঁচু করে। সোনালি রোদ্দুর লেগেছে সোনালি কিয়াং এর গায়। কিছু গরিব-গুর্বো মানুষ ভিক্ষারপাত্র নিয়ে বসে আছে পথের ধারে। আমার নিউরনে উঁকি দেন কবি পাবলো নেরুদা—

“দেরিতে পৌঁছেছিলুম রেঙ্গুনে
সব কিছু আগে থেকেই ছিল ঠিকঠাক।
এক রক্তের শহর,
স্বপ্নের ও স্বর্ণের
বুনো অরণ্য থেকে ধেয়ে আসছে নদী
রুদ্ধশ্বাসে নগরে
আর কুষ্ঠগ্রস্ত রাস্তায় রাস্তায়
যেখানে সাদাদের জন্য সফেদ হোটেল
আর সোনালি প্যাগোডা সোনালি লোকদের জন্য”
পাবলো নেরুদা, রেঙ্গুন ১৯২৭

কেউ যেন ফিক করে থুথু ফেলল। একদল বাঁদর অবলীলায় হেঁটে যাচ্ছে সামনের দিকে। পাথুরে চত্বরে পদ্মাসনে স্থির বসে আছে এক যুবতী মেয়ে, তাঁর মুদিত চক্ষু বেয়ে বইছে ম্রিয়মাণ জলের ধারা। অনন্তের কাছে নিথর মানুষটিকে সম্পূর্ণ সমর্পিত বলে মনে হলো। এক রূপসী মেয়ে ধ্যান ভেঙে সামনের খাঁচা থেকে মুক্ত করল কয়েকটা বন্দী ঘুঘু। বুঝলাম, এটা ধর্মসাধনার অংশ। এই রোদের আঁচে চাতাল বেশ উষ্ণ হয়ে উঠেছে। খালি পায়ে এগিয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। কিয়াং চত্বরে বেশ কয়েকটা তেড়াবেড়া কৃষ্ণচূড়া গাছ। সবগুলো ডালে ফুল ফুটেছে, মৃদু বাতাসে লাল পাপড়ি ঝরে পড়ছে ঘাসের বুকে। গাছের পাতায় বাতাসের ছোঁয়া লাগে। এছাড়া এমনিতে চারধার নিঝুম, নিস্তব্ধ। একপাশে দলবেঁধে নগ্নপায়ে হাঁটে কয়েকজন মৌন সাধক— মস্তক-মুণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু, এঁদের পরনে রঙিন পিরান— হলুদ বা মেরুন। শুনেছি, বৌদ্ধভিক্ষুগণ ওয়াকিং মেডিটেশন করেন— প্রক্রিয়া খুব সহজ— নিঃশব্দ হয়ে শুধুই হাঁটা। শুনেছি, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে নিবেদন, ক্ষমা আর শান্তি। মহামতি বুদ্ধ প্রতিদিন খালি পায়ে হাঁটতেন মাইলের পর মাইল আর সেই সময় নাকি তিনি নিজের মহৎ ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে রাখতেন। আশি বছর বয়সে মহাপ্রয়াণের আগের দিনও তিনি প্রায় ২০ মাইল পথ হেঁটেছেন বন্ধুর পথে। পৃথিবীর সাধক, মুনি, ঋষিদের মূল কাজই ছিল হেঁটে হেঁটে মানুষের কাছে ক্ষমা ও ত্যাগের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এইসব ধর্মীয় সেবকদের পরনে হলদে বা মেরুন পোশাক, হাতে বা কাঁধে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র— এরা বেরিয়েছেন কিসের সন্ধানে? আমি হাত উঁচিয়ে বললাম, শান্তি। দলনেতা গোছের বুড়ো ভিক্ষু হেসে বললেন, ওম শান্তি, ওম। সাধকের দল ধীরলয়ে চলে গেলে আমি একবার তাদের দিকে তাকাই, আবার তাকাই রঙিলা ফুলের দিকে। সোনালি-জারুল, কৃষ্ণচূড়া আর পদাউকের ভিড়ে রঙিন পোশাকের অপসৃয়মাণ সাধকদের দেখায় জীবন্ত ফুলের মতো। এক চতুরমতো লোক এসে বলল, বুদ্ধের আমলের পাথর, ছুঁয়ে চোখ বন্ধ যা কামনা করবেন, তা ফলবে সহসায়। বিনিময়ে দিতে হবে কিছু ডলার! এই টাউটের ইংরেজি জ্ঞান বেশ সমৃদ্ধ। আমি কিছু বলবার আগেই এক গৌরী নারী এলো, ব্রিটিশ নারী এই

ব্যাটার বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে চোখ বন্ধ করে এই পাথর ছুঁয়ে ধ্যানমগ্ন হলো। ভাবলাম, এই বেকুব মহিলার পূর্বপুরুষগণ এক সময় আমাদের দেশে অনেক ঠগবাজি করেছে। এখন ব্রিটিশ মহিলা নিজে ঠকছে দেখে খানিকটা আনন্দ পেলাম। আমি কাপালিকের দেশের মানুষ, এইসব তুকতাকে মজবার পাত্র নই। কিয়াং এলাকা ছেড়ে অন্যদিকে হাঁটি— যেখানে এরূপ দুষ্টু লোক নেই।

আমিও বেকুবের মতো হাঁটতে হাঁটতে একটা শামিয়ানা টানানো এলাকার কাছে এসে পড়েছি। কেমন যেন নদীর পাড়ে দেখা গঞ্জের মতো ঘিঞ্জি এলাকা। উৎসব উৎসব আমেজ এদিকটায়। ভাজা মসলার গন্ধ পেলাম। বিশেষ কসরতে গরুর চামড়ার পশম তুলে মসলাপাতি-কড়া ঝাল দিয়ে রান্নাকরা খাবারটি দেখেই জিবে জল এলো। বাঁশের কোঁড়লে রান্না হচ্ছে নাড়িভুঁড়ি। ছাগলের অণ্ডকোষ, ঘুঘু ও চড়ুই ভাজা ও মদ বিক্রি হচ্ছে দেদারসে। এক দালাল মতো লোক দুই হাতে কুৎসিত ভঙ্গি বানিয়ে ফিসফিস করে বলল, এসব খেলে নাকি মর্দামী শক্তি বাড়ে! তাকে এড়িয়ে পিছু হটি। দালাল হাসি হাসি মুখ করে এক মেয়ের ছবি দেখিয়ে বর্মী মাখরাজের হিন্দি জবানে বলল, বহুত খুবসুরত! আমি ধীরলয়ের হাঁটা বাদ দিয়ে প্রায় দৌড়ে সামনের জনস্রোতে শামিল হলাম।

বাংলোর দিকে ফিরবার পথ খুঁজি। তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি মনে হয়। পথের হদিশ খুঁজতে কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে বুঝলাম, এরা হয় মৌনব্রতে আছে নয়ত এদের ইংরেজি জ্ঞান শূন্য। স্মার্ট ফোনের দ্বারস্থ হই হারানো পথ খুঁজতে। ওপরের দিকে তাকাই, দূর আসমানে ছোপ ছোপ মেঘের ছায়া। মোড় ঘুরতেই শুনি পুণ্যার্থীদের মুখনিঃসৃত প্রেমময় অনুনাদ—

ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা......

এই পরবাসে মিলাদের আওয়াজ শুনে বেশ অবাকই হলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এটা মুসলিম পাড়া। ইংরেজি, উর্দু আর বর্মি হরফে লেখা নির্দেশক দেখে জানলাম, খানিকটা দূরে ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি। ভাবছি, একদিন গিয়ে হতভাগ্য জাফরের কবরে দোয়া খায়ের করে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবো।

সাকিন সাইকেল

মনিরুল ইসলাম

১০ এপ্রিল ২০২৫ ।

বৃহস্পতিবার সকাল, মহাখালী বাস টার্মিনাল। আটটার কিছুটা আগে অথবা কিছুটা পরে। ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দ, মানুষজনের ছোটাছুটি, বিভিন্ন গন্তব্যের নাম ধরে কন্ডাক্টরের হাঁকাহাঁকি, কর্ণবিদারী হর্নের শব্দ, যাত্রীর ব্যাগ ধরে টানাটানি। এরই মাঝে আমি ও জুয়েল রাফির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। সকাল সাতটার আগে ওর বিল্ডিংয়ের সদর দরজা খোলা হয় না। সকালের অনেক কার্যক্রমে সে সময়মতো পৌঁছাতে পারে না। ঢাকা শহরের বাড়িওয়ালাদের এ এক অন্যায় নিয়ম। বিয়ের পর প্রথম যে বাসায় উঠেছিলাম, সেখানে এইসব নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাতে ফিরতে দেরি হলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। অনুশোচনায় ভোগা অপরাধীর মতো বাড়িওয়ালার বাসার কলিং বেল চাপতে হতো।

একটু দেরি হলেও রাফি চলে এল। করিৎকর্মা ছেলে এসেই পুরো পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে নিল। ঘোষণা করে দিল—রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা বাসে উঠতে হবে। টাকা ও সময় বাঁচানোর ফন্দি। প্রতিটা বাসকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে টার্মিনাল ছেড়ে যেতে হয়, আসন পূর্ণ হোক বা না হোক। এরাও বেশ চালাক, নিয়মকানুনের বেড়াজাল কীভাবে ডিঙাতে হয় ভালো করেই জানে। টার্মিনাল ছেড়ে বেরিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আসন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায়।

সেরকম অপেক্ষারত একটি বাস ঠিক করা হলো। আর দেরি নয়—রাস্তার ধুলোর মধ্যেই তাড়াহুড়ো করে সাইকেলগুলো খুলে একে একে বাসের বক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। বাস যখন চলতে শুরু করল, ঘড়িতে তখন সকাল নয়টা।

আমাদের ভ্রমণের পরিকল্পনাগুলো অনেকটা রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ওয়াদার মতো—শব্দে গম্ভীর, ভাবনায় রোমাঞ্চকর, বাস্তবে একরাশ হাওয়া। যা বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। সেরকমই একটা পরিকল্পনা হলো সীমান্ত সড়ক ধরে সাইকেল চালানো। দেশকে জানা ও বোঝার জন্য এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর হতে পারে না। প্রায়শই নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কথা চালাচালি হয়, আলাপও হয়। সব কিছুই চায়ের কাপের ধোঁয়ার মতো এক সময় হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বাস্তবায়নের কোনো প্রস্তুতি বা আগ্রহ কারো মধ্যেই দেখা যায় না।

আমাদের মাস্টারমাইন্ড জুয়েল হঠাৎ করে মহাশ্চর্য সেই প্রস্তাবখানা নিয়ে হাজির—"চলেন সীমান্ত সড়ক ধরে সাইকেল চালিয়ে আসি।" চলো। ম্যাপ ঘেঁটে ও স্থানীয় সাইক্লিস্টদের সাহায্য নিয়ে আড়াই দিনের একটি পরিকল্পনা দাঁড় করানো হলো। আগেই বলে নেওয়া ভালো, আমাদের কেউই সেই অর্থে সাইক্লিস্ট নই। ত্রিশ কিলোমিটার চালালেই যাদের কুকুরের মতো জিহ্বা বেরিয়ে আসে, পশ্চাৎদেশ ব্যথা করে—তাদের আর যাই হোক সাইক্লিস্ট বলা সমীচীন নয়। আমাদের উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র; যেখানে সাইকেল চালানোটা মুখ্য নয়, ভ্রমণটাই আসল, বাহনটা শুধু সাইকেল।

দীঘারকান্দা বাইপাস মোড়টা আসতেই তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়ি। বাসটা একবারও পিছনে তাকাল না। আমাদেরকে নামিয়ে সোজা ময়মনসিংহ শহরের দিকে চলে গেল। চাইলে আমরাও শহরে চলে যেতে পারতাম, কিংবা হালুয়াঘাট। হালুয়াঘাট গিয়ে সীমান্ত সড়কে উঠে যাওয়া যেত সহজেই। কিন্তু আমাদের ভ্রমণগুলো কখনোই সরলরেখায় হাঁটে না। ঠিক করেছিলাম, সরাসরি সীমান্ত সড়কে উঠব না। পথটাকে একটু ঘুরিয়ে নেব, ছুঁয়ে দেখব চারপাশ।

এই যে আশেপাশের গ্রাম, পুরোনো দিনের কোনো ঐতিহাসিক স্থাপনা, কিংবা হঠাৎ করে সামনে পড়ে যাওয়া কোনো জাতীয় উদ্যান—এসবের মাঝ দিয়েই এগোতে চাই। গন্তব্যের চেয়ে পথটাই আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে বারবার। সত্যি বলতে কী, আমরা খুব বেশি হিসেব করে বেরোই না। প্রতিটা ভ্রমণই আলাদা, আলাদা তার ছন্দ। আগে থেকে সবকিছু ভেবে, কাগজে-কলমে আঁকতে বসলে সেই অজানার আনন্দটাই মরে যায়। তাই ঠিক করেছি, যখন যা ভালো লাগবে, সেদিকেই হাঁটব। পথ যদি ডাকে, সাড়া দেব। বাকিটা পথই ঠিক করে নেবে।

পরিকল্পনা করার সময় চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব মহাসড়ক ও মূল শহরগুলো এড়িয়ে চলতে। মহাসড়কগুলোতে দোকানপাট ও যানবাহনের আধিক্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। পথের প্রাণ হলো মানুষ ও প্রকৃতি। এই দুটোর কোনোটিই মহাসড়কগুলোতে থাকে না; যা থাকে তা হলো ব্যস্ততা আর ধুলোবালি। তাছাড়া বাসা থেকে সতর্কবার্তা দেওয়া আছে—"সাবধানে চালিয়ো, বুড়ো হাড্ডি সহজে জোড়া লাগে না।"

রাফি ও জুয়েল সাইকেল জোড়া লাগাতে ব্যস্ত হয়ে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়াতে এই এক সুবিধে, কায়িকশ্রমে ছাড় পাওয়া যায়। ওদের এই ভালোবাসা আমাকে ভ্রামণিক হিসেবে পঙ্গু করে তুলেছে। এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে ওদের সঙ্গ ছাড়া ভ্রমণ উপভোগ্য হয়ে ওঠে না!

বাইপাস সড়ক এড়িয়ে নটর ডেম কলেজ সড়ক ধরে উড়তে শুরু করে সাইকেল। ময়মনসিংহে যে নটর ডেম কলেজ আছে তা জানা ছিল না। পথে ঢুকেছি অমনি স্কুল ছুটি হলো। নতুন পানির পোনা মাছের মতো বাচ্চারা সব ঝাঁক ধরে বেরিয়ে এল। তাদের ছোট্ট মাথায় এমনিতেই কতশত প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। তার ওপর এই অদ্ভুতদর্শন সাইক্লিস্টদের দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোথায় যাবেন? কোথা থেকে এসেছেন? সাইকেলের দাম কত? তাও ভালো, অনেকের মতো লাভ-ক্ষতির হিসেব কষতে বসে যায়নি।

একপাশে বসতি আরেক পাশে ধানের ক্ষেত, মাঝ বরাবর এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে পিচঢালা পথ। গ্রাম ও গ্রামের পথ কোনোটিই আর আগের মতো নেই। আজকাল নিজের ওপরে রাগ হয়। পথে নেমে এলে কতশত সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, তার কোনো কিছুই লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারি না। মনের ভাব প্রকাশের এই যে দৈন্যতা, এই জনমে কাটবে বলে মনে হয় না। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি কালচে সবুজ ধানক্ষেতের পাশে। দুরন্ত বাতাস দোল খেয়ে বেড়াচ্ছে কচি ধানের শীষে। ঢেউ খেলে যায় মনে, অন্তরে। এই যে মনের মধ্যে আনন্দের স্রোতধারা বয়ে যায়, সেই অনুভূতি প্রকাশ করার অস্ত্র আমার অস্ত্রাগারে নেই। সাইকেলের পিছনে দুরন্ত বাচ্চারা আনন্দের অতিশয্যে দৌড়ে আসে, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন জানায়। সদ্য বৃষ্টিতে ঝরে পড়া কড়া আমের গুটি হাতে দিয়ে বলে—খেয়েই দেখ না, কেমন লাগে! এই সব অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করা যায় আমি জানি না।

এক সময় বাড়েরার পাড় ছেড়ে ময়মনসিংহ - ফুলবাড়িয়া রোডে উঠে আসি। দাপুনিয়া ঢুকতেই মন ভিজিয়ে বৃষ্টি। মন ভিজলে সমস্যা নেই বরং আনন্দের। কিন্তু শরীর ভিজলে রেগে তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবে।

প্রথমবার অল্পতেই বৃষ্টি সরে গেল, কিন্তু ছেড়ে গেল না। অল্পক্ষণে আবার ফিরে এল—আরও শক্তিশালী হয়ে, ঝড়ো হাওয়ার ওপর ভর করে। আবহাওয়া পূর্বাভাসে বৃষ্টির কোনো আভাস ছিল না। সঙ্গত কারণে মোকাবিলার কোনো প্রস্তুতিও নিইনি। ভিজতে দেখে হোসেন ভাই তাঁর অটোরিকশার গ্যারেজে ডেকে নিলেন। অনাহুত মেহমানদের নিয়ে উৎসবে মেতে উঠলেন। আপ্যায়নের জন্য এক গামলা মুড়ি-চানাচুর, পেঁয়াজ ও মরিচ দিয়ে মেখে হাজির করলেন। বৃষ্টির মধ্যে এই আতিথেয়তা একদমই প্রত্যাশিত ছিল না। অপ্রত্যাশিত ভালোবাসায় হৃদয় একদম বরফগলা পানি। একটু টোকা পেলেই আনন্দাশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসবে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কোনো গ্রাম নয়, তবে আবহটা গ্রাম্য। আমরা যে গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছি তার উল্টো দিকেই হোসেন ভাইদের বাড়ি। হোসেন আমার থেকে অনেক ছোট কিন্তু সম্মান করে ‘ভাই’ বলছি। শহুরে বোলচালে হয়তো ‘সাহেব’ বলা যেত, কিন্তু সে বড় দূরের ডাক। যে এই ঝড়-ঝড় বাদল দিনে মুড়ি-চানাচুর মাখা খাওয়াতে পারে সে আর যাই হোক দূরের কেউ নয়। বাড়ির প্রথম ঘরটি ইট-পাথরের। অন্য ঘরগুলো টিনের। এরকম একটি টিনের ঘরের দাওয়ায় ছাগল, মুরগি ও একটি কুকুর আশ্রয় নিয়েছে। একটি দুষ্ট ছাগলের বাচ্চা এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টি যেন তাকে ছুঁয়ে যায়। এক মধ্যবয়সী মহিলা—মা যেমন করে বেয়াড়া বাচ্চাদের জ্বর আসার ভয়ে তাড়িয়ে ঘরে তোলে, তেমন করে ছাগলের বাচ্চার ঘাড় ধরে টিনের ঘরের দাওয়ায় দিয়ে এলেন। একালের অপু-দুর্গারা ছোট ছোট আমের গুটি কুড়াতে বেরিয়ে এল। যদিও এগুলোর কোনোটিই খাওয়ার যোগ্য নয়। এরাও হয়তো খাবে না, কুড়াতেই যত আনন্দ।

এক সময় বৃষ্টি ধরে এল। আবারও প্যাডেলে পা পড়ল, ছুটে চলল আমাদের সাইকেল ময়মনসিংহ - ফুলবাড়িয়া সড়ক ধরে। দাপুনিয়ায় এসে একই সড়ক ধরে এগিয়ে গেলাম। জুয়েল বুঝতে পারল ভুল পথে চলে এসেছি। তখনও বেশি দূর এগোইনি। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে আবার ফেরত চলে এলাম। এবার মুক্তাগাছা নতুন বাজারের পথ ধরলাম। খেরুয়াজানী অতিক্রম করে খিলগাতি বাজার ছাড়িয়ে নদীর পাড়ে এসে থামলাম।

আবারও কিছুটা ভুল পথে চলে এসেছি মনে হলো। নদীর ওপারে পথ রয়েছে কিন্তু কাঁচা এবং সদ্য বৃষ্টিতে কাদা কাদা হয়ে আছে। গরু চড়াতে যাচ্ছে এমন একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম। “যেতে পারবেন তবে কাদায় কষ্ট হবে। বরং আবার খিলগাতি বাজার গিয়ে বামের পথ ধরে এগিয়ে যান। এই পাড় দিয়েও যেতে পারেন, সামনের ব্রিজ পার হয়ে আবার মুক্তাগাছা নতুন বাজারের রাস্তায় উঠে যান।” নদীতে খুব একটা পানি নেই। দুই পাড় কেটে তাতে চাষবাস করেছে। তবে নদীর গভীরতা

ধলভূমগড় স্টেশনের মতো এই জায়গাটাও অলস নিঝুম। বিকেল হওয়াতে রাস্তায় গাড়ির চাপ কমে গিয়েছে। গেট খোলা হা করে। প্রবেশদ্বার টিকেট কাউন্টার কোথাও কোনো মানুষ নেই

দেখে মনে হয় বর্ষায় ভালো রকমের পানি থাকে। ধাপ কেটে সিঁড়ি বানিয়ে নদীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে গোসল করছে অনেকেই। নদীর পাড় ধরে এগোতেই একটি বড় বটগাছের কাছে দাঁড়ালাম। নদীর পাড়ে বটগাছ—পুরানো গ্রামের চিত্র মানসপটে ভেসে উঠল। আবার আরেকটি ব্রিজ পেরিয়ে ফুলবাড়িয়া-নতুন বাজার সড়কে উঠে এলাম।

মুক্তাগাছা নতুন বাজার এসে সাময়িক বিরতি। কলা ও সিঙ্গাড়া—এই হলো দুপুরের খাবার। রাফি রোজা। এই ছেলেটা রোজা রেখে সাইকেল কীভাবে চালাচ্ছে, আমার মাথায় আসে না। মধুপুরের কলাগুলো বেশ সুস্বাদু এবং নরম, মুখে দিলে গলে যায়—মিষ্টি যেন মধু।

এবার হাইওয়ে ধরে চালাতে হবে। গাছের ছায়া নেই, যানবাহনের চাপ, ধুলোবালি—যন্ত্রণাময় পথ। কিছুদূর এগোতেই একটি সড়ক জামালপুরের দিকে চলে গেছে। আমরাও জামালপুর যাব তবে আজ নয়, আগামীকাল। অনেক কষ্টে সৃষ্টে যখন রসুলপুরে মধুপুর জাতীয় উদ্যানের গেটে পৌঁছালাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা। ধরেই নিয়েছিলাম জাতীয় উদ্যানের ভিতর দিয়ে সাইকেল চালানোর অনুমতি মিলবে না—দেরি হয়ে গিয়েছে। ময়মনসিংহের বন্ধুরা পই পই করে বলে দিয়েছে, সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই যেন বনের পথ অতিক্রম করি। রাত হয়ে গেলে সর্বনাশ। রাতে বন পাড়ি দেওয়া মানে সেধে বিপদ ডেকে আনা। তার চেয়ে জলছত্র বাজারের আগে ২৫ মাইল হয়ে দোখলা যাওয়া ভালো। পথ বেড়ে যাবে অনেকটাই, কিন্তু নিরাপদ।

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’র চার যুবকের মতো জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারে এসে যখন দাঁড়ালাম তখন বিকেল পাঁচটা। ধলভূমগড় স্টেশনের মতো এই জায়গাটাও অলস নিঝুম। বিকেল হওয়াতে রাস্তায় গাড়ির চাপ কমে গিয়েছে। গেট খোলা হা করে। প্রবেশদ্বার টিকেট কাউন্টার কোথাও কোনো মানুষ নেই। বনে ঢোকার সময় পেরিয়ে গিয়েছে সেই কখন। কোনো কিছু চিন্তা না করেই বিনা অনুমতিতে, বিনা টিকেটে ঢুকে পড়লাম অরণ্যের পথে। সভ্য মানুষের চলাচলের পথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে জংলি হয়ে গিয়েছে। রেমা-কালেঙ্গার পর এই প্রথম অন্য কোনো জাতীয় উদ্যানের

বুক চিরে সাইকেল চালাতে যাচ্ছি। অরণ্যভূমির নির্জনতা ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে মনের মধ্যে জমে থাকা সব দুর্ভাবনা কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

গত ফেব্রুয়ারিতে এই বনে এক রাতের জন্য ক্যাম্পিং করেছিলাম। আজ আবার ফিরে এসেছি। কিছুদূর এগোতেই দেখি পথ আগলে বসে আছে এক বিশালাকৃতি বানর। আমাদের উপস্থিতিতে সে একরকম বিরক্তই হলো! নির্জনতা উপভোগে ব্যাঘাত ঘটায় মহাবিরক্ত। ভাবখানা এমন—"আমাদের রাজত্বে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ কেন?"

চারপাশে অদ্ভুত এক শব্দমালার প্রতিধ্বনি—ঝিঁঝিঁ পোকারা যেন একসাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। অনেকে এদেরকে 'আম পাকানি' পোকা নামে ডেকে থাকে। এখনো আম পাকার সময় আসেনি, নিশ্চয় মহড়া চলেছে। আমের মতো সুস্বাদু ফল পাকানোর গুরুদায়িত্ব এদের কাঁধে, হেলাফেলা করলে চলবে না! কেবল কোকিলের ডাকটুকুই চেনা মনে হয়; বাকি সব পাখির ডাক আমার বোধের বাইরে। বনে অনেক ধরনের শব্দ হয়, কিন্তু তার অর্থ আমার কাছে অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। তবু কেন বারবার ফিরে আসি এই বনের ডাকে? কী এক অমোঘ আকর্ষণ, তার উত্তর নিজেও জানি না। শুধু জানি, এই নির্জনতা, এই বিস্তৃত নিরুদ্ধতা—আমাকে ডাক দেয় বারবার।

পুরো জীবনটাই তো অজানার মোহে জড়ানো। জন্মের মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় জানার এই অন্তহীন যাত্রা। একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জন্ম নেয় আরও শত প্রশ্ন। আমরা যতই জানতে চাই, ততই বুঝি কত কিছু অজানা রয়ে গেছে। জীবন থেমে যায়, কিন্তু জানা শেষ হয় না—অজানার সেই টানই হয়তো আমাদের বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

সন্ধ্যা ঘনীভূত হওয়ার আগেই পৌঁছে গেলাম দোখলা। রেস্ট হাউসের কাছে এসে দেখি বেলাল ভাই হেঁটে যাচ্ছেন। এই হাসিখুশি ছোটখাটো মানুষটা গত ফেব্রুয়ারি মাসের ক্যাম্পিংয়ে অনেক সাহায্য করেছিলেন। আমাদেরকে যেতে হবে আরও কিছুটা সামনে—পীরগাছা বাজার। বেলাল ভাই বলে দিলেন কোথায় থেমে সঞ্জয় দাদাকে ফোন দিতে হবে।

এই বছরে দ্বিতীয়বারের মতো এলাম দোখলা। মধুপুরের পীরগাছা ও বাইদ এলাকা থেকে পৃথক দুটি খাল অরণখোলা মৌজায় এসে একীভূত হয়েছে—যা কালক্রমে দোখলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দোখলা বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যে আমার আগ্রহের মূল কারণ। তবে দোখলা আরও একটি কারণে আগ্রহ তৈরি করছে, সেটি হলো বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজড়িত রেস্ট হাউস।

বন পরিদর্শনকারী ভিআইপিদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ ও বিশ্রামের জন্য দোখলায় বন বিভাগ ১৯৬২ সালে দোখলা রেস্ট হাউস স্থাপন করে। তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নরসহ বহু ভিআইপি মধুপুরের গহীন বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতে এসে দোখলা রেস্ট হাউসে অবস্থান করেছেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর ১৯৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তাঁদের ছোট ছেলে শেখ রাসেলকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য বনের মাঝে নিরিবিলি ও নিরাপদ দোখলা রেস্ট হাউসে এসেছিলেন।

দোখলা বাজার পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেলেই পীরগাছা বাজার। পৌঁছে সঞ্জয় দাদাকে ফোন দিল জুয়েল। সঞ্জয় দাদা বাজারেই ছিলেন, আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। ছোটখাটো গড়নের, আন্তরিক এক আদিবাসী মানুষ—চোখেমুখে সরলতার দীপ্তি।

বাজার থেকে বাঁ দিকে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটি সাইনবোর্ড—থাংয়ানি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। এটাই আমাদের আজ রাতের ঠিকানা। প্রবেশ করতেই চোখে পড়ে সবুজ ঘাসে মোড়ানো মাঝারি মাপের একটি খোলা মাঠ। ডান পাশে দেখা যায় ফাদার ইউজিন হোমরিক ভবন—ক্রেডিট ইউনিয়নের মূল দপ্তর। সোজা দৃষ্টিতে ধরা দেয় একটি টিন শেডের বিল্ডিং, আড়াআড়ি করে দাঁড়ানো।

ভিতরে পা রেখেই দেখি প্রথম দুটি ঘরেই থাকার ব্যবস্থাপনা—ছিমছাম, ব্যবহারিক। পরের ঘরগুলো লম্বাটে আকৃতির, চেয়ার-টেবিল সাজানো দেখে বোঝা যায় এগুলো কমিউনিটি হল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর একেবারে শেষে একটি রান্নাঘর—চমৎকার গোছানো, যেন একেবারে পেশাদার কিচেন।

জুয়েল যোগাযোগ করেছিল আরেকটি হোমস্টের সঙ্গে—তবে সেটি বেশ ব্যয়বহুল। ওই হোমস্টের মালিক ক্লিনটন এখানে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যদিও এই আশ্রয়স্থল সবার জন্য উন্মুক্ত নয়—নির্বাচিতদের জন্যই বরাদ্দ। সাইক্লিস্ট হবার বেশ সুবিধে রয়েছে, পথে নামলে বোঝা যায়! পথে নামলে পথ বের হয়ে যায়।

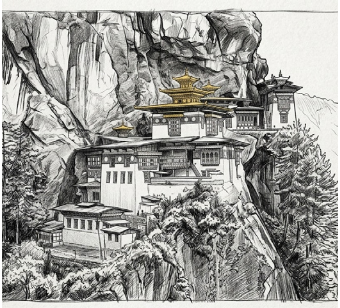

টাকিনের ঠিকানায়

অনিন্দিতা সেন

ইমিগ্রেশন কাউন্টারের লম্বা লাইন...... অসীম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে করতে প্রায় সারাটা দিন কেটে গেল। অবশেষে ইনারলাইন পারমিট নিয়ে ফুন্টশোলিং ও জয়গাঁর মধ্যবর্তী বর্ডার গেট পেরিয়ে ভুটান প্রবেশ করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীটাই যেন পালটে গেল কোন এক যাদুবলে। ঘন সবুজের বুক চিরে অসম্ভব ভাল ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে সুইফট ডিজ্যায়ার ছুটে চলল আমাদের নিয়ে রাজধানী থিম্পুর দিকে। পারমিট পেতে দেরি হওয়ায় পৌঁছতেই বেশ রাত। তবুও যতদূর চোখ যায় গাড়ির জানলা দিয়ে শান্ত পাহাড়ি শহরটির বাহুল্যবর্জিত মোহময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করছিলাম। বলাই বাহুল্য বর্ডার গেট পেরোতেই আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড বিকাশের নির্দেশে হাতঘড়ির সময় এগিয়ে নিয়েছিলাম আধ ঘণ্টা।

সকাল হতে কর্মব্যস্ততা নজরে এল। ব্রেকফাস্ট এর পর সেরে ফেললাম একে একে চোরতেন মেমোরিয়াল, বুদ্ধ পয়েন্ট, চামলাংথাং মনাস্ট্রি, থিম্পু ভিউ পয়েন্ট, জু, রয়্যাল প্যালেস ভ্রমণ। তার মাঝেই একবার সময় করে লাঞ্চ সেরে নেওয়া। মুখখানি ঘোড়ার মতো, আর পেছনটা যেন গরু। এহেন প্রাণী তার স্বদেশের মতোই নির্বিরোধী। হ্যাঁ অবশ্যই তার সাথে দেখা হল আমাদের, অপূর্ব পাহাড়ি সৌন্দর্য ও গাছগাছালির মাঝে জু-তে। বলাই বাহুল্য ইনিই ভুটানের জাতীয় প্রাণী টাকিন। ফিরে এলাম হোটেলে। অবশ্য হ্যাঁ, বিকেল দিকে একবার ঘুরে এসেছি বৈকি হ্যান্ডিক্রাফ্ট মার্কেটে। কিন্তু জিনিসপত্রে হাত দেওয়ার সামর্থ বিশেষ হল

না। বোঝাই গেল ট্যুরিজম থেকে গলা কাটা দামে প্রচণ্ড মার্জিন রেখে হাতে তৈরি জিনিস বিক্রি করে ওদেশে অনেকেই দিন গুজরান করে। ইন্ডাস্ট্রি না থাকার দরুন জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ জীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপেই ভারতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ভারতও চীনের সাথে ভুটান সীমান্ত সুরক্ষার বিনিময়ে কর ছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিস পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে।

পরের দিনের গন্তব্য পুনাখা। পাহাড়ি পথ গিয়েছে ঘুরে ঘুরে অনেক উপরে প্রায় ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় দোচুলা পাস হয়ে। গাড়ির চালক বলল, মাস দুই আগেও বরফে ঢাকা ছিল দোচুলা। এককথায় মেঘের রাজত্বই বলা যেতে পারে। সঙ্গে রয়েছে ১০৮টি স্তুপা, স্থানীয় ভাষায় 'ড্রুক ওয়াংগিয়াল চোরতেন'..... রাজমাতা আশি দোরজী ওয়াংগমো ওয়াংগচুক তৈরি করেছিলেন পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে। হাজার চেষ্টা করেও ভুটানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি দেখা দিল না, ঘন মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েই রইল। অগত্যা গুটি গুটি নেমে এলাম খানিকটা নিচে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। আহা মনখানা ভরে গেল। রংবেরংয়ের ফুল, সদ্য লাগানো রডোডেনড্রনের বিভিন্ন প্রজাতির চারা, পক্ষীকুলের বিচিত্র অর্কেস্ট্রা, মাঝবরাবর সবুজ জলের ঝিলের পাহাড়ি অবস্থান, চারপাশে ঘন সবুজের সমারোহ, নীল পাহাড়ের হাতছানি..... নাহ, এসব ছেড়ে আবার ফিরে কী তাহলে যেতে হবে সেই গতানুগতিক শহুরে যাপনে!

বেরিয়ে এলাম বাগান থেকে গাড়ির চালক বিকাশের তাড়নায়। অনেক নিচে প্রায় মো চু নদীর তীরে একটি নেপালি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সেরে চললাম পুনাখা জং এর উদ্দেশে। কাছে আসতেই দেখি এক অভাবনীয় দৃশ্য। দুই পাশ দিয়ে বয়ে চলা ফো চু ও মো চু নদীর সংগম স্থলে এই পুনাখা জং...... সম্মুখ ভাগে পার্পেল রংয়ের অস্ট্রেলিয়ান জ্যাকারান্ডা ফুলে ভরা গাছ দিয়ে অলংকৃত করা, প্রকৃতি যেন অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে এই বিশেষ দুর্গটিকে। ভিতরে প্রবেশের টিকিট কেটে কাঠের একখানা চওড়া ব্রিজ পেরিয়ে সম্পূর্ণ খাড়া সিঁড়ি বেয়ে অনেকটা উপরে উঠে তবেই জং-এ প্রবেশ করা যায়। উপরে প্রচুর মৌমাছির চাকের সহাবস্থান, স্থানীয় ভাষায় সুখী স্থান.....। অধিকাংশেই এখন সরকারি অফিস। বাকিটা মনাস্ট্রি..... যার দুটি ভাগ রয়েছে। একটিতে রাজা রানীর বিবাহ স্থান, অপরটিতে গুরুর স্থান যেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ১৬৩৭-৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জংটি তৈরি হয়। তৈরি করেন শব্রুম বলে তিব্বত থেকে আগত একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। উনিই হলেন বৌদ্ধ বিশ্বকর্মা- জং-এর ভিতরে যাঁর মূর্তি মূর্তমান।

কথিত আছে, বর্তমান রাজা এনারই বংশোদ্ভূত। আর রয়েছে অপূর্ব কারুকার্য, কাঠের তৈরি.... ওপরে সোনার জলে রাঙানো.... বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্যদের ক্ষমাসুন্দর মূর্তি, আর প্রতিটা খালি দেওয়ালে রয়েছে জাতকের গল্পের ছবিরূপ। ভিতরে প্রবেশের পর ছবি তোলা নিষেধ। তবুও বাইরে থেকে যতটা ছবি তোলা গেল, তাতেই সন্তুষ্ট রইলাম। নিচে নেমে এসে জ্যাকারান্ডা ফুলের বিছানো লনের মাধুর্য, ফো চু নদীর অববাহিকায় নানা বর্ণের বোগেনভিলিয়ার ঝুলন্ত রূপ মন কেড়ে

নিল নিমেষেই। অতএব ফটোসেশন, একটি অল্পবয়সী ভুটানি দম্পতির ফটোসেশন ছিল দেখার মতো। লোভ সামলাতে পারলাম না, চুরি করে খানিক দেখেই ফেললাম।

এর পর চললাম সাসপেনশন ব্রিজ বা ঝুলন্ত সেতু, ফো চু- মো চু নদীর ঠিক ওপরে। নদীর এপাড় ওপাড় ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া আর আসা, ফিরে এসে ইয়াব্বড় বড় শসা নুন মরিচ দিয়ে চিবোতে চিবোতে মেঠো পাহাড়ি পথ ধরে, ফিরে আসা। দারুণ থ্রিলিং। তখনো জানতাম না, কি সাংঘাতিক ধরনের থ্রিল অপেক্ষা করে আছে এ জীবনে! সে কথায় পরে আসছি, আপাতত তো হোটেলে ফিরি! যা ধকল গেল সারাটা দিন, এখন এক কাপ গরমা গরম কফি না হলেই যে নয়।

সন্ধ্যের মুখে পুনাখার হোটেলে ঢুকতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন মহিলা ম্যানেজার, পরনে অপূর্ব কিরা অর্থাৎ সাধারণ করে বেড় দিয়ে পরা স্কার্ট ও বুকের ওপর জ্বলজ্বলে পাথরখচিত ব্রোচ বসানো ফুলহাতা টপ, মিষ্টি করে হেসে আমাদের ৪০৪ নং ঘরের চাবিটি দিলেন, আর লাগেজ নিয়ে যাবার জন্য সঙ্গে একটি মেয়ে। লক্ষ্য করলাম হোটেলটিতে বেশির ভাগ কাজই মেয়েরা করছে, ঘরে ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে এল। পর্দা সরাতেই কাঁচের বিশাল জানালার ওপার থেকে ফোচু মোচু নদীর মিলিত ধারা করমর্দনের জন্য প্রস্তুত। তার ওপারে পাহাড়, পাইন বনাকীর্ণ.... দূরে মিটমিট করে জ্বলছে পাহাড়ি গ্রামগুলির আলো, এঁকে বেঁকে চলা গাড়ির রাস্তা...... মোহ সৃষ্টি করল এক মায়াবী আলোয়। খাওয়া দাওয়ার পরে নরম বিছানায় এলিয়ে পড়তেই ঘুমের রাজ্যে। পরদিন আর দেরি করা যাবেনা। প্রায় ১৩০ কিমি দূরের পারো শহরে পৌঁছাতে হবে আমাদের। তাই চটপটান স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কানে ভেসে রইল ভোরবেলার পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ, সামনেই নদীর ওপাড়ে একটি ছোট্ট গুম্ফা থেকে স্রোতের মতো ভেসে আসা সেই মন্ত্রে মনটা যেন উদাস হয়ে যায়!

এদেশের কিছু ক্ষেত্রে অদ্ভুত শৃঙ্খলা লক্ষ্যযোগ্য। তা হল পোষাকের ক্ষেত্র বিশেষ। প্রতিটি মেয়ের পরনে যেমন কিরা, ঠিক তেমনই প্রায় প্রতিটি ছেলের পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের স্কার্ট জাতীয় বক্কু। প্রায় প্রত্যেকেরই পায়ে লম্বা কালো মোজা ও জুতো। পোষাকে গাড়ির ড্রাইভার থেকে রাজা বা সাধারণ সেলস গার্ল থেকে রানী পর্যন্ত কারোরই কোন কমপ্লেক্স নেই। সবার পরনে প্রায় একই রকম পোষাক। আর প্রায় প্রতিটা বাড়িরই মোটামুটি একই রকম স্থাপত্য শৈলী। আর মজার কথা হল এইই যে একই রকমের লুম ব্যবহৃত হয় বিছানার চাদরে ও পর্দার কাপড়ে, ঠিক মেয়েদের কিরা বা স্কার্টের কাপড়ের মতো এই ডিসিপ্লিন! আমার নিজের দেশ ভারত এ এটা কখনো ভাবা যায়? যাওয়ার পথে রাস্তার ধারে ধারে ফলের বাজার কচিৎ কদাচিৎ চোখে পড়ে। হাত দেওয়া দুরূহ, আগুন দাম, একটি ছোট্ট আপেল মোটামুটি ৫০ টাকা। থিম্পুতে দেখেছিলাম বিশাল বিশাল বিভিন্ন গাড়ির শো রুম, আর এছাড়া কোন ইন্ডাস্ট্রি চোখে পড়েনি।

তবে জাপানের টয়োটার ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। মিনি বাসের সাবস্টিটিউট কোস্টার আর হাইস বাসগুলি ট্যুরিস্ট নিয়ে ছুটে চলেছে সারাদিন এদিক সেদিক।

বাঙালি ট্যুরিস্ট এর সংখ্যা লক্ষ্যণীয়ভাবে কম, তুলনায় গুজরাট, মুম্বাই ও চেন্নাই বা হায়দ্রাবাদ এর অনেক মানুষ দেখলাম। ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি সহজাত। প্রয়োজনে নেপালি বা ভুটানি ভাষা চলছে।

পরদিন দুপুরের মধ্যেই পারো পৌঁছে গেলাম। অদ্ভুত পার্থক্য ভুটানের পশ্চিম ও পূর্বের পাহাড়ের। পারোর অন্তর্দেশে যতই প্রবেশ করছি, ততই যেন ন্যাড়া পাহাড়ের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে জানান দিচ্ছে। একটি ব্রিজের পর থেকেই আমাদের সর্বক্ষণের সংগী পারো চু নদী সুন্দরি ললনার মতো নাচতে নাচতে চলেছে। যেন কত্তদিন পরে ঘরে ফিরছে তার মনের মানুষ। ওদের ভাষায় চু হল নদী আর লা হল পাস বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বানানো রাস্তা। পারো শহরটি একটি উপত্যকায় অবস্থিত। শহরের উপকণ্ঠে একটি বেশ উঁচু স্থানের ভিউ পয়েন্ট থেকে অপূর্ব লাগে...।

ড্রাইভার বিকাশ সাড়ে আট কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে বেস ক্যাম্প পৌঁছে দিল। পুরো রাস্তাটিই পারো নদীর ধার ঘেঁষে ধান জমি, ধাপ চাষ ও আলু লংকা ক্ষেতের পাশ দিয়ে। এমন সুন্দর নীল আকাশ কদিন যে দেখিনি।

ভুটানের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও তার রানওয়ে, পারো জং, মিউজিয়াম, পারো চু নদীর অববাহিকা ও বেশ খানিক নিচে অবস্থিত ছবির মতো শহরটি। লাঞ্চের পরে যাওয়া হল মিউজিয়ামে। ভিতরে প্রবেশের পর অনেক অজানা তথ্যই জানা হয়ে গেল। জানা গেল প্রচুর প্রজাতির পাখি ও জন্তু জানোয়ারের কথা। জাতীয় প্রাণী টাকিনের কথাও শুনলাম। যদিও থিম্পু জু তে আগেই দেখা দিয়েছেন বাবাজীবন। শুনলাম ফুবজিগা ভ্যালির কথা, যেখানে প্রতিবছর অক্টোবর থেকে দেখা দেয় বিরল প্রজাতির মাইগ্রেটরি হোয়াইট বেলিড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হেরন বার্ড।

আছে আরো অনেক গ্লেসিয়ার.... মাউন্টেন পাস... ট্রেকিং রুট... সর্বসাধারণের জন্য যা সারাবছরই বন্ধ থাকে। তাইই বোধ হয় ভুটান এত দূষণহীন একটি দেশ, যেখানে গাছগাছালির আধিক্যের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম। পরিষ্কার বাতাবরণ, অক্সিজেনে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভরে নাও, প্রাণভরে যত পারো। একধারে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের মুখোশ..... যা কিনা জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে যাপনের অঙ্গ, একটি ঘরে বিরাট টিভি স্ক্রিনে বিভিন্ন মুখোশ পরে নানান নাচের মাধ্যমে ভুটানি দিনযাপনের অংশবিশেষ দেখানো হচ্ছিল। কাজেই তাদের কলিজার টুকরো এই মুখোশগুলির দাম অস্বাভাবিক বেশি হওয়াটাই তো বাঞ্ছনীয়। পুরুলিয়ায় আদিবাসী ছৌ এর কথাই ধরা যাক না! এখানেও সেই একই মুখোশ শিল্পের কথাই উঠে আসছে, তাই না!

মিউজিয়াম থেকে এবার গেলাম পারো জং দেখতে। সেই একই কনসেপ্ট, পুনাখা জং এর মতো। পারো চু নদীর ধারে কাঠের সেতু পেরিয়ে পেছন দিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ। ভীষণ সুন্দর একটি উদ্যান আছে ভিতরে, গাছগাছালি ও পাখপাখালির সংসার। খানিক ঘুরে বেড়িয়ে হোটেলে ফেরার পালা। ঝকঝকে তকতকে রাস্তা ঘাট, ইলেকশন পোস্টার লাগানোর জন্য রাস্তার প্রধান চকে মোড়ের মাথায় একটিই মাত্র বোর্ড, যত্রতত্র দেয়াল লিখন এদেশে বুঝি ভাবাই যায় না। হোটেলে ফিরতেই মন ফুরফুরে হয়ে গেল..... প্রশস্ত জানালার ওই পারেই কলকল করে বয়ে চলেছে পারো চু...... বাম দিকের কাঁচের জানালা দিয়ে চোখ পড়ে দিগন্ত বিস্তৃত ঢেউ খেলানো নানা আকারের পাহাড়, আলু আর লংকার ক্ষেত। পারো চু থেকে বিভিন্ন দিকে বইয়ে দেওয়া কাটা খাল জমিতে জমিতে চাষের জন্য জল সরবরাহ করছে। ডিনার করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি, কারণ আগামীকাল আমাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন, যাব টাইগার মনাস্ট্রি। সম্পূর্ণ পায়ে হেঁটে, উঁচুনিচু পাহাড়ি পথে, ১০,২৪০ ফুট উচ্চতায়।

এসে গেল সেই বহু অপেক্ষার ক্ষণ। যার হাত ধরে আমরা চলেছি এক ইতিহাসের সাক্ষী হতে। উত্তেজনার বশে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যায়। মনের মধ্যে অজানা আশঙ্কা.... পারব তো? এই পবিত্র স্থান দর্শন করতে এদেশে আসা। সে আশা পূরণ হবে তো? উচ্চতা জনিত শ্বাসকষ্টে অনেককেই মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়। কেউ কেউ আবার পারো ভ্যালি থেকে সাড়ে আট কিলোমিটার গাড়িতে বেস ক্যাম্প অবধি গিয়ে নিচের থেকেই ঊর্ধ্ব মুখে দূর পাহাড়স্থিত মনাস্ট্রীর এক ইঙ্গিত দেখা যায় এমন দেব দর্শন করেই ফিরে আসেন।

যাহোক, সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট সেরে ব্যাকপ্যাকে জলের বোতল, রাস্তায় খাবার জন্য সামান্য স্যান্ডউইচ, টুপি, জ্যাকেট ভরে নিয়ে প্রস্তুত হই। এইবার বেরোনোর পালা। পারোর ন্যাবগীয়াল হোটেলের মালিক ও তার পরিবার হাসিমুখে আমাদের যাত্রার জন্য প্রভূত শুভেচ্ছা জানালেন। ড্রাইভার বিকাশ সাড়ে আট কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে বেস ক্যাম্প পৌঁছে দিল। পুরো রাস্তাটিই পারো নদীর ধার ঘেঁষে ধান জমি, ধাপ চাষ ও আলু লংকা ক্ষেতের পাশ দিয়ে। এমন সুন্দর নীল আকাশ কদিন যে দেখিনি।

আমরা শিল্পাঞ্চলের মানুষ, ঘোলাটে আকাশ দেখতে অভ্যস্ত, যা দেখছি চোখের সামনে.... এ যে স্বপ্ন নয়..... বাস্তব.... ভাবতেই ভাল হয়ে যাচ্ছে মন। আর মনের ভেতর থেকে টের পাচ্ছি এক অবশ্যম্ভাবী ডাক..... যা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে ইতিহাসের দিকে।

বেস ক্যাম্প পৌঁছেই ৫০০ টাকা মাথাপিছু টিকিট কাটা হল, হাতে নিয়ে হাঁটার জন্য নেওয়া হল শক্তপোক্ত লাঠি। তারপর উপরে ওঠার খানিকটা পথ ঘোড়ার পিঠে যাবার কথা ঠিক হল। সেইমতো ৭০০ টাকা করে দুটি তাগড়া ঘোড়া ও তাদের দেখভালের জন্য একটিই বাচ্চা ভুটানি ছেলে। শুরু হল যাত্রা। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উপরে উঠতে হবে, অথচ দূরত্ব মাত্র পাঁচ

কিলোমিটার। কাজে কাজেই প্রায় ৮০ ডিগ্রি গ্রেডিয়েন্সে পথ উঠে গেছে উপরে, সে প্রাণান্তকর চড়াই। চারপাশে তাকালে অপূর্ব গাছপালার সমাবেশ, রয়েছে সরু হয়ে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে যাওয়া কৌনিক পাতা সর্বস্ব হেমলক পাইনের বন, বাহারি রঙের রডোডেনড্রনের সমাহার, প্রচুর প্যারাসিটিক প্ল্যান্টস যেমন লাইকেন ও মিসেলটো, সবুজ গুল্মজাতীয় বুনো ঝোপ, আর অবশ্যই ব্রাউন ওক ও চীর পাইনের জঙ্গল।

কারোর সাথে কারোর কোন প্রতিযোগিতা নেই, প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে তার ভূমি, প্রাণভরে শ্বাস নাও আর দুচোখ ভরে দেখো। বহু নিচে খাদ পেরিয়ে পারো চু-র অববাহিকায় ভেসে উঠছে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম, সংগের ছেলেটির নিজের ঘর.....

প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সাজিয়েছে তার ভূমি, প্রাণভরে শ্বাস নাও আর দুচোখ ভরে দেখো। বহু নিচে খাদ পেরিয়ে পারো চু-র অববাহিকায় ভেসে উঠছে ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম, সংগের ছেলেটির নিজের ঘর.....

যেখানে ইন্ডিয়ান আর্মির সাথে একইসঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছে ভুটানি আর্মি, চায়না সীমান্ত রক্ষার্থে দুজনই অঙ্গীকারাবদ্ধ। দূর পাহাড়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেও এখনো দেবদর্শন হয়নি। অথচ আমাদের ঘোড়ার পিঠে যাত্রাপথ শেষ। বাহনেরা মাঝে মাঝে পথের ধারে সামান্য জলাধারে জল খাওয়া ছাড়া বেশি কিছু অনুভূতির প্রকাশ করেনি। খালি আমার কুচকুচে কালো ঘোড়াটি বারবার হেঁচে উঠে মানুষজন সম্বলিত ধুলোয় মাখা পথটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। যাহোক, মাঝবরাবর একটি ক্যাফেটেরিয়ার অবস্থান, আমাদের বাহনদের ছুটি দিতে হবে। এই হল যাত্রাপথের প্রথম ভিউ পয়েন্ট। এখান থেকেই পাহাড়ের একটি ক্লিফে অবস্থিত মনাস্ট্রীর দেখা পাওয়া গেল। রয়েছে এক গোলাকার স্থান। বুদ্ধিস্ট পতাকা বা চোরতেন, সারিবদ্ধ প্রেয়ার হুইলস, হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে খানিক ফটোসেশন করে, সামান্য সময় বিশ্রাম নিয়ে শুরু হল জঙ্গলপথে চড়াই ভাঙা।

হিসেব মতো অষ্টম শতাব্দী..... ৮১০ অউ তে হিমালয় অঞ্চলে শুরু হয় ধর্মীয় অস্থিরতা। অসাধু শক্তির প্রভাব ছেয়ে যেতে থাকে পাহাড়ের আকাশ। উত্তরদেশের বুমথাং উপত্যকা.... তৎকালীন সিন্ধুরাজা আমন্ত্রণ জানান বৌদ্ধধর্মের পবিত্র গুরু রিনপোচে-কে। কথিত আছে পদ্মফুলের ভিতর থেকে জন্ম হয়েছিল তাঁর...... পদ্মসম্ভব..... নামকরণ তাই যথার্থ ছিল। তিব্বতি খেনপাজং প্রদেশ থেকে আগমন ঘটল এই বৌদ্ধ গুরুর। চারপাশে তখন গভীর ষড়যন্ত্র। রাজাও অশুভ শক্তির প্রভাবে প্রায় কাবু হয়ে পড়লেন। চিন্তাধারা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুযায়ী, সম্যক প্রয়োজন

ঘটল ধ্যানযোগের। চিন্তান্বিত গুরু পদ্মসম্ভব একটি অতি হিংস্র বাঘিনীর পিঠে চেপে প্রায় উড়ে এলেন বুমথাং উপত্যকা থেকে বহুদূরে পাহাড়ের অন্তস্থলে পূর্বদেশের এক নির্জন গম্ভীর গুহায়। মন্ত্রপুত বাঘিনীটি ছিল ওনারই স্ত্রী 'ইয়েসে স্যোগিয়াল'।

অষ্টম শতাব্দীর কথা..... তিন বছর, তিন মাস, তিন সপ্তাহ, তিন দিন ধ্যানমগ্নতা.....

খ্রিষ্টীয় ১৬৯২ সাল। পাহাড়ের একটি খাঁজের ওপর সুচারু রূপে তৈরি হল চারটি বৌদ্ধ মন্দির। যার দুটিতে গুরু পদ্মসম্ভবের যথাক্রমে শান্ত সমাহিত রূপ এবং বাঘিনীর পিঠে ভয়ংকর রূপ প্রত্যক্ষ হয়। আর বাকি দুটিতে সন্ন্যাসীদের অবস্থান।

ভুটানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন গুরু পদ্মসম্ভব.... দ্বিতীয় বুদ্ধ বলে খ্যাতি লাভ করেন অচিরেই।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে অভীষ্ট মন্দিরের উদ্দেশে প্রাণান্তকর চড়াই ভেঙে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। বেলা যত গড়ায়, মাথার উপর সূর্যের কৃপা ততই বর্ষিত হতে থাকে। কখনো ছায়া ঢাকা জঙ্গুলে পথ, আবার কখনো একেবারে ন্যাড়া মাটি ভাঙা ধুলোময় পাথুরে চড়াই। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগোনো। জলের বোতলও নিঃশেষ প্রায়। দূর থেকে বিন্দুর মতো দেখা মনাস্ট্রি বড় হতে থাকে ক্রমশ। পথের সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দী করতে করতে এগিয়ে যাওয়া। খুব কষ্ট হলে সামনে ধীরগতিতে পথ চলা প্রৌঢ় দম্পতিকে দেখে মনোবল বাড়িয়ে নিচ্ছিলাম। দ্বিতীয় ভিউ পয়েন্টে পৌঁছানো গেল। যেখান থেকে মনাস্ট্রীর দৃশ্য অপূর্ব। বিশালাকার প্রায় আকাশ ছুঁতে চাওয়া ধর্মীয় প্রতীক স্বরূপ রঙিন পতাকার পাশে স্বল্প পরিসর পাথুরে ব্যালকনি। চারিদিকে ঢেউ খেলানো ধূসর হিমালয়, মন্দিরের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ....... গুম গুম ধ্বনি.... আধ্যাতিক মায়া কি একেই বলে!

১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে গুরুদেবের বিশালায়তন বিগ্রহ এই পাথুরে ব্যালকনিতে এসেই আটকে যায়। তৎক্ষণাৎ বহন করে নিয়ে যাবার মতো শক্তিশালী যখন কাউকে পাওয়া গেল না, তখন বিগ্রহের ঠোঁট নড়ে ওঠে.... এবং হিমালয়ের অন্দর থেকে পবিত্র বাণী বর্ষিত হয়....... সেই নির্দেশ বহনকারী ব্যক্তিই পারেন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে। মন্দিরের ভিতরে দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সেই কথা বলা মূর্তি বা স্পিকিং স্ট্যাচু। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস যে একাগ্রচিত্তে দৃষ্টিপাত করলে মূর্তির ঠোঁট এখনো নড়ে উঠতে দেখা যায়!

মনাস্ট্রির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে শুরু হল অনন্ত নিচে সাপের মতো এঁকে বেঁকে নেমে যাওয়া, অজস্র সিঁড়ির ধাপে ধাপে। বহু উপর থেকে নেমে আসছে গভীর এক ঝরর্না, তার ছিঁটে ফোঁটা আপনা থেকেই বর্ষিত হচ্ছে ভক্তদের মাথায়। এক সময় বহু নিচে অবতরণ শেষ হলে শুরু হল উপরে ওঠার অগুনতি পাথুরে সিঁড়ি। প্রায় নেশার মতো সিঁড়ি ভেঙে কোন যাদুবলে কখন যেন মন্দিরের সামনে রেজিস্ট্রেশন অফিসে পৌঁছে গেলাম, খেয়াল পড়ছিল না। ওখান থেকে লকারে সমস্ত জিনিসপত্র জমা রেখে সবুজ কিরা পরিহিতা সুন্দরী স্মার্ট গাইডের সাথে আরো খাড়াই পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে আলোআঁধারি রহস্যে ঘেরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। শান্ত সমাহিত গুরু

পদ্মসম্ভব ও তাঁর বিভিন্ন রূপ.... পরবর্তী প্রায় আট জন অবতার..... বুদ্ধ ধর্ম প্রচারে তাঁদের অবদান... এ সবই গাইড মেয়েটির মুখ থেকে মন্ত্রের মতো বর্ষিত হচ্ছিল। ২য় মন্দিরে স্পিকিং স্ট্যাচু ও তার পাশে নজরে এল সোনালি রংয়ের ছোট্ট একটি বন্ধ দরজা যা কিনা অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সুপ্রাচীন ধ্যান কক্ষে গিয়ে উন্মুক্ত হয়। যাকে বলা হয় টাক্টসাঙ পালফুগ বা টাইগার্স লেয়ার বা এককথায় টাইগার্স হাইড আউট। গাইডের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও উৎসাহী অনেকেই পিছনের দিক দিয়ে এই প্রায় অন্ধকার অসম্ভব পিচ্ছিল একেবারে খাড়াই নেমে যাওয়া ধ্যান গুহার ভিতরে প্রবেশ করে জীবন সার্থক করে এলেন। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ.... কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ভিতরে আছে দুটি অদ্ভুত নারী ও পুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি যা একাধারে সংশয় ও সমাধানের প্রতীক। আরো নিচে এক নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এক কালো পাথুরে গর্তের মধ্যে চোখ বন্ধ অবস্থায় নিজের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে মনের ইচ্ছে পূরণের থাম্ব গেম খেলা হল। অনেকেরই আঙুল স্পর্শিত হল, অনেকের আবার হলও না।

এইবার ফেরার পালা। বাইরে এসে জুতো পায়ে দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলাম।

এ যেন ভোলার নয়...... সারাজীবনের মতো এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এমন একটি স্থান, আশীর্বাদধন্য ঝর্নার জল, ঘিয়ের প্রদীপ, পবিত্র পাথর, দর্শনার্থীর যৎসামান্য ভিড়, ধ্যানমগ্ন প্রার্থনা মিশ্রিত ধর্মমনস্ক পরিবেশ।

ভুটানে এসে অনেক দাম দিয়ে পেলাম খাঁটি আবহাওয়া, একটি সংস্কৃতি যা কখনোই পাশ্চাত্য প্রভাবিত নয়, সুন্দর ছবির মতো প্রকৃতি, মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি, আধ্যাত্মিক গভীরতা, ভুটানি সমাজের আত্মার অন্তস্থল থেকে উঠে আসা এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ। কুর্নিশ রইল আমার।

পরদিন পাহাড় থেকে নেমে আসার পালা। তার আগেই একবার যেতে হবে ভুটানের হাইয়েস্ট মোটরেবল পয়েন্ট বা সাড়ে তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় চে-লা পাস। যদিও এর আগে লাদাখে আরো বেশি উচ্চতায় চাংলা, জোজিলা বা খারদুংলা পাস ঘোরার অভিজ্ঞতা হয়েছে... তবুও প্রতিটি জায়গাই যেন তার নিজ গুণে সমৃদ্ধ।

পুরো রাস্তাটাই পারো থেকে সোজা উঠে গেছে একেবারে সর্পিল হেয়ার পিন বেন্ড সহ। স্প্রুস আর লার্চের ঘন জঙ্গলের বুক চিরে পথ পেরোনো..... কচিৎ কদাচিৎ ইয়াকের দেখা পাওয়া.... রডোডেনড্রনও মেলে ধরে বাহারি শোভায়। গাড়ি যখন অনেকটা উপরে..... হঠাৎই নজরে এল পাহাড়ের সবুজ ঢালে নতুন করে লাগানো রংবেরংয়ের চোরতেন, হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে, এক জায়গায় কাঠ জ্বালিয়ে কিছু হোম যজ্ঞের আয়োজন, প্রথা অনুযায়ী লাউ বলি দেওয়া আছে, মনে পড়ে গেল এখানে তো প্রাণী হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ। কাছে যেতেই দেখলাম, লামা সহ কিছু সাধারণ মানুষ জপে তপে মগ্ন। চকিতে মনে পড়ে গেল আজ যে বুদ্ধ পূর্ণিমা, এনারা এসেছেন থিম্পু থেকে কিছু মানত পূরণ করতে।

এই আয়োজন পিছনে ফেলে আবার সামনে এগোনো। বাঁক ঘুরতে বড় গাছের ঘন সবুজ অঞ্চল প্রায় শেষ। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত ন্যাড়া পাহাড়, গুল্মজাতীয় সবুজ ঘাসে ছাওয়া। হঠাৎ চোখের সামনে ডানদিকে এক অপার্থিব জগৎ.... ভুটান হিমালয়ের পবিত্র শৃঙ্গ, মাউন্ট জমলহারিয়া কিনা ব্রাইড অফ কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে খ্যাত... এবং বর্ডারে তিব্বত, চীন এবং ভুটানের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করেছে। আর একই লাইনে রয়েছে জিচু ড্রেক ও জানা অজানা অজস্র শৃঙ্গ। কখনো হালকা প্রকাশিত, কখনো মেঘের আড়ালে ব্রীড়াবনত।

অসম্ভব জোরে বাতাস, সমস্ত জায়গাটা জুড়ে। তারই মধ্যে নিচে স্পষ্ট দেখা যায় ভুটানের শেষ সিভিলিয়ান পয়েন্ট "হা ভ্যালি", সেখানে রয়েছে আর্মি চেক পোস্ট এবং অবশ্যই একটি মিলিটারি ক্যান্টিন, যেখানে প্রায় সুলভ মূল্যে নানা দ্রব্যের সন্ধানে যাচ্ছে বাঙালি ট্যুরিস্ট।

বাঁ দিকে চোখ পড়তেই চীনের সুউচ্চ ডোকলাম বর্ডার। সারাবছরই তুষারে মোড়া ধ্যানমগ্ন পর্বত শ্রেণি যা কিনা ব্রীড়ায় আচ্ছন্ন নয়, বরং কিছুটা উদ্ধতই মনে হল।

বেড়ানো শেষ। আলিপুরদুয়ার ফেরার পালা। পথে পড়ল চিরকালীন ফগে ঢাকা দিনের বেলায় আলো-আঁধারি ঘেরা গেদু জনপদ, যেখানে দুপুর দুটোয় প্রকৃতির ভুলের নেশায় ভোরবেলার পাখির ডাকও শোনা যায়। সময় ঠাহর হয় না ঠিক। একে একে পেরিয়ে গেলাম চুখা ড্যাম, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ঝরনার উচ্ছলতা, চাষাবাদের পরিবর্তনশীল রূপ, উচ্চতায় মাপা খাড়াই পাহাড়ের মাঝটুকু রেখে রাস্তা, খাড়বন্দি গোম্ফা, রিনচেন দিং চেক পোস্ট। নজরে এল ফুন্টশোলিংয়ের ঘরবাড়ি ও ভুটান গেট।

ঘড়ির কাঁটা প্রায় সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই, দুপাশে চা বাগান, হাসিমারা, মাদারিহাট, জলদাপাড়া মোড়, ডানপাশে চিলেপোতার জঙ্গল, আরেকটু এগিয়ে বাঁদিক বরাবর জয়ন্তী ও বক্সার ঘন শাল, চম্পা, শিমূল ও গামহারের জঙ্গল। দুয়ারের সামনেই ডুয়ার্সের মায়াবী বন।

গাড়ি ছুটে চলেছে আমাদের নিয়ে। ন্যাশনাল হাইওয়ের এলিফ্যান্ট করিডোর দিয়ে, তিস্তা ও তোর্সাকে পিছনে, সামনে আমাদের বাড়ি আর বেশি দূরে নয়!

এক সুন্দরবন, দুই ভ্রমণ

আকতারুল আলম বাবলু

সময়টা ২০১৯ সালের নভেম্বর। আমি একটি ব্যাংকের খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধান। আমাদের কুষ্টিয়া শাখা প্রধান মনজুরুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা শাখা প্রধান মনিরুজ্জামান ও তাঁদের দল যৌথভাবে সুন্দরবন ভ্রমণের কর্মসূচি ঠিক করেছিল। কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা শাখার সকল কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের সাথে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ভ্রমণসঙ্গী। ভ্রমণের মেয়াদ তিন দিন, ভ্রমণের বাহন এম.ভি উৎসব নামের সদ্যনির্মিত জাহাজ—যার এটিই ছিল প্রথম যাত্রা।

যাত্রার আগে আমি সপরিবারে ভুটান ভ্রমণে ছিলাম। পরিকল্পনা এতটাই টাইট ছিল যে আমাকে ভোররাতে ভুটান থেকে ফিরেই ওদের সাথী হতে হবে। সেই এক দেশ থেকে আরেক দেশের ওপর দিয়ে অতটা পথ পাড়ি দিয়ে নির্ধারিত সময়ে সফরসঙ্গী হওয়া কতটা কঠিন তা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। তারপরও যে পেরেছিলাম এটাই বাস্তবতা।

যাহোক ভুটান থেকে ফিরে কীভাবে ওদের সাথী হতে পেরেছিলাম সে এক পৃথক গল্প।

ভোররাতে যশোর বাড়িতে পৌঁছে কোনোমতে ব্যাগের কিছু কাপড়চোপড় নামিয়ে নতুন করে কিছু যোগ করে নিলাম। তাড়াহুড়ো করে বাড়ির সামনে অপেক্ষমাণ বাসে চড়ে বসলাম। শুরু হলো আমাদের সুন্দরবন যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। প্রথমে খুলনা পর্যন্ত বাসে গিয়ে সেখানে অপেক্ষমাণ জাহাজে উঠতে হবে।

দেশের বাইরে থাকায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। দেশে ফিরে এসব খবর নেবার আগেই যাত্রা শুরু করায় তখনও কিছু জানতে পারিনি। যাহোক যথারীতি খুলনা পৌঁছে আমাদের অপেক্ষায় থাকা এম.ভি উৎসবে সওয়ার হলাম। সবাই সদ্যনির্মিত ঝকঝকে জাহাজ দেখে খুব খুশি মনে জাহাজে আরোহণ করল। তিন তলা বিশিষ্ট জাহাজে আগেই নির্দিষ্ট করে রাখা যার যার কেবিনে চেক-ইনের পর জাহাজ সুন্দরবনের উদ্দেশে খুলনার ঘাট ছাড়ল ভেঁপু বাজিয়ে।

সবাই ইতোমধ্যে ফ্রেশ হয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করল এবং একসময় ডাইনিং টেবিলে হাজির হলো সকালের বিলম্বিত নাস্তার জন্য। সবাই জানেন জলযানে কেন জানি খাবারদাবার অসামান্য স্বাদের হয়—সে যে কোনো খাবার হোক না কেন। মজার নাস্তা সারার পর যার যার মতো ঘোরাঘুরি শুরু হলো লঞ্চের বিভিন্ন তলায়। আমাদের যাত্রার সময় আকাশে দেখলাম মেঘের উড়াউড়ি। পরে জেনেছিলাম যাত্রার আধ ঘণ্টা পর থেকে বৈরী আবহাওয়ার কারণে আর কোনো জলযানকে খুলনা ত্যাগের অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। বিশেষ ভাগ্যের কারণে আমরা খুলনা ত্যাগ করে যাত্রা শুরু করতে পেরেছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা শেষ করতে পারিনি।

যাত্রার শুরুতে যে সামান্য মেঘের উড়াউড়ি ছিল তা দেখে তেমন কোনো আশঙ্কা জাগেনি। যদিও পরে জেনেছিলাম আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আগেই সতর্কবার্তা ছিল যা আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে। দুপুর বারোটার পর থেকে ঝকঝকে আকাশ আস্তে আস্তে কালো হতে শুরু করল, সাথে দমকা বাতাসের সাথে বৃষ্টি। লঞ্চে বৃষ্টি দেখে অনেকেই আরও আনন্দিত হলো। যদিও সে আনন্দ শেষ পর্যন্ত নিরানন্দে পরিণত হয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যেই খুশিমনে মধ্যাহ্নভোজ সারা হলো। এরপর আকাশ একদম কালো হয়ে গেল, সাথে দমকা হাওয়া, বৃষ্টির তোড় বাড়তে থাকল। এর মধ্যেও লঞ্চ চলতে থাকল, সন্ধ্যা নাগাদ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ইতোমধ্যে জোর বৃষ্টির কারণে এবং আকাশের অবস্থা দেখে সবার মুখের হাসি আস্তে আস্তে কমতে থাকল। আমরা সুন্দরবনের যে এলাকায় ছিলাম তখনও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ছিল। যত ফোন পাচ্ছিলাম সবার এক কথা—দ্রুত যেন আমরা ফিরে যাই। আমাদের লঞ্চ এমন একটা জায়গায় নোঙর করা ছিল যে প্রায় তিন দিকে সুন্দরবনের গাছগাছালি, ফলে ঝড়ের তাণ্ডব অতটা মালুম হচ্ছিল না। কিন্তু বৃষ্টির ঝাঁজ টের পাওয়া যাচ্ছিল পুরোটাই। আমরা তখন বুঝতে পারছিলাম

বৈরী আবহাওয়ার ফাঁদে পড়ে গিয়েছি। অজ্ঞতার কারণে আমরা জানতাম না যে ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে।

অবস্থাদৃষ্টে এবং বারংবার শহর থেকে পাওয়া অনুরোধে মনে হলো আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু কীভাবে? ফিরতে হবে তো সেই পশুর নদী পার হয়ে, যা প্রায় অসম্ভব। লঞ্চ যেখানে নোঙর করা হয়েছে সেখানে বরং আমরা নিরাপদে আছি।

যাহোক একসময় সবার অনুরোধে লঞ্চের লোকদের ফিরে যাবার কথা বললাম। ওরা রাজি না হয়ে বিভিন্ন যুক্তি দেখাচ্ছিল। নতুন লঞ্চটির এটাই ছিল প্রথম যাত্রা এবং তারা তিন দিনের ট্যুরের জন্য বড় অঙ্কের অর্থ অগ্রিম নিয়ে রেখেছিল। ট্যুর শেষ না করে ফিরে গেলে টাকা ফেরত দিতে হয়, আবার প্রথম ট্যুর অসমাপ্ত থাকলে রেকর্ড খারাপ হয়ে যায় সেজন্য তারা না ফেরার জন্য গড়িমসি করতে থাকল। তারা আমাদের বরং নিরাপদ এই আশ্রয়ে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল।

দলে নারী, শিশু, ছেলে-বুড়োসহ আমরা ৫২ জন। পদমর্যাদায় সবার উপরে হওয়ায় আমিই দলনেতা। ইতোমধ্যে রাতের খাবার শেষ হলো। সবার মনেই আস্তে আস্তে আতঙ্ক ভর করতে শুরু করল। সবাই আমাকে ফিরে যাবার অনুরোধ করা শুরু করল। বুঝলাম দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হবে।

অবশেষে রাত এগারোটার দিকে ডাইনিং রুমে লঞ্চের লোকদের সহ আমরা বৈঠকে বসলাম। আমি কোনো বিতর্ক শুরুর আগেই সাফ জানিয়ে দিলাম, কোনো কথা শুনতে চাই না, লঞ্চ ফেরানোর ব্যবস্থা করতে। লঞ্চের লোকেরা আমার কঠোর অবস্থান দেখে আর কিছু বলতে সাহস পেল না, কিছুটা গাইগুই করে শেষ পর্যন্ত ফেরার জন্য লঞ্চ ঘোরানো শুরু করল। শুরু হলো ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ ফেরার যাত্রা।

লঞ্চে দুই ধরনের লোক ছিল; এক শ্রেণির যারা জানত না এ যাত্রায় কী ঝুঁকি আছে—যেমন আমার পরিবারের সদস্যরা যারা দিব্যি কেবিনে ঘুমিয়ে রাত কাবার করে দিলেন। আরেক দল যারা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতেন তারা ভয়ে একদম চুপ হয়ে গেলেন।

আমি কেবিনে সারারাত ঘুমিয়ে সকালে ফজরের নামাজের জন্য উঠে দেখি লঞ্চ বেশিরভাগ বিপজ্জনক এলাকা পেরিয়ে পশুর নদীর শেষের দিকে খুলনা শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আমি অনেকটা নীরবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ইতোমধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব অনেকটা কমলেও অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সকাল সাতটায় যখন খুলনার জেলখানা ঘাটে পৌঁছালাম তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। রীতি অনুযায়ী লঞ্চ কর্তৃপক্ষ সকালে ভুনা খিচুড়ি, হাঁসের

মাংস, বেগুন ভাজি, ডিম ভাজি দিয়ে নাস্তার পর লঞ্চ থেকে নামার সুযোগ করে দিল।

লঞ্চ থেকে নেমে ঘাটে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠতে উঠতে সবাই ভিজে একশা। দুপুর বারোটার দিকে যশোরের বাড়িতে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন; সবাই মহান আল্লাহ পাকের নিকট শুকরিয়া আদায় করলাম নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারায়।

সুন্দরবনে লঞ্চে থাকা অবস্থায়ও বুঝতে পারিনি ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডব কী ছিল? সাধারণত ঝড়ের সময় ঘরে থেকেই ঝড়ের তাণ্ডব দেখে এসেছি এতদিন। এবার খোলা আকাশের নিচে তাও আবার সুন্দরবনের অভ্যন্তরে থেকেও বুঝতে না পারার প্রধান কারণ ছিল ঘূর্ণিঝড় বুলবুলকে প্রতিহত করেছিল এই সুন্দরবন, আমরা ছিলাম সুন্দরবনের অভ্যন্তরে। বাড়ি ফেরার পর মিডিয়ার কল্যাণে বুলবুলের তাণ্ডব সম্পর্কে জানতে পারলাম। এ পর্যন্ত সংঘটিত অন্যতম ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ছিল বুলবুল। সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও সুন্দরবনই রক্ষা করেছিল দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে। সুন্দরবনের সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অনেক অনেক দিন সময় লাগবে।

তিন দিনের ভ্রমণ একদিনে শেষ হবার পর অগ্রিম নেওয়া অর্থ লঞ্চ কর্তৃপক্ষ ফেরত দিতে চাইল না। তারা প্রস্তাব করল পরে যেকোনো সময় দুদিনের একটা ট্যুরে অর্থ সমন্বয় করার। এরপর করোনার কারণে পরবর্তী দু-বছর ট্যুর করা গেল না। আবার সেই এম.ভি উৎসব লঞ্চ যোগে ২০২২ সালে দুই দিনের একটা সুন্দরবন ভ্রমণ করা হলো। ততদিনে অনেক সহযাত্রী পরিবর্তন হয়েছে; সবচেয়ে বেশি সেই ঝকঝকে লঞ্চটি ততদিনে রং চটে অনেকটা বিগতযৌবনা। তবুও অসমাপ্ত ভ্রমণ সমাপ্ত করার আনন্দ কী আর তাতে কমে?

গ্রান্ড ক্যানিয়ন ও অন্যান্য

আহসান নবাব

গ্রান্ড ক্যানিয়ন, আমেরিকা বা পৃথিবীর এক অবাক ভুতাত্বিক বিস্ময়। ২০১৪ সালে প্রথম যখন আমেরিকা আসি তখন থেকেই এটা দেখার তীব্র ইচ্ছে ছিল। এবার যখন ৪র্থ বারে আমেরিকা এলাম তখন ছেলে চমকই বললো, আব্বু চলো যাই গ্রান্ড ক্যানিয়নে। শরীর-মন দুটোই ঝংকার দিয়ে উঠলো। প্ল্যান মোতাবেক আমরা (চমক, বহ্নি, বর্ণমালা আর পরশমনি) লসএন্জেলস থেকে নেভাদার বিখ্যাত মোহাবে মরুভূমির (Mojave Desert) মাঝ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে প্রথমে গেলাম যুক্তরাষ্ট্রের আনন্দ নগরী লাসভেগাস।

ওখানে টেক্সাস থেকে আকাশ পথে উড়ে এলো মেয়ে চারু। সেখানে রাত যাপন করে সকাল সকাল গন্তব্যে রওনা দিবো এটা ঠিক করা ছিলো। লাসভেগাসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ঘন সন্ধ্যা । জুয়া, ম্যাজিক, সার্কাস, যৌনতা, পপ সংগীতের শহর নামে খ্যাত রাতের লাসভেগাস শহরটি হেঁটে হেঁটে ভালো করে দেখে নিলাম। লাসভেগাস শহরের একদম কেন্দ্রে বালাজিও হোটেলের সামনে বিশাল বালাজিও পানির ফোয়ারার আইকনিক দৃশ্য দেখে মন ভরে গেল। ভিন্ন মাত্রার সব শব্দের তালে তালে ফোয়ারার কারুকাজ এ বিশ্বে বোধ হয় দ্বিতীয়টি আর নেই। উচ্ছল আবেদনময়ী লাসভেগাসকে বলা হয় "নাইট টাউন"। রাতেই জেগে ওঠে এই শহর। পৃথিবীর আলো ঝলমল শহর বলতেই- লাসভেগাস। কতশত, লক্ষ-কোটি যুবকের মনের গহীনে লালিত হয়ে থাকে এই শহরের নাম..।

সকালে আবার বের হয়ে সকালের লাসভেগাসকে দেখলাম। এবারে শহরটি রোদের আলোয় পরিপূর্ণ, বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ। রাতে যে ভীষণ হটোপুটি হয়েছে মহানগর জুড়ে! এড়িয়ে যাবো না, রাতে বিশাল বেলাজিও হোটেলের ক্যাসিনো আসরটাও দু'দন্ড দেখে নিয়েছি।

সকাল সকাল শুরু হলো যাত্রা। নেভাদা স্টেট পার হতেই এক সময় স্টিলে লেখা বোর্ডে স্বাগত জানালো অ্যারিজোনা স্টেট। আবার শুরু হলো বিশাল মরুপ্রান্তর আর ছোট বড় অজস্র পাহাড়ের দিগন্ত। দুপুর পৌনে তিনটায় পৌঁছুলাম দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গেটে। এখানে ৩৫ ডলার প্রবেশ ফি দিয়ে ঢুকতে হয়। ঐ সময় আমেরিকায় ফেডারেল সরকারের কর্মীদের শাটডাউন আন্দোলন চলছিল বলে এন্ট্রি ফি লাগলো না।

ঢোকার পথেই ওরা একটা বড়সড় ট্যুর প্লানের লিফলেট দিয়ে দিল। সহসাই দেখলাম সবুজ পাইনের বনের মধ্যে মুক্ত, পোষা নয় এমন দুই/তিন জাতের প্রচুর হরিণ খুব কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই সেই মহাবিস্ময় --গ্রান্ড ক্যানিয়ন। কি বিচিত্র তার ধরণ, তা প্রকাশ করা বা লিখে বলার নয়! অ্যারিজোয়ানা রাজ্যের উত্তর -পশ্চিম দিকে কলোরাডো নদীর পাশ ঘেঁসে ২৭৮ মাইল লম্বা আর ১৮ মাইল চওড়া এলাকা জুড়ে নানা বিচিত্র বর্ণের শিলায় গঠিত এই গিরিখাত। গিরিখাতটি এক মাইলেরও বেশি গভীর। দুই মিলিয়ন বছরের বেশি সময় ধরে এটি তার ভুতাত্বিক ইতিহাস বহন করে চলেছে। ইতিহাস মতে, চার হাজার বছর ধরে এখানে নানা উপজাতির মানুষ বসবাস করে গেছে। তাই এটি পরিচিত "পূর্ব পুরুষের বসতভিটা" হিসেবে। ৫ থেকে ৬ মিলিয়ন বছর আগে কলোরাডো নদীর উচ্চমাত্রার ভূমিক্ষয়, নদীটির সন্নিহিত মালভুমিতে ঘটে যাওয়া প্রচন্ডতর টেকটোনিক্যাল শক্তির প্রভাব, আগ্নেয়গিরি আর সাথে আগ্নেয়গিরির ছাই এবং প্রচন্ড ভূমিধ্বস এই বিচিত্র বর্ণচ্ছটার শিলার গিরিখাত গঠন করেছে। ১৭০০-র বেশি বৃক্ষ প্রজাতি আর ১০০-র বেশি পাখি এবং অজস্র প্রজাতির জীব-বৈচিত্র্য সম্ভারে সাজানো এই বিস্ময় গিরিখাত। পৃথিবীর সপ্তম প্রাকৃতিক আইকনিক এই বিস্ময় দেখা যেমন পর্যটকদের কাছে তেমন পৃথিবীর সকল জিওলজিস্টদের কাছে সৌভাগ্যের বিষয়।

গ্রান্ড ক্যানিয়ন দেখার অনেকগুলো প্রাইম স্পট আছে। মেথার পয়েন্ট, হোপি পয়েন্ট, ইয়াভাপাই পয়েন্ট, ডেজার্ট ভিউ ওয়াচ টাওয়ার ইত্যাদি। অধিকাংশ পর্যটক সাধারণত চার/ পাঁচ মাইলের মধ্যের গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের সৌন্দর্য্যই দেখে। আমার সাধ মেটে না, আমি ৮০/৮৫ মাইলের লম্বা পথ ধরে এই অবাক বিস্ময় দেখি। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকায় রয়েছে একাধিক খাবার হোটেল, রেস্তোঁরা এবং দৃষ্টিনন্দন হোটেল-মোটেল। কিছু রেস্টুরেন্টে হালাল খাবারের ব্যবস্থা আছে।

একসময় এটি দেখা শেষে রাতে থাকতে যাই ইউটাহ রাজ্যের কানাব শহরে। রাতটি অমাবশ্যার কাছাকাছি। আমাদের গাড়িটি হঠাৎ করে এক বিজন এলাকার মাঠে নেমে পড়ে। গাড়ির সব আলো নিভে যায় । আমি শংকা নিয়ে চমকের কাছে

জানতে চাই, কি হলো? চমক সবাইকে গাড়ি থেকে নেমে এসে আকাশের দিকে তাকাতে বলে। আমরা তাকিয়ে দেখি-পুরো আকাশ জুড়ে লক্ষ কোটি তারা! তারায় তারায় ছেয়ে আছে পুরো আকাশমন্ডলী। আর তাতে স্পস্ট বিশাল মিল্কিওয়ে।

এতো তারাভরা আকাশ আমি জীবনে দেখিনি। এখানে নাকি আশেপাশের মানুষ ঘটা করে তারা দেখতে আসে। আমাদের বর্ণমালা আর চমক একটা উল্কাপিণ্ড খসে পড়তেও দেখলো।

আমরা পরদিন যাই আরেক বিস্ময়- আপার অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ন দেখতে। আধা মাইল উচ্চতা ও দেড় মাইল লম্বা অ্যান্টিলোপ ক্যানিয়ন হলো একটি বিখ্যাত স্লট ক্যানিয়ন, যেটি অ্যারিজোনার "পেজ" শহরের কাছে নাভাহো জাতির জমিতে অবস্থিত। এটি এখানকার প্রকৃতি প্রদত্ত পলিশ করা লাল পাথরের দেয়াল এবং উপর থেকে আসা আলোর বিচিত্র রশ্মির জন্য পরিচিত। ক্যানিয়নের ভিতরে সরু সরু আঁকা বাঁকা পথে আলোর বিচিত্র খেলা মানুষকে ভিন্ন গ্রহের মায়াবী জগতে নিয়ে যায়। এখানে যেতে হলে পর্যটকদের অবশ্যই একজন অনুমোদিত নাভাহো গাইড নিতে হয়। পেজ শহরের এ্যান্টিলপ স্লট ক্যানিয়নের অপার কারুকাজ আর সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। সেই রূপ আজীবন রয়ে যাবে স্মৃতির অলিন্দে।

এখান থেকেই আমরা চলে যাই পেজ শহরের কাছেই কলোরাডো নদীর কাছে, যেখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফুট নীচে ঘোড়ার খুরের আকৃতি নিয়ে আছে হর্সসু বেন্ট। এসবই কলোরাডো নদীর সেই ভয়ংকর ভুমিক্ষয় আর প্রচন্ড টেকটোনিক্যাল শক্তির ইফেক্ট।

এবার আবার লাসভেগাস হয়ে আমাদের ফেরার পালা। চমক একটা পথ বেছে নেয়, যে পথে পড়ে "ভ্যালি অফ ফায়ার স্টেট" পার্ক। সেখানে পৌঁছাতেই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। শত শত আগুনে পাহাড়। প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে জুরাসিক যুগে বালির টিলা থেকে এগুলো গঠিত হয়েছিল। এগুলো ছিল সমুদ্রের অনেক গভীরে। খনিজ পদার্থ, ভয়াবহ চাপ এবং ক্ষয়, বিশেষ করে অতিরিক্ত পানির প্রভাবে, লাখ লাখ বছর ধরে এই ভূখণ্ডটিতে স্বতন্ত্র রঙ ও আকৃতির প্রভাবে এসব পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভ্যালি অব ফায়ার স্টেট পার্কের দশ/বারো মাইলের আঁকা বাঁকা ট্রেইলে গাড়ি চালানোর সময় এখানে বিচরণ করতে দেখলাম বড় বড় শিঙের বুনো পাহাড়ি ছাগলের পাল।

এবার ফেরার পালা। লাসভেগাস হয়ে লসএন্জেলস এয়ারপোর্ট। মেয়ে চারুকে টেক্সাসগামী বিমানে তুলে দিয়ে আমরা গভীর রাতে লাসএঞ্জেলসের বাসায় ফিরি...। প্রায় ১৫০০ শত মাইলের এই জার্নির পথে পথে আমরা কত কত সুন্দর ছোট ছোট শহর, গ্রাম, জনপদ পেড়িয়ে গেছি সেগুলো ছিল যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত আর আশর্য রকম সুন্দরও....।

বুখারা ॥ স্মরণে মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জা

ক্ষমা মাহমুদ

মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জার হাসির গল্পের সাথে পরিচয় নেই এমন মানুষ মনে হয় খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের ছোটবেলা বা কৈশোরকালের গল্পের ঝুলি, রূপকথার গল্পের পাশাপাশি নাসিরউদ্দীন হোজ্জা, বীরবল, গোপাল ভাঁড়ের মজার সব হাসির গল্পেও ভরপুর। সেই ছোটকালেই বুঝতাম, সেগুলো নেহায়েতই হাসির গল্প ছিল না, হাসির ছলে সমাজ ও মানুষের জীবনের নানান অসংগতি ব্যাঙ্গাত্মক করে তুলে ধরতেন সমকালীন জ্ঞানী মানুষরা, কারণ শাসকের রোষানলের ভয় সেকালেও ছিল। আমার ছোট বয়সে সংগ্রহ করা হোজ্জার বইগুলো যে বাড়ির আরো বহু প্রিয় জিনিসের সাথে নানান কারণে হারিয়ে গেছে, হোজ্জাকে নিয়ে লিখতে বসে সেটা মনে করে খুব দুঃখ হলো। সেসব পুরনো বইগুলো থেকে নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে লেখার মতো অল্প হলেও কিছু উপাদান পাওয়া যেত, সেই সাথে পেতাম হারিয়ে যাওয়া শৈশবের রঙিন দুনিয়ার ছোঁয়া!

হোজ্জার নাম মনে হলেই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে, হাসিমুখের একজন মানুষ, মাথায় মধ্য এশিয়ার টিপিক্যাল টুপি, পায়ে নাগরা, ছিপছিপে এক গাধার পিঠে উল্টোমুখ করে বসে আছেন এক এফেন্দি। কেন এই উল্টো মুখ? সমাজকে কি তিনি দেখতে চেয়েছিলেন একটু উল্টোভাবে? সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে

তার বিপরীত দিক থেকে? এই উল্টো দেখা কি তার নিজের জীবনের দর্শনকেই প্রতিফলিত করে? তার হাসির গল্পগুলো এসব কথার স্বপক্ষেই কথা বলে কোনো সন্দেহ নেই। তো লোককাহিনীর সেই জীবন্ত চরিত্র হোজ্জার সাথে যে মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহর বুখারায় আমার দেখা হয়ে যাবে সেটা আমি কস্মিনকালেও ভাবিনি, এদেশে পা রাখার কিছু আগেই কেবল সেটা জানতে পেরেছিলাম।

স্বপ্নের দেশ উজবেকিস্তানে গিয়ে ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে কোন কোন জায়গায় যাব, কী কী দেখব, সে সব নিয়ে যখন রীতিমতো গবেষণা করছি, বলা ভালো, খাবি খাচ্ছি, তখনই বিভিন্ন লেখা থেকে জানলাম আড়াই হাজার বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বুখারা শহরে, যে শহর ৬ষ্ঠ শতকে ছিল সিল্ক রুটের অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্যিক নগরী, সেখানে আছে মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জার এক ভাস্কর্য যার সাথে ছবি না তুললে নাকি উজবেকিস্তান ভ্রমণই বৃথা হয়ে যায়। মন খুশি হয়ে গেল ভেবে যে, বুখারা তো আছেই আমার ভ্রমণ তালিকায়, তাহলে মোল্লা সাহেবের সাথে নির্ঘাত দেখা হবে!

সমরখন্দ থেকে বুলেট ট্রেনে দুপুরের একটু আগেই বুখারায় পৌঁছে গেলাম আর পৌঁছেই যেন টাইম মেশিনে করে ফিরে গেলাম কয়েকশো বছর আগের দুনিয়ায়। এই শহর তো শুধুই কোনো একটা শহর নয়, এই শহর ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাতিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন যা মানুষকে এক পুরনো দুনিয়ার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত করে রাখে। বুখারা সবসময়ই পারস্য, তুর্কি ও আরবসহ বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মিলনস্থল যার প্রভাবে এই শহরের সংস্কৃতি গভীরভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বুখারায় থাকা অবস্থায় কিছুতেই তাই বর্তমান পৃথিবীতে আর ফেরা যায় না, প্রতি মুহূর্ত এই যাদুর শহর তার প্রাচীন পৃথিবীর মায়াজালে আটকে রাখে।

নয়জনের ভ্রামণিক দলের সঙ্গে উঠলাম বুখারার প্রাচীন শহর—যার পুরোটাই ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ—এর এক হোটেলে। এই পুরনো শহরেই মূলত প্রাচীন সব স্থাপনাগুলো। এখানে আধুনিক যন্ত্রযানের প্রবেশ একদম নিষেধ, পদযুগলই মূল ভরসা। আর হেঁটে না দেখলে এখানে ঘোরার কোনো মানে নেই, পদব্রজে একটু একটু করে ঘুরে দেখলেই কেবল বুখারার ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সৌন্দর্যের সাথে মোলাকাত হয়। শহরে প্রবেশের পর কোনো জায়গা থেকেই আমার মুগ্ধ চোখ যেন সরাতে পারছিলাম না, তবে সময়ের সাথেও তাল মেলাতে হবে তাই একটুও সময় নষ্ট না করে ঐতিহ্যবাহী এই শহরের আশপাশের মানুষ, বিচিত্র সব কাজে তাদের নিবিষ্টতা দেখার মধ্যেই দলেবলে মধ্যাহ্নভোজনটাও সেরে ফেলি। খাবারের স্বাদ, পরিমাণ, সৌন্দর্য, পরিবেশনা সবকিছুই আমাকে মনে করিয়ে

দেয় যে, এসেছি মোগলদের পূর্বপুরুষদের রাজ্যে। মোগল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গঠনকারী সম্রাট বাবর উজবেকিস্তানের সমরখন্দ ও ফারগানা উপত্যকার রাজা ছিলেন। ভাগ্যদোষে রাজ্যহীন রাজা ভাগ্যের সন্ধানে হাজির হয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে। যাক, সেসব গল্প আরেকদিনের জন্যে তোলা রইলো।

বুখারার পথঘাটের পাগল করা সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই কাটলো অনেকটা সময়। বিকেল হওয়ার আগেই সোজা চলে গেলাম সেই জায়গায়, যার নাম জঁপতে জঁপতে বুখারায় নেমেছি, লাব-ই-হাউজ, বুখারায় একনামে পরিচিত এক চত্বর, যেখানে নিয়মিত মানুষজনের সমাগম লেগেই থাকে, অনেকটা আমাদের রবীন্দ্র সরোবরের মতো।

চত্বরটায় পা রাখতেই মন ভালো করা এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হলাম। বুখারায় পা দেওয়ার আগে এই জায়গার আদ্যোপান্ত জেনে এসেছি বিভিন্ন লেখা থেকে; সেসব জানা এখন সরেজমিন মিলিয়ে নিতে বেশ লাগলো। বইয়ের পাতায় যা জেনে এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাণচঞ্চল আর মুগ্ধ হওয়ার মতো এই জায়গা। মার্চের শীতল আবহাওয়ায় নারী-পুরুষের সমাগমে জায়গাটা ভীষণই উষ্ণ। খুব পুরনো একটা চারকোণা একেবারে পান্না সবুজ রঙের জলাধার বা চৌবাচ্চা বা পুকুর এর কেন্দ্রে, যার নাম, লাব-ই-হাউজ, এই নামেই চত্বর। ফার্সি ভাষায় হাউজ মানে চৌবাচ্চা, 'লাব-ই-হাউজ' মানে হলো, 'চৌবাচ্চার ধারে'।

ঐতিহাসিকভাবে বুখারা পারস্যের ছায়াতলে পুষ্ট হওয়া এক শহর তাই এখানকার সবকিছুতেই পারস্যের গভীর প্রভাব দেখা যায়। এখানকার মূল ভাষা তাজিক যা ফার্সির একটি উপভাষা। মনে পড়ে গেল, আমার ছোটবেলার শহর যশোরে থাকাকালীন শৈশব-কৈশোরে অহরহই এই হাউজ বা চৌবাচ্চা শব্দটার সাথে পরিচয় ঘটতো। কখনও কখনও শুনতাম, 'হাউজ পরিষ্কার করা দরকার' বা 'হাউজের পাশে রেখে দাও' এমন ধরনের বাক্য; ব্যাপার হলো, বাসাবাড়ির পানির আধারগুলোকেই হাউজ বলা হতো, অনেক বাড়িতেই থাকতো ছোট ধরনের চৌবাচ্চা। আশ্চর্য হলাম এখানেও চৌবাচ্চা অর্থে হাউজ শব্দটির ব্যবহার দেখে মজা লাগলো। বাংলা ভাষায় আরো অনেক শব্দের মতোই অনায়াসে মিশে গেছে এই ফার্সি শব্দ, কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ যুগ শুরু হওয়ার আগে বহুকাল ফার্সিই ছিল দরবারি ভাষা, দুশো বছরের ইংরেজি আধিপত্যের পরেও আমাদের ভাষার মধ্যে ফার্সি ভাষা মিশে আছে গভীরভাবে।

চৌকোণা পানির আধারটা পুরো চত্বরে আলাদা ধরনের প্রাণসঞ্চারী। আদিকাল থেকেই শহরগুলো গড়ে উঠতো নদীর ধারে আর খাল তৈরি হতো নদী থেকে পুরো শহরে পানি সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য। মধ্য এশিয়ার শুষ্ক জলবায়ুতে পানি

সরবরাহের ব্যবস্থাও সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিল্ক রুটের অংশ হওয়ায় এসব চৌবাচ্চাগুলো তৈরি করা হতো যেন বাণিজ্যের উদ্দেশে দূরদেশ থেকে আসা বণিকরা তাদের প্রাণীগুলোসহ এসব হাউজ থেকে পানির সংস্থান করতে পারে। যতদূর জানা যায় প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে জলাধারের অভাব ছিল না। শহরের মূল পানির উৎস বুখারার জারাফশান নদী থেকে নালার মাধ্যমে পুরো শহরে সরবরাহ করা হতো যদিও আজ আর সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। শোনা যায়, সোভিয়েত আমলে কৃষি সেচ কাজে ব্যাপক কীটনাশকের ব্যবহারের কারণে এসব চৌবাচ্চাগুলো দূষিত হয়ে পড়ে যার ফলে সেগুলো ভরাট করে ফেলা হয়, তার মধ্যে এই একটিই হয়তো টিকে গেছে কোনোক্রমে যার পান্না সবুজ পানি দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়, বসে অপলক তাকিয়ে থাকে টলটলে সেই পানির দিকে।

চারদিকে মানুষের কোলাহলে মুখরিত অসম্ভব প্রাণবন্ত, সুন্দর আর বিশাল চত্বর লাব-ই-হাউজের এই পাড় বাঁধানো পান্না সবুজ পুকুরের পাশ জুড়েই অসংখ্য জমজমাট রেস্তোরাঁ কিন্তু একটুও হৈ হট্টগোল নেই, আছে শুধু মৌমাছির মতো গুঞ্জন! মনে হলো এখনকার সময়ের মানুষদের সাথে প্রাচীন এক পৃথিবীতে যেন আমি দাঁড়িয়ে আছি! অনেক সুসজ্জিত, আধুনিক শহর দেখেছি কিন্তু এ যেন অন্যরকম, মুহূর্তে আমাকে নিয়ে গেল কয়েকশো বছর পেছনের যন্ত্রবিহীন এক মনুষ্য সভ্যতার কোলে। প্রাচীন বাড়িঘর আর সরাইখানাগুলো এখন রূপান্তরিত হয়েছে রেস্তোরাঁয়। পুরো চত্বর জুড়েই খাওয়ার নানান আয়োজন। সুদৃশ্য সব রেস্তোরাঁ, আলাদা কফিশপ, আইসক্রিম পার্লার এই শীতকালেও দিব্যি চলছে! এদেশের প্রত্যেকটা জায়গায় খানাপিনার আয়োজনের গল্প বলে শেষ করা যায় না, মোগলাই খানা বলে কথা। জলাধারের পাশে টিকে আছে ছয়শো বছরের পুরনো এক তুঁত গাছ, যার কথাও পড়েছি বিভিন্ন ভ্রমণ গল্পে। যতদূর জানা যায়, ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকের দিকে এই লাব-ই-হাউজ নির্মিত হয়, যা তখন থেকে এখন পর্যন্ত মোটামুটি একই রকম আছে, উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি।

লাব-ই-হাউজের তিন দিক ঘিরে রয়েছে শহরের তিনটি অনন্য সুন্দর প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি। পুকুরের উত্তর দিকে শহরের বৃহত্তম মাদ্রাসা কুকেলদাশ মাদ্রাসা (১৫৬৮-১৫৬৯ সালে নির্মিত) এবং পূর্ব দিকে নাদির দিওয়ান-বেগী মাদ্রাসা, যার নামে এটি তিনি ছিলেন বুখারার আমির এবং সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এখানকার মাদ্রাসা আমাদের দেশের মাদ্রাসার মতো ভাবলে আবার ভুল হবে। কয়েকশো বছর আগের এই মাদ্রাসাগুলো ছিল এই অঞ্চলের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আলোকবর্তিকা, এগুলোর স্থাপত্য সৌন্দর্যও এখনো তাকিয়ে দেখার মতো। পুকুরের পশ্চিম দিকে ১৬২০ সালে নির্মিত একটি খানকাহ। যা ছিল বুখারার বিশিষ্ট

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কেন্দ্র—বা বলা যায়, ভ্রমণকারী সুফিদের সরাইখানা। বাঁধাই করা জলাধারের পাশে কিছুক্ষণ বসে জায়গাটার প্রাণস্পন্দন অনুভব করতে করতে দেখলাম, সদ্য বিবাহিত একজোড়া তরুণ-তরুণী ঐতিহাসিক মাদ্রাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। পুরো উজবেকিস্তান জুড়ে এই একটা রেওয়াজ ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি, সেটা হলো, নববিবাহিত দম্পতিরা তাদের বিয়ের পোশাক পরে প্রাচীন সব স্থাপনার সামনে দাঁড়িয়ে নানান কেতায় ঘটা করে ছবি তোলে। নিজেদের উজ্জ্বল অতীতের প্রতি এদের এই ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হয়েছি বারবার।

বিকেলবেলা বলেই যেন এতো মানুষের সমাগম এখানে। একটা শহরে এমন সুন্দর জায়গা থাকলে বিকেল-সন্ধ্যায় কি আর মানুষ ঘরে বসে কাটায়? পুরো জায়গাটা এত ভালো লেগেছিল যে ওখান থেকে ফিরতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল চুপ করে বসে বসে যা কিছু হচ্ছে আশেপাশে, শুধু দেখতেই থাকি। কিন্তু সেটা বললে তো আর হবে না, সময় কম, আরো দেখার আছে বহুকিছু। আমাদের উজবেক গাইড মির্জা বেগ বললো, চলো এবার আসল জায়গায় তোমাদের নিয়ে যাই। মির্জার পিছু পিছু আমার আরো দুই হালি ভ্রমণসঙ্গীর সাথে পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে একটু সামনে এগোতেই চোখে পড়লো ছবিতে দেখা বহু পরিচিত ধাতব ভাস্কর্যমূর্তি। গাধার পিঠে বসে রয়েছেন মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জা—গোটা পৃথিবীর মানুষের শিশুমন জয় করা এক কালজয়ী চরিত্র। তবে এটা তার সেই বহুল প্রচারিত উল্টো করে বসা মূর্তি নয়, এখানে তিনি দিব্যি সোজা হয়ে বসে আছেন, এক হাত বুকের কাছে এবং মাথার উপরে আরেক হাত তুলে দুই আঙুলে যেন বোঝাচ্ছেন, ‘চিন্তার কিছু নেই হে, সবকিছু ঠিক আছে!’

ফটোসেশন করার মতো করে একের পর এক আমরা সেই ভাস্কার্যের সাথে পটাপট ছবি তুলে উজবেকিস্তান ভ্রমণ আগে সার্থক করলাম। ততক্ষণে সন্ধ্যা তার তমসার চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া শুরু করেছে চারপাশ। আমাদের যেন আর তর সইছিল না যে কে কার আগে হোজ্জার সাথে ছবি তুলব। দিনের আলো মিলিয়ে গেলে তো সব্বনাশ, উজবেকিস্তান ভ্রমণই বৃথা হয়ে যাওয়ার দশা; এতো পয়সা খরচ করে উজবেক দেশে এসে উজবুকে পরিণত হতে চাই না।

আমরা ছাড়াও মানুষ সেখানে নেহায়েত কম নেই। আমাদের দলের ফটো তোলার ফাঁকে তারাও কেউ কেউ দিব্যি ঢুকে পড়ছেন ফটো সেশনে। এতো গেল নাসিরউদ্দীন হোজ্জার সাথে ছবি তোলা নিয়ে আমাদের কিছুটা ছেলেমানুষি বা পাগলামির গল্প। বাস্তবে আটশো বছর আগে জন্মগ্রহণ করা এই মধ্যযুগীয় সুফিকে নিয়ে পুরো মধ্য এশিয়াতেই চলে দড়ি টানাটানি। উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান, আজারবাইজান, তুরস্ক, ইরান সবাই হোজ্জাকে তাদের দেশের মানুষ বলে দাবি করে। তার মধ্যে

আবার উজবেকিস্তান এক ধাপ এগিয়ে, তাদের জোর দাবি তার জন্ম বুখারায়, তাই তো বুখারায় এসে তার দেখা পেলাম।

খুব যত্নে শহরের সবচেয়ে সুন্দর এক জমজমাট জায়গায় তার ভাস্কর্য উজবেকেরা শুধু সাজিয়েই রাখেনি, তার সাথে প্রতিনিয়ত যেন মানুষের দেখা হয় আর মানুষ তাকে স্মরণ করে সে ব্যবস্থাও করে রেখেছে। আবার ইরানিরা বলে তেরো শতকে সেলজুক শাসনামলে হোজ্জা ইরানের খোরাসানে বাস করতেন এবং আজকের উজবেকিস্তান একসময় পারস্যের ভেতরে ছিল। খুবই গোলমেলে ব্যাপার! আসলে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সীমানা ও মানচিত্র সময়ের সাথে সাথে পাল্টেছে। অনেকে মনে করেন তিনি আধুনিক ইরানের পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের 'খোয়' শহরে জন্মেছিলেন। এমনকি চৈনিকরাও তাকে বলে তিনি নাকি ছিলেন উইঘুর মুসলিম। বুঝুন! কিন্তু কেন এই টানাটানি? কারণ হোজ্জাকে সবাই চায়, সবাই তাকে নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে ভালোবাসে। জীবনের গভীর বোধ সহজভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার বেলায় তার বিকল্প নেই, ছিল না। আসলে তার মতো মানুষদের কোনো একক দেশের সীমানাবন্দী করার কথা ভাবাই অবান্তর। হোজ্জার গল্পগুলো তাই মধ্য এশিয়া বা তুরস্কের সীমানা ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছে শত শত বছর ধরে। পরিণত হয়েছে এক আশ্চর্য মিথে।

জন্মস্থান নিয়ে নানা ধরনের মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে মোল্লা নাসিরউদ্দীন হোজ্জা, ফারসি ভাষায় যার নামের অর্থ শিক্ষক বা জ্ঞানী, তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ১২০৮ সালে, সময়টা হলো তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজ্যের সূচনাকাল। যতদূর জানা যায়, তুরস্কের এসকেশেহির প্রদেশের সিভ্রিহিসার শহরের হোর্তো গ্রামে নাসিরউদ্দীন হোজ্জা জন্মগ্রহণ করেন—যা ছিল মধ্য আনাতোলিয়ার একটি প্রদেশ। ১২৮৪ সালে তুরস্কের কোনিয়া প্রদেশের আকশেহির শহরে সমাহিত হন এবং সেখানেই রয়েছে তার সমাধি। প্রতি বছর ৫ থেকে ১০ জুলাই এই আকশেহির শহরে নাসিরুদ্দীন হোজ্জা আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। ইউনেস্কো ১৯৯৬-৯৭ সালকে আন্তর্জাতিক নাসিরুদ্দীন হোজ্জা বর্ষ ঘোষণা করে।

হোজ্জা কি শুধু একজন নাকি একাধিক ব্যক্তি ছিলেন তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর বিতর্ক। তৎকালীন সমাজের মানুষের নানান অসংগতি ও বৈষম্য নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন এবং হাসির ছলে, ব্যঙ্গভরে, তার গল্পের মাধ্যমে সেসব এমনভাবে তুলে ধরতেন যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলতো। এই অসংগতি বা বৈষম্য যুগে যুগে সব সমাজেই ছিল ও কমবেশি আজও আছে। হোজ্জা তাই তার দেশ ও সময়ের সীমানা পেরিয়ে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। সাধারণের মধ্যে তিনি অসাধারণ, যেন নিজেদেরই একজন, সেজন্যেই তাকে সবাই নিজের করে রাখতে

চায়, নিজেদের মানুষ ভাবতে চায়। আজো মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র, বুদ্ধিদীপ্ত ও বাকপটু মানুষ হোজ্জা, তাই সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। সমাজের নানান অসংগতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা এক মানবিক সুফি দার্শনিক।

লাব-ই-হাউজের খুব কাছেই, হাঁটা দূরত্বে রয়েছে বুখারার বিখ্যাত ইহুদিপল্লী। হোজ্জার সাথে মোলাকাত শেষে সেদিক পানে যেতেই চোখে পড়লো পথের উপর সাইনবোর্ডে হোজ্জার পরিচিত মূর্তি, গাধার পিঠে উল্টো করে বসে আছেন তিনি। আমরা ঢুকেছি উল্টো দিক দিয়ে, সম্ভবত এদিক দিয়েই সবাই আসে হোজ্জার ভাস্কর্যের কাছে ছবি তুলতে। এতক্ষণে খেয়াল করলাম রাস্তাটার নামই হোজ্জার নামে রাখা। এটা নাসিরউদ্দীন হোজ্জা রোড। আটশো বছর আগে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ এখনও কি জীবন্ত হয়ে আছেন মানুষের মনে, আজও যেন সুফি মানুষটি সেখানে বসেই মুচকি হেসে তথাকথিত সভ্য মানুষের তাবৎ অসংগতি ও অবিমৃষ্যকারিতার দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন!

বুখারা বা উজবেকিস্তানে আমাদের বৃন্দভ্রমণ আরও কয়েকদিন চলবে। কিন্তু বুখারায় এই চত্বর থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো আজই ভ্রমণের হাফ মাশুল উসুল হয়ে গেছে!

দিনাজপুরের দর্শনীয়

গোলাম শফিক

দিনাজপুর নিয়ে যখনই কথা হয়, তখনই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে জেলাটির কৃষি ও প্রত্নসম্পদ। কিন্তু খনিজ সম্পদের প্রাবল্য ও এর চমৎকারিত্ব নিয়ে তেমন কোনো কথাই হয় না। কৃষিতে প্রধান হলো দিনাজপুরের সিগনেচার কাটারিভোগ চাল, আর সেই বিখ্যাত বেদানা লিচু। প্রত্নসম্পদ হিসেবে কান্তজিউ মন্দির শুধু দিনাজপুরেই নয়, দৈশিক সীমানা পেরিয়ে উপমহাদেশের মানুষেরও মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। বহু বিদেশী পর্যটকও এখানে এসে বিস্ময়ে অভিভূত হন। এর উপর হয়েছে বিস্তর গবেষণা। হিমালয়ের ৬৪৬ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যপাড়া (পার্বতীপুর) কঠিন শিলা ও বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিও একইভাবে বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখবার বিষয়। আমার ঐখানে সস্ত্রীক গমনের প্রণোদনা হিসেবে কাজ করেছে সাবেক সহকর্মী ও জেলা প্রশাসক শাকিল আহমেদ এবং সাবেক সহকর্মী কবি ফরিদুজ্জামানের আমন্ত্রণ। কবি তখন কঠিন শিলার কর্ণধার (ব্যবস্থাপনা পরিচালক)।

০৩ জুন (২০২৩) সকালে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমাদের তুলে নিলেন দিনাজপুর রওয়ানার উদ্দেশে। সিরাজগঞ্জের পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানীতে ভ্রামণিকদের

যাত্রাবিরতি। সেখানে প্রাতঃরাশের পর গাড়িতে উঠে আবার আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক আলাপচারিতায় (ওহঃবষষবপঃঁধষ উরংপড়ঁৎংব) মত্ত হই।

খনির সদরে-অন্দরে

প্রকৌশলী ফরিদুজ্জামান জানালেন, বাংলাদেশের কেউ জানেই না যে, আমাদের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তোলন ও পরিবহনের জন্য যে ২৭ কিলোমিটারের পাতাল রেলটি স্থাপন করা হয়েছিলো সেটিই ছিলো বাংলাদেশের একমাত্র ইলেকট্রিক রেল স্থাপনা, যা ১৯৯৪ সালে নির্মাণ করেছিলো উত্তর কোরিয়ার প্রকৌশলীরা। স্মিত হেসে বলা হলো, উত্তর কোরিয়ানরা মাটির তলায় গোপনীয় স্থাপনা নির্মাণে খুব পারদর্শী, আপনিও জানেন মাটির নিচেই তারা হরহামেশা পরমাণু বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটারব্যাপী কঠিন শিলার যে খনিটি রয়েছে সেটির বয়স ৪০০ কোটি বছর। আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উৎপাতের ফলেই এটির সৃষ্টি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এটি দুর্বল হয়ে যাওয়ায় আর উপরে উঠতে পারেনি, তাই লাভার পাহাড়ও জমতে পারেনি। পৃথিবীতে এটাই নাকি একমাত্র পাথরের খনি যা মাটির নিচে, আর সবই মাটির উপরে পাথরের পাহাড় হিসেবে বিরাজমান। কাজেই আমাদের এই খনিটি পৃথিবীর অনন্যসাধারণ অদ্বিতীয় খনি।

বিকেলে আমরা যাই সরেজমিনে পরিদর্শন করতে। হেলমেট পরিয়ে আমাদের কিছুটা নিচে নামানো হলো। বিশাল এক কর্মযজ্ঞ দেখতে পেলাম, শ্রমিকরা পরিবহনের কাজে নিয়োজিত। পাথরের আকার-আকৃতি নানা ধরনের। নদী ভাঙন ঠেকানোর কাজে যে বোল্ডার ব্যবহৃত হয় সেগুলোর আকার বেশ বড়ো। ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এসব বিভিন্ন আকারে ভাঙা ও গুঁড়ো করা হয়। নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে সাধারণত ছোটগুলোই ব্যবহৃত হয়। জানা গেল ১৫৪ মিটার পর্যন্ত এ খনির গভীরতা। প্রতিদিনের বর্তমান উৎপাদন পরিমাণ প্রায় সাড়ে ৫,০০০ মেট্রিক টন। দ্বিতীয় প্রকল্প হলে দৈনিক উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১১,০০০ মেট্রিক টনে।

এখানে শ'খানেক বিদেশী শ্রমিক রয়েছেন যারা বেলারুশ ও ইউক্রেন থেকে আগত। এ সংখ্যার অর্ধেক যে ইউক্রেনের শ্রমিক আছেন তারা সর্বদা দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন যুদ্ধের কারণে। তাদের কেউই যুদ্ধের জন্য এই মুহূর্তে দেশে যাওয়ার চিন্তা করছেন না। এরই মধ্যে কেউ কেউ সংবাদ পেয়েছেন, তাদের আত্মীয়-স্বজন মারা গিয়েছেন এবং বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এখানে থেকে তাদের শুধু হাহাকারই করতে হচ্ছে, আর কিছু করার নেই। তবুও কেউ কেউ ভাবছেন দেশে থাকলে তো নিজেই মারা যেতে পারতেন।

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে আমাদের সঙ্গ দেন জিএম সানাউল্লাহ্ যিনি জানান মাটির নিচে এই খনির পরিমাণ বা আয়তন ৬ কিলোমিটারের মতো। এখানকার কর্মীরা দেখলাম সবই চীনা। এদের সংখ্যা আড়াই শত, যাদের অধীনে ১,০০০-এর চেয়েও বেশি বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করেন। খনিটির কয়লা উন্নত মানের যা উত্তোলনের পর বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চলে যাচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের হিসাব মতে এ কয়লার বয়সও কম নয়, ২৪০ থেকে ২৮০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ২৮ কোটি বছর। এই খনিতে শ্রমিকরা লিফটে ওঠানামা করে। তারপরও এখানে কাজ করা খুবই কষ্টের। ফেরার পথে আমাদের চালক দেখালেন কীভাবে সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ফ্লাইং অ্যাশ বা উড়ন্ত ছাই নিয়ে যাওয়া হবে। কয়লার এ ছাই সিমেন্ট তৈরির অন্যতম কাঁচামাল বলে জানানো হলো।

প্রশান্ত প্রভাত, বিচিত্র স্থান নাম ও বাংলাবান্ধা

ভোর সাড়ে ৫টার আগেই হাঁটতে বের হয়ে বুঝতে পারি কত চমৎকার একটি ক্যাম্পাসে রাত্রি যাপন করেছি। এখানে আম গাছের সংখ্যা এতো বেশি যে, ক্ষণে ক্ষণে দেখতে পাই পাকা আম টুপটাপ ঝরে পড়ছে। অনেক কাঠবিড়ালীর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। বাদুড় এবং এরা নিশ্চয় পর্যাপ্ত খাবার পায়। বিশাল করবীর ঝোপসহ নানা ফুলের সমাহার, সে তো নজর কেড়েই নেয়। রজনীগন্ধাসহ বিচিত্র পুষ্পদাম সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছিলো, যার কেবল তলানিরই ছোঁয়া পেলাম। একবীজপত্রী অনেক সৌন্দর্যবর্ধক গাছের উপস্থিতি টের পাওয়া গেল। ভেতরে কোনো মসৃণ রাস্তা না থাকায় বাইরে চলে গেলাম প্রভাতী আহ্বানে। দেখলাম বাংলার চিরায়ত গ্রাম, যদিও অনেক ভবন উঠে গেছে। কৃষাণীরা অবগুণ্ঠন ভেদ করে চৌহদ্দির বাইরে এসে কাজে যোগ দিচ্ছে, নতুন ধান সিদ্ধ করছে। প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করবার বিষয়ে তাদের কোনো অলসতা নেই। এই হলো চিরচেনা আমাদের বাংলার নারী। নমস্য তাদের শ্রমনিষ্ঠা। পদব্রজ শেষে প্রত্যাবর্তন করে দেখি কঠিন শিলার পুকুরঘাট খুবই নয়ন কাড়া। এখানে উপবিষ্ট হয়ে কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করলাম। নাক-মুখ দিয়ে ফুসফুসে ঢুকছে নির্মল বায়ু, একই সাথে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হচ্ছে হাজার পাখির কলতান। এ হলো ডন কোরাস বা প্রভাতী সমস্বর।

গ্রানাইটের খনি অঞ্চল থেকে বের হয়ে বাংলাবান্ধা যাওয়ার পথে কয়েকটি জেলা আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে — দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়। পথে পথে সাইনবোর্ডে ও অ্যারোতে বহু অদ্ভুত নাম দেখে এসেছি। একটা এলাকায় দেখলাম ‘বন্দর’-এর আধিক্য। যেমন — চিরিরবন্দর, রানীরবন্দর, ভুষিরবন্দর। ‘মাইল’

দিয়েও স্থানের নাম চিহ্নিত হয়েছে — দশ মাইল, পঁচিশ মাইল, পনের মাইল, আঠার মাইল ইত্যাদি। আরো কিছু অদ্ভুত নাম চোখে পড়লো — বড় খোঁচাবাড়ি, বুড়াবুড়ি, ধাক্কামারা এসব। মাইলের নামগুলো দূরত্ব দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এটা বোঝাই গেল, এসব নিয়ে কোনো উৎসুক গবেষক নেমে পড়তে পারেন গবেষণায়। এমন ভাবতে ভাবতেই দেখতে পেলাম দিনাজপুরের তাপমাত্রার পারদ উঠে গেছে ৪২ ডিগ্রিতে।

অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে বাংলাবান্ধার জিরো পয়েন্টে গিয়ে আমরা বিস্মিত হলাম। এখানে বাংলাদেশ অংশে চমৎকার নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে দেখতে পাই। অ্যাম্ফি থিয়েটারের আদলে অনেক আসন স্থাপন করা আছে যাতে দর্শনার্থীরা দুই পক্ষের সীমান্তরক্ষীদের বিদায়ী কুচকাওয়াজ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান অবলোকন করতে পারেন। আমরা দু'দেশের সীমান্তরেখায় ৪ জনের একটি ছোটখাট রিট্রিট প্যারেড দর্শন করলাম। পঞ্চগড় এখন এক পর্যটন সাম্রাজ্য। এখানে দেখার জিনিসের অভাব নেই। দিনাজপুরের মধ্যে এ ভ্রমণ রচনা সীমিত বলে কেবল নাম উল্লেখ করছি। সীমান্ত থেকে ভারত দর্শনের আগে আমরা পথে পথে দেখে এসেছি কাজী শাহেদ আহমেদের চায়ের ভুবন। পঞ্চগড়ে এখন সর্বত্রই চায়ের চাষ হচ্ছে দেদার। কাজীদের পুরো স্থাপনায় উন্নত মানের রিসোর্ট স্থাপন করা হয়েছে, যে সবের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। এ জেলায় একটি পাথরের জাদুঘরও আছে যা আমরা পরিদর্শন করি। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তেঁতুলিয়া বাংলোটি ভারতের একেবারেই লাগোয়া। পঞ্চগড় ও ভারতের জলপাইগুড়ির সহাবস্থান পর্যটনের দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে। তবে ভারতের মাটি স্পর্শ না করেই এ অঞ্চল থেকে কাঞ্চনজংঘার রূপ দর্শন সম্ভব।

ফলের ফলাফল, লিচুর খোঁজে

এরই মধ্যে আমরা মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিই দিনাজপুর সার্কিট হাউসে। জেলা প্রশাসক শাকিল আহমেদ বলেছিলেন, লিচুর মৌসুমে আপনি কষ্ট করে চলে আসুন, এটা নিঃসন্দেহে দেখবার একটি বিষয়, এলে পরে বুঝবেন। ঢাকার অবস্থা জানা থাকায় বলেছিলাম, লিচুর মৌসুম তো শেষ। না, আপনি কিছুই জানেন না স্যার, দিনাজপুরের লিচু এখনও লাগেইনি — এই ছিলো তার জবাব। এসে তো বাস্তবে তা-ই দেখতে পেলাম। দিনাজপুরের সর্বত্রই লিচুর ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হলাম। চায়না থ্রি জাতের লিচুরই প্রথম স্বাদ গ্রহণের সুযোগ হয়েছে, তারপর বেদানা, অপূর্ব তার আস্বাদ বা রসনা। আমরা বাগান পরিদর্শন করলাম বিরল উপজেলায়। বিরলে অন্য

কিছু বিরল হলেও লিচু বিরল নয়। বাংলাদেশের কৃষির এক স্বর্গীয় প্রতিফলন দেখে বিস্মিত হলাম উভয়েই। একজন বাগান মালিক বললেন, নিজ হাতে লিচু পেড়ে খেয়ে দেখুন, এই অনুভূতি কোথায় পাবেন? তিনি যথার্থই বললেন। তবে আমাদের কৃষি যে পুরোটাই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল তা আবারও অনুধাবনে এলো। কারণ অতিরিক্ত গরমের কারণে এবার লিচুর ফলন ভালো হয়নি। আমাদের সঙ্গ দানকারী জেলা প্রশাসনের শিশিরের বাড়ি বিরলে হওয়ায় কোনো তথ্যের ঘাটতি দেখা দেয়নি।

প্রত্নসম্পদের রত্নঘরে

দিনাজপুরের প্রত্ন নিদর্শন যেহেতু বিশ্ব-দর্শনার্থীদেরই মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে এবং যেহেতু এ বিষয়ে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে নতুন করে বলতে চাই, তাই এখানে বয়ান একটু দীর্ঘ হতে পারে। মুসলমানরা সুরসাধকের জাত ও জাতক। জাতক বললাম এ জন্য যে, কথিত আছে জাকির হোসেন খান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাঁর পিতা ওস্তাদ আল্লাহ রাখা খান (পদ্মশ্রী) পুত্রের কানে শুনিয়েছিলেন তবলার বোল। পরবর্তীতে সেই জাকিরই হয়েছিলেন বড় ওস্তাদ। আল্লাহ রাখা খানের গোটা পরিবারই ছিল সুরসাধক। তেমনিভাবে হাজারো মুসলিম সুরসাধক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন উপমহাদেশ জুড়ে — ভারতরত্ন বিসমিল্লাহ খান, আলী আকবর খান, নুসরাত ফতেহ্ আলী খান (পাকিস্তানি কাওয়ালি সম্রাট), আয়েত আলী খান (তমঘা-ই-ইমতিয়াজ), পদ্মভূষণ-পদ্মবিভূষণ আলাউদ্দিন খান, আরো কত! মুসলমানদের সার্বিক শিল্পের সাধনা নানা ডালপালা বিস্তার করেছিল। অতীতে পেশার প্রয়োজনে তাদের কেউ কেউ হয়েছিলেন প্রাসাদ, মন্দির মসজিদ ও বিগ্রহ নির্মাণের নিপুণ কারিগর।

দিনাজপুরের একটি উপজেলা, কাহারোলেই দুটি ঐতিহাসিক স্থাপনা, যে গুলোর নির্মাতা, বিশেষত নকশাকার ও শিল্পী ছিলেন মুসলিম। একটি নয়াবাদ মসজিদ, অন্যটি কান্তজি বা কান্তজিউ মন্দির। এই পরিদর্শনে এ দুটো প্রত্নসম্পদ ও জাদুঘরের বিগ্রহ গুলোর ডিটেইল্ড কারুকাজ দেখে নতুনভাবে বিস্মিত হলাম। দুটি স্থাপনাই ঢেঁপা নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে কাছাকাছি অবস্থানে নির্মিত। নয়াবাদ মসজিদের অবস্থান নদীর পশ্চিম পাড়ে। পারস্য থেকে আগত শিল্পীরা একই আবাসিক এলাকায় বসবাস করতেন, পরবর্তী সময়ে যা হয়ে গেল মিস্ত্রিপাড়া। এই মিস্ত্রিপাড়ার আজকের অধিবাসীরাই তখনকার শিল্পীদের বংশধর। দুটি প্রত্নসম্পদই মুঘল স্থাপত্যের নিদর্শন এবং ইন্দো-পারস্যের শিল্পরীতির আলোকে নির্মিত।

টেরাকোটার নকশাখচিত অনুপম সৌকর্যমণ্ডিত নয়াবাদের মুসলিম উপাসনালয়টি নির্মাণের স্থপতি, কারিগরদের কান্তজিউ মন্দির নির্মাণের জন্য মহারাজ প্রাণনাথ ১৭০৪ খ্রিষ্টাব্দে নিয়ে এসেছিলেন বলে বিদিত। এখানে এসে তাঁরা নিজেদের ইবাদতের নিমিত্ত দুই কাতার মুসল্লির জন্য ছোট্ট এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এখানে মোট ৪০ জন স্বাচ্ছন্দ্যে নামাজ আদায় করতে পারেন। জানা যায়, প্রায় ৪৮ বছরব্যাপী মন্দিরের নির্মাণ কাজ চলছিল। এ দীর্ঘ নির্মাণ সময়ের কারণে স্থপতি, শিল্পী ও কারিগরদের দুই/তিন পুরুষের এখানেই কেটে যায়। তাঁদের শ্রম ও সাধনার মূল্য দিতে গিয়ে মহারাজ কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি তাদেরকে দান করে নয়াবাদ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেন। মসজিদের বংশানুক্রমিক তত্ত্বাবধায়ক পরিবারের সূত্রে জানা যায়, মন্দির নির্মাতা মূল স্থপতিসহ অনেকেই আর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেননি। তাদের জীবনাবসান হলে নয়াবাদ মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে কবরস্থ করা হয়, এ সবের একটি কবর আজও দৃশ্যমান। মসজিদের কারিগরদের মধ্যে নিয়াজ নেওয়াজ (কালুয়া মিস্ত্রি)-এর নাম আজও মুখে মুখে ফেরে। তবে বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়ক মুজিব আলার নামটিও শোনা যায় কান্তজির মন্দিরের নির্মাতা হিসেবে, যে সময়টাকে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের রাজত্বকাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মসজিদটি আকৃতিতে বড়ো না হলেও, এর নির্মাণকৌশল বড় মাপের। এতে মুসলিম ঐতিহ্যের ফুলপাতার টেরাকোটা পরিলক্ষিত হয়। তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তকার মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১২.৪৫ মিটার, প্রস্থ ৫.৫ মিটার, দেয়ালের প্রস্থতা ১.১০ মিটার। বহু খাঁজযুক্ত খিলানাকৃতির নকশাখচিত তিনটি মিহরাব রয়েছে ভেতরে। এটির পূর্ব দেয়ালের প্রবেশদ্বারের উপর ১২/৯ ইঞ্চি আয়তকার মসৃণ পাথরের একটি শিলালিপি আছে, যা প্রাচীন ফারসি অক্ষরে উৎকীর্ণ, কোনো কোনো অংশে অক্ষরগুলো অস্পষ্ট বলে যথাযথ তথ্যনির্ভর অনুবাদ না করতে পারায় সন-তারিখ উদ্ধার করা যায়নি। ফলকগুলোর অলংকরণ এখন অনেকটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এটি মুসলিমদের প্রকৃত গৌরবের বস্তু, ঐতিহ্য ও মহামূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এটি এখন বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধিভুক্ত একটি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।

যে রাজা প্রাণনাথের কথা বলা হলো তার জীবন পরিক্রমা ১৬৮২ থেকে ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দ। তার ইচ্ছেয় মুসলিম শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল কান্তজির মন্দির, যে মন্দিরের টেরাকোটায় রয়েছে অনেক পৌরাণিক কাহিনি ও শাস্ত্রীয় বিষয়াদি, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার আওতায় ছিল না। যেমন — একদা কালাপাহাড়ের

ভয়ে উড়িষ্যার মন্দির গাত্রের খোদাই নৃত্যের উপর চুনকাদা লেপ্টে দেয়া হয়েছিল, ৪০০ বছর পর এ মুদ্রা থেকে কেলুচরণ মহাপাত্র ওড়িশি নাচ উদ্ধার করেছিলেন, যেটি কুচিপুরী নৃত্যের মতোই একটি বিখ্যাত নৃত্যঘরানা। কেলুচরণ মহাপাত্র (উড়িষ্যার প্রথম পদ্মবিভূষণ) শাস্ত্র বুঝতেন বলেই এ নৃত্যমুদ্রা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে সব আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। যেমন কান্তজির মন্দিরের চারপাশে যে টেরাকোটা রয়েছে তা চারটি যুগ — অর্থাৎ সত্য, দ্বাপর, ত্রেতা ও কলিযুগকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সাধারণ দর্শক এসব বোঝেন না, এমন কি হিন্দুধর্মীয়রাও না। তেমনিভাবে কান্তজির মন্দিরের নির্মাতা শিল্পীরাও এসব শাস্ত্রীয়, ভিন্নধর্মীয় বিষয়গুলো নিশ্চয় বুঝতেন না। তাই ধারণা করা যায় কোনো না কোনো বিশেষজ্ঞ, শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, কিংবা স্বয়ং রাজা তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কারণ এসব মুসলিম শিল্পীদের হাতে ছিল জাদু, আসলে এ জাদুটাই আমদানি করা হয়েছিল। এই জাদুর সাথে একান্তভাবে মিশ্রিত হয়েছিল স্থানীয় সংগীত, নাট্য ও কাব্য পরিবেশনার অবয়বগত রীতি। একটি টেরাকোটায় দেখা যায় সামুদ্রিক জাহাজে আসীন বন্দুকধারী, প্যান্টালুন ও লম্বা কুর্তা পরিহিত এক দল মানুষকে, যা নির্মাণকালীন একটি প্রতিনিধিত্বশীল সমাজ-চিত্র।

রাজা প্রাণনাথ কান্তজির মন্দিরের নির্মাণকর্ম শুরু করলেও তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, এটির নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল তদীয় পোষ্যপুত্র রামনাথের হাতে। এই রাজা রামনাথের উদ্যোগে দিনাজপুরের বিখ্যাত রামসাগর দিঘিও খননকৃত। কান্তজির স্থাপনাটি নির্মিত হয়েছে শ্রীকান্তের নামে, কান্ত বলতে কৃষ্ণকেই বোঝায়, আর জিউ হচ্ছে তাঁর উপাধি। আগে এলাকাটির নাম ছিলো শ্যামনগর, এখন বলা হয় কান্তনগর। দেবোত্তর সম্পত্তির উপর এই মন্দির নির্মিত যার পরিমাণ ছিল ৬০৪ একর, এখন দখলদারীর পর ভূমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০০ একর মাত্র। এই ভূমি-সীমার মধ্যেই আদি মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমান মন্দিরের ভূমি নকশা ও অলংকরণে মধ্যযুগীয় বাংলার শেষ দিকের নির্মাণশৈলীর প্রকাশ ঘটেছে। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিন তলাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি পাথরের তৈরি একটি বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। মোট ১৫.৮৫ বর্গমিটার স্থান জুড়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। এর চারপাশের ১.৬৮ বর্গমিটার প্রস্থের খোলা বারান্দা প্রশান্তিদায়ক হলেও এটির বহির্গাত্রের পোড়ামাটির ফলকই মূল আকর্ষণ। মন্দিরের ছাদ চূড়া দ্বারা সজ্জিত ছিল যা ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ রকম প্রাকৃ

তিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় এ মন্দিরকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল, যেমন — এর ধর্মপতাকাটি চুরি হয়েছিল মোট তিনবার।

পোড়ামাটি বা টেরাকোটা সভ্যতার পরিচায়ক, যেমন পরিচয় বহন করে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পর আবিষ্কৃত অন্যান্য মাটির নিদর্শন (স্মর্তব্য: সিন্ধুর হরোপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা, বাংলাদেশের ওয়ারি বটেশ্বরের খননকৃত নিদর্শন ইত্যাদি)। এ মন্দিরে নকশা, অলংকরণ ও পোড়ামাটির ফলকের সুবিন্যাস মন্দিরটিকে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এর উপর-নীচ অলংকরণে আছে পোড়ামাটির প্যানেল। প্যানেলগুলো আবার আনুভূমিক (horizontal) এবং উল্লম্ব (vertical) উভয়ভাবেই বিন্যস্ত। দেখা গেল ৬টি অনুভূমিক সারির মধ্যে ৫টি নীচে, একটি উপরের দিকে স্থাপিত। অনুভূমিক প্যানেলগুলোর বিন্যাস বিষয়বস্তু-নির্ভর, যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এসব সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে কেবলই একটি ইমেজ। হরাইজন্টাল প্যানেলগুলোয় মধ্যযুগের শেষার্ধের অভিজাত শ্রেণী এবং পৌরাণিক দুই বীর — রাম ও কৃষ্ণের জীবনেতিহাস বিধৃত হয়েছে। ভারটিক্যাল প্যানেলসমূহে আছে বিষ্ণুর ১০ অবতার — মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন (ত্রিবিক্রম), পরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি প্রতিমার প্রতিকৃতি।

দিনাজপুরে যে জাদুঘরটি রয়েছে সেটির নিদর্শনগুলো পুরো বরেন্দ্র অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে। এখানকার বিগ্রহসমূহ কালো বর্ণের। এসব নির্মাণে শিল্পের যে ডিটেইলস-ওয়ার্ক দেখা যায় সে সব হস্তশিল্প, সুচিকর্মের মতোই তিলে তিলে গড়ে তোলা, যেসব পাথরে খোদাইকৃত। এসব প্রত্নসম্পদ একই কালকে ধারণ করলে এখানেও মুসলিম শিল্পীদের হাতের স্পর্শ থাকতে পারে বলে কিউরেটর শিহাব হোসেন মত প্রকাশ করেন। মূর্তি সমূহের গলায় যে হার কিংবা মালা এবং কোথাও কোথাও লোকজ মোটিফ পরিদৃশ্যমান সে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজের, যে গুলো খোদাইকৃত বলেই প্রমাণিত। বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির টুকরো জোড়া দিয়ে বা আঠাযুক্ত করে নির্মাণ করা হলে কয়েক শত বছরে এসব অদৃশ্য হয়ে যেতো। যেহেতু এক সময় মুসলমানদের হাতে নানা শিল্প-সৌকর্য, ক্যালিগ্রাফি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, সুর, ভূর্জ্যপত্র লিখন, পাথরে ঐশীবাণী ধারণ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তাই পেশার প্রয়োজনে তারা এ সবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতেও পারেন।

মুসলিম কোনো স্থাপনায় কি হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মীয়দের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়? মসজিদের আদলে নির্মিত তাজমহলের প্রধান ভাস্কর ও মোজাইকশিল্পী হিসেবে নেয়া হয়েছিল চিরঞ্জিলালকে। এ পাথর খোদাইকারীকে আনয়ন করা হয়েছিল দিল্লি

থেকে। তবে মূল স্থপতি ওস্তাদ ঈসা ছিলেন পারস্যদেশীয়। পারস্য বা ইরানে যে নির্মাণ শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছিল তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। তখন এসব শিল্পীদের শিল্পগুণের কথা দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। এই তথ্য যেন এ রচনার হাইপোথিসিসকেই প্রমাণ করছে যে, কান্তজির মন্দির নির্মাণের জন্য রাজাগণ পারস্য থেকে মুসলিম কারিগরদের আনয়ন করে থাকতে পারেন।

সম্রাট শাহজাহানের পিতামহ আকবরের সময় থেকে যে মুসলিম-হিন্দুর সাংস্কৃতিক মিশ্রণ শুরু হয়েছিল তা পরবর্তী শতাব্দী সমূহেও অব্যাহত থাকে। তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন রাজপুত নারী যোধাবাঈ (হীরা কুমারী)-এর সাথে। মতান্তরে তিনি ছিলেন এক পর্তুগিজ যুবতী যার ধর্মীয় পরিচয় খ্রিষ্টান (খ্রিষ্টনামঃ ডোনা মারিয়া মাসকারেনহাস)। তাছাড়া সম্রাট সরকারি পদ-পদবীতে ভিন্নধর্মীয়দের সম্পৃক্ত করেছিলেন ব্যাপকভাবে। সম্রাট আকবর মুসলিমদের সাথে মিশ্রণ-মিথস্ক্রিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন যার পরবর্তী প্রভাব পড়েছিল শিল্পকলায়ও। অতীতের ধর্মীয় সম্প্রীতি, মানবিক সহাবস্থান অনেক মজবুত ছিলো, যা আমরা হারিয়েছি। তবু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাজমহল কিংবা কান্তজির মন্দির।

রাজ রাজড়াদের কাহিনি

জানা গেলো দিনাজপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। আগে নাকি নাম ছিলো ঘোড়াঘাট। জনশ্রুতি আছে, জনৈক দিনাজ বা দিনারাজ দিনাজপুর রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নামানুসারেই রাজবাড়িতে অবস্থিত মৌজাটির নাম হয়েছিলো 'দিনাজপুর'। আগের নাম বাতিল করে ব্রিটিশ শাসকরা নতুন জেলা গঠন করেন এবং রাজার সম্মানে জেলার নামকরণ করেন 'দিনাজপুর'।

শেষ দিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর দিনাজপুর রাজবাড়ি দর্শন করে আমরা চলে আসি রামসাগর দিঘীতে। উল্লিখিত যে, এটি খনন করিয়েছিলেন রাজা রামনাথ। ১৭২২-১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আগে তিনি এটি খনন করিয়েছিলেন বলে বিদিত আছে। কথিত যে, ৩০,০০০ টাকায় ৫ বছরব্যাপী ১৫,০০,০০০ শ্রমিক সেখানে কাজ করেছিলো। আসলে তখন পনের লক্ষ মানুষ কোথায় পাবে কে? এ হিসাব হয়তো প্রতিদিনের একক শ্রমের ইউনিট হতে পারে। দিঘীটির আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বর্গমিটার। গভীরতা ১০ মিটার। এবার পড়ন্ত বেলায় আমরা এর সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। দিনাজপুরে মোট ৫টি দিঘী রয়েছে বলে জানা গেল — রাম সাগর, সুখ

সাগর, মাতা সাগর, আনন্দ সাগর ও জুলুম সাগর। সুখ সাগর নিয়ে মোট দুইটিই পরিদর্শন করা হলো।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ নিয়ে বিতর্কটির অবসান ঘটিয়েছি মনে মনে, এই দিনাজপুর এসে। প্রতি সকালে হাঁটতে বের হয়ে গোরে শহীদ মাঠের বিশালতা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। সে এক অন্য রকম তৃপ্তি। বিশাল এই মাঠ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এখন এটাকে বলা হয় বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদ জামাতের মাঠ, যা আগে স্বীকৃত ছিলো কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া। এক সকালে প্রথম, দ্বিতীয় মাঠ পার হয়ে একটি শিশুপার্ক দেখতে পেলাম যেখানে প্রচুর প্রাতঃ ভ্রমণকারী হাঁটছেন, ব্যায়াম করছেন। এই মাঠ পার হয়েও গোরে শহীদ মাঠ আছে, এই তথ্য আশ্চর্য হওয়ার মতোই। পুরো মাঠের ভেতরেই কয়েকটি পাকা রাস্তা আছে, মাঠের সম্পূর্ণ আয়তন ৭৮ একর। এ মাঠের মধ্যভাগে চেহেলগাজীর সমসাময়িক ইসলাম প্রচারক শাহ্ আমির উদ্দিন ঘুরীর মাজার রয়েছে যিনি ঘোড়ায় চড়ে দিনাজপুরে ইসলাম প্রচারে এসে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। সেই থেকেই গোর-এ-শহীদ নামকরণ। আরো একটি জনশ্রুতি আছে বলে জানা যায়। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ আমলে ইসলাম প্রচার নিয়ে ৪০ জন সুফির সঙ্গে এক হিন্দু রাজার যুদ্ধ হয়েছিলো। তাতে সুফিদের একজন প্রাণ হারান, যাকে এখানেই কবর দেয়া হয়। ওই সময়কার মুসলিম শাসকদের ভাষা ফারসি হওয়ায় কবরের ফারসি শব্দ ‘গোর’ প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। আর মাঠটি প্রতিষ্ঠা পায় গোর-এ-শহীদ ময়দান হিসেবে। এখন এটিকে বলা হয় লিভার অব দিনাজপুর। ইংরেজ আমলে এ মাঠে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৮৬ সালে এ মাঠের কাছে তেভাগা আন্দোলনের নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ সমাহিত হন। এই মাঠটিই এখন প্রকৃতপক্ষে দিনাজপুরের সবচেয়ে বড়ো আইকন।

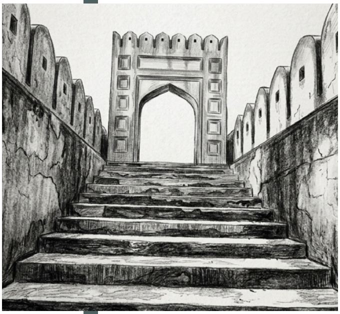

মুন্সিগঞ্জে সারাটা দিন

চান্দ্রেয়ী পাল মম

এক মাস ধরে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তাই ভাবছিলাম কোথাও একটা ঘুরে আসি। ঢাকার আশেপাশে একদিনে ঘুরে আসার মতো বেশ কিছু জায়গা রয়েছে—নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ঘোড়াশাল, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মাওয়া এবং আরও অনেক কিছু। ঠিক করলাম মুন্সিগঞ্জ যাব। বন্ধুদের জানালাম, যেদিন যাব তার দুদিন আগে বাবা-মাকেও বললাম। অনেকদিন আমাদের পরিবারের চারজন কোথাও যাইনি। বাবা-মাও রাজি হয়ে গেলেন।

২৫ মার্চ, ২০২৩ তারিখ সকাল সকাল সবাই তৈরি হয়ে বের হয়ে গেলাম। প্রথমেই যেতে হবে ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে। সেখানে বন্ধুরা সবাই চলে আসল। আমরা ৮ জন ‘স্বাধীন’ বাসে উঠে রওনা দিলাম প্রথমে শ্রীনগরের দিকে। বাস ভাড়া ছিল ৯০ টাকা করে। ঢাকা পেরোতে খুব একটা সময় লাগল না। রাস্তাটা ছিল খুবই সুন্দর। যারা মাওয়া গেছেন তারা রিলেট করতে পারবেন হয়তো। চারপাশ একদম সবুজ। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নেমে গেলাম শ্রীনগরের বেজগাঁও এলাকায়। এখানে একটা ছোট্ট সমস্যা হয়েছে। সাধারণত আমি কোথাও যাওয়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ট্র্যাভেল গ্রুপের বেশ কিছু পোস্ট এবং গুগল ঘাটাঘাটি করে যাই। এবারও তাই করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে কিছু ভুল তথ্য থাকায় আমরা প্রথমেই শ্রীনগর যাই, যেখান থেকে

আসলে মুন্সিগঞ্জ শহর বেশ অনেকখানি দূরে। যাই হোক, ভাবলাম এসব কোনো বিষয়ই না। আমরা একটা টমটম ঠিক করে কাছাকাছি দুটো স্পটে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথম গন্তব্য লেখক হুমায়ূন আজাদের বাড়ি। তাঁর পুরাতন এবং নতুন দুটো বাড়িই সেখানে রয়েছে। তিনি শায়িত আছেন বাড়ির প্রাঙ্গণে। গাছপালায় ঘেরা পুকুরের ধারে খুব শান্ত একটা জায়গা। সমাধিটি একদম বইয়ের আকারে তৈরি। এটা দেখতে খুব ভালো লাগল। আমরা সবকিছু দেখে কিছুক্ষণ বসে বের হয়ে এলাম। এরপর চলে গেলাম স্যার জগদীশ চন্দ্র বোস ইনস্টিটিউটে। অনেক বড় এলাকা। প্রথমেই ঢুকে হাতের বামে ছোট্ট একটা ঘর, জাদুঘরের মতো অনেক জিনিসপত্র ও পেইন্টিং সাজানো। সেখান থেকে বের হয়ে সামনে এগিয়ে বড় মাঠ, হাতের বামে একটা বাড়ির দরজা, মন্দির। আরেকটু সামনে গিয়ে বিশাল এক দিঘি। সেখানে কিছুক্ষণ বসে ছিলাম। এত শান্তি আর আরাম! পুরোটা জায়গায় প্রচুর গাছপালা। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা পৌঁছলাম শ্রীনগর বাজারে। 'লক্ষ্মী নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' বসে মিষ্টি, দই, কালোজাম, জিলাপি বলা হলো। গরম গরম জিলাপি খেয়ে একদম মাথা নষ্ট!

সবসময় শুনে এসেছি বিক্রমপুরের ঘোল সেরা। কিন্তু আমি কখনো ঘোল খাই না, খুব একটা ভালো লাগে না। বাবা আর অভিজিৎ দুটো অর্ডার করার পর বাবার কাছ থেকে সিঁথি নিয়ে একটু টেস্ট করল। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, নাহ একবার খেয়েই দেখি। আহা! সেই স্বাদ আমার এখনো মনে আছে। একটু বিটলবণ আর লেবুর রস মেশানোর কারণে ঘোলের স্বাদ অন্য লেভেলে চলে গেছে। অসম্ভব মজা। আরও কয়েকটা চটজলদি বলা হলো। মনে হলো স্বর্গ হাতে পেলাম। ভরপেট এবং মনের শান্তি করে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার টমটমে চড়ে বসা। এবার গন্তব্য মুন্সিগঞ্জ। অনেক লম্বা পথ, প্রায় ২৮ কিলোমিটার। প্রায় দুই ঘণ্টার বেশি সময় লাগল আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছাতে। পুরোটা রাস্তা আমরা খুব খুব গল্প করলাম। অনেক হাসি-আড্ডা হলো। বহুকিছু নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা হলো। বাইরের সবুজে মোড়া পিচঢালা পথ ছিল মনোমুগ্ধকর।

একটা খুব সুন্দর বিষয় যেটা—পুরোটা এলাকায় প্রত্যেকটা বাড়ির একটা করে পুকুর আছে। আক্ষরিক অর্থে প্রতিটা বাড়ির সামনে কিছুটা জায়গায় পুকুর করা। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগল আমার। সারাদিন ব্যাপারটা আমি খেয়াল করলাম। আবার এই এলাকার বাড়িগুলোর ধাঁচ একদম আলাদা। রঙিন টিন ও কাঠ দিয়ে তৈরি দোচালা, চারচালা বাড়িগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিফট করা যায়। অর্থাৎ জোড়া খুলে পুরো বাড়িটিকে একটা মানুষ আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন। একটা দুটো ভ্যানে করে আমরা দেখলামও বাড়ির জোড়া খুলে নিয়ে যেতে। এক জায়গায় ছিল অনেকগুলো

তৈরি বাড়ি। বাবা দেখাল সেখান থেকে মানুষ বাড়ি কিনে নেয়। কী মজার একটা ব্যাপার! এবং বাড়িগুলো দেখতেও খুব সুন্দর। বোঝা গেল এটা বাড়ির হাট।

দুপুর তিনটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম ইদ্রাকপুর কেল্লায়। মুন্সীগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে ইদ্রাকপুর কেল্লা। মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সেনাপতি ও বাংলার সুবেদার মীর জুমলা ১৬৬০ সালে বিক্রমপুরের এই অঞ্চলে ইদ্রাকপুর কেল্লা নামের এই দুর্গটি তৈরি করেন। মূলত মগ জলদস্যু ও পর্তুগিজদের আক্রমণ হতে এলাকাকে রক্ষা করার জন্য দুর্গটি তৈরি করা হয়। মূল দুর্গের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে কিছুদূর হেঁটে হাতের ডানে একটা পুকুর আর বামে সিঁড়ি উঠে গেছে দুর্গের চূড়ায়। পুকুরের ঘাটে নেমে কয়েকজন একটু ফ্রেশ হয়ে নিল। আর আমি উঠে গেলাম উপরে। গোলাপি রঙের কেল্লাটি দেখতে খুব সুন্দর। কিছু ছবি তুলে রাখলাম। রোদ তখনও অনেকখানি চড়ে আছে। কিছু সময় কাটিয়ে নেমে আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটি জাদুঘর। সেখানে মুন্সিগঞ্জ শহরের ইতিহাস এবং স্থাপনাগুলো সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা দেয়া আছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় এবং এই দুর্গে প্রাপ্ত বেশ কিছু জিনিসও রাখা আছে। ভেতরে ফোন ও ক্যামেরা অ্যালাউড নয়। একটুখানি দেখে বের হয়ে এলাম।

হুট করেই আকাশ কালো হয়ে উঠল। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে, চারপাশের সবগুলো গাছের পাতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। খোপগুলোর আশেপাশে উড়তে উড়তে পাখিগুলো সব কিচিরমিচির শুরু করল।

কেল্লা প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আমরা একটু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলাম যে এরপর কোথায় যাওয়া যায়। আমার মাথায় ছিল সোনারং জোড়া মঠ। জায়গাটা কেল্লা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। গুগল ম্যাপে জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দুটো রিকশা দরদাম করে উঠে পড়লাম। যেতে থাকুক। যাওয়ার সময় পথের সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। প্রচুর গাছপালার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, রোদ গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়ছে। গ্রামের রাস্তায় মানুষজন টুকটাক কাজ করছে। মাঝে একটা বড় গাছ দেখলাম হালকা সবুজ ফুলে ভরে আছে। কিন্তু আমরা ফুলের নাম জানি না। (পরবর্তীতে জেনেছি সেটা ছিল ছাতিম ফুলের গাছ)। রিকশা থামিয়ে একটা ছবি তুলে নিলাম গাছটার। ৪০/৫০ মিনিট পর আমরা পৌঁছলাম গন্তব্যে। দূর থেকে দেখেই মাথাটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। সোনারং জোড়া মঠ মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গীবাড়ী উপজেলার সোনারং গ্রামে অবস্থিত। মূলত এটি জোড়া মন্দির। বড় মন্দিরটি কালীমন্দির ও ছোট মন্দিরটি শিবমন্দির। দুটো মন্দিরই এত সুন্দর আমি লিখে বোঝাতে পারব না। একদম পাশাপাশি দুটো মন্দিরে পুরোটা জুড়ে পোড়ামাটির

কাজ। বড় মন্দিরটির উপর দিকে অনেকগুলো ছোট ছোট খোপ খোপ করা। এই খোপগুলোতে পাখির বাসা রয়েছে। যার কারণে প্রচুর পাখি মন্দির দুটোর মাঝে ওড়াউড়ি করছিল।

আমরা ঘুরঘুর করছিলাম, টুকটাক ছবি তুলছিলাম—এর মধ্যে একটা সেরা ব্যাপার হয়ে গেল। হুট করেই আকাশ কালো হয়ে উঠল। হু হু করে ঠান্ডা বাতাস বইছে, চারপাশের সবগুলো গাছের পাতা যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। খোপগুলোর আশেপাশে উড়তে উড়তে পাখিগুলো সব কিচিরমিচির শুরু করল। বৃষ্টি আসার আগের মুহূর্ত আমার খুব পছন্দ। বুক ভরে ঠান্ডা বাতাস নিতে নিতে পুরোটা সময় উপভোগ করলাম। কিন্তু অবাক করা বিষয়, বৃষ্টি আসলে হলো না। শুধু আবহাওয়াটা ঠিক এমনই রইলো।

জোড়া মঠের কাছেই ছিল অতীশ দীপঙ্করের বাস্তুভিটা। আমরা রিকশা নিয়ে সেখানে চলে গেলাম। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলেন একজন প্রখ্যাত মহাপণ্ডিত যিনি পাল সাম্রাজ্যের আমলে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এখন সেখানে অতীশ দীপঙ্করের পণ্ডিত ভিটা ও অডিটোরিয়াম অবস্থিত। জায়গাটা যে কী অদ্ভুত শান্তি শান্তি! মূল একটি প্যাগোডা মন্দির, সোনালি রঙের, ভেতরে একটি কালো পাথরের মূর্তি। চারপাশে প্রচুর রঙিন প্রেয়ার ফ্ল্যাগ বাতাসে উড়ছে। গাছপালা, ফুল বাগান—এক দুজন মন্দির প্রাঙ্গণের মানুষ ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। আর ছিল একটা সুন্দর কুকুর। মনে হচ্ছিল আমাদের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। ওকে একটু আদর করে আমরা বের হলাম।

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো জলপথে লঞ্চে করে ঢাকা ফিরব। একই রিকশা করে আমরা মুন্সিগঞ্জ সদরঘাট চলে গেলাম। রোজার সময়, ঠিক মাগরিবের আজানের আগমুহূর্তে রিকশা ছেড়ে দিয়ে কাছের এক খাবার হোটেলে গিয়ে বসা হলো। বাইরেটা একদম নীরব। ঠান্ডা বাতাস, গোধূলি সন্ধ্যা। কিছু খাবার অর্ডার করে আমরা খেয়ে নিলাম। সবারই মোটামুটি ভালো ক্ষুধা লেগেছিল। পেটপূজো শেষে আমরা লঞ্চের টিকিট করে নিলাম। ডেকের ভাড়া খুবই কম ছিল, ৪০ টাকার মতন। এরপর লঞ্চ জার্নিটা ছিল বেশ রিলাক্সিং। সারাদিনের পর আরাম করে আমরা ছাদে বসে ঠান্ডা বাতাস খাচ্ছি, গল্প করছি টুকটুক করে, আকাশে কাস্তের মতো চাঁদ। নদীতে নানান রকম নৌকা আর জাহাজের আলো। এত্ত ভালো লাগছিল! সদরঘাট পৌঁছে আলো, ভিড় দেখছিলাম। ততক্ষণে শরীরে ক্লান্তি এসে ভর করেছে। বাহাদুর শাহ পার্কের কাছে এসে কয়েকজনকে বিদায় দিলাম। এরপর বাসে উঠে বাসার দিকে চললাম। ভাবছিলাম, এমন সুন্দর আনন্দ দিন বারবার আসুক!

অভিযান লোবুচে ইস্ট

জাফর সাদেক

কাঠমান্ডু পৌঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। এই শহরে অনেকবার আসা-যাওয়ার কারণে রাস্তাঘাট সব চেনা। ঢাকার মতোই পরিচিত এই শহরের রাস্তাঘাট। তাই এখানে আসার জন্য আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। শহরে পরিচিত বন্ধু আছে; তাই কাঠমান্ডু এখন আর বিদেশ সফর বলে অনুভব হয় না। রোজার দিনে খাবারদাবার নিয়ে কোনো প্যারা নিতে হয় না। অনলাইনে ভিসা আবেদনের প্রমাণপত্র মোবাইল স্ক্রিনে দেখিয়ে কয়েক মিনিটে ইমিগ্রেশন থেকে ভিসা নিয়ে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে এসে শেয়ার ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিতে আমরা তিনজন। সবাই ঢাকা থেকে আলাদা এলেও নিয়তি আমাদের একই বিমানে এবং একই ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়েছে। থামেলে এসে পুনরায় যার যার গন্তব্যে চলে গেলাম। চলতি পথে কত মানুষের সঙ্গে আমাদের চলতে হয়। আমাদের অজান্তেই আমরা বহু মানুষের সাথে শেষবারের মতো দেখা করে ফেলেছি। ভাবনার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার আগে থামেলে পৌঁছে কাঠমান্ডু সিটি হোটেলের তিন তলার রুমে চেকিং করার সময় দেখি পাশের রুমে সাকিব আর তার বন্ধু উঠেছে। আশেপাশে সবাই পরিচিত বাংলাদেশি। সাকিবের সাথে বহুদিন দেখা নাই।

বিকেল হয়ে গেছে। রোজা রাখার কারণে ইফতারের প্রস্তুতি নিতে হবে। সাকিবসহ বাইরে এলাম। হোটেলের সামনেই মুসলিম কমিউনিটি। এখানে কয়েকটি মুসলিম

পরিচালিত খাবার হোটেল। এই এরিয়াতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন হোটেল-রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে। চাইলে বাংলাদেশি টাকায় থাকা-খাওয়ার বিল পরিশোধ করা যায়। অনেক মানুষ মাসের পর মাস এখানে হোটেলে বসবাস করছে। তাদের বেশিরভাগই ইউরোপসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে যাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে। দালাল চক্রের মাধ্যমে বহু টাকা খরচ করে কেউ সর্বস্বান্ত, কেউ বা ভাগ্যের ফেরে কাঙ্ক্ষিত ভিসা পেয়ে অজানা পথে পাড়ি জমানোর অপেক্ষায়।

থামেলে প্রতি রোজার মাসে প্রতিদিন মুসলিম কমিউনিটির উদ্যোগে ইফতারের আয়োজন করা হয়। ইফতারের আগে খোলা আকাশের নিচে মাদুর বিছিয়ে প্লেটে খাবার সাজিয়ে রাখা হয়। রোজাদারগণ কাতারে বসে ইফতার করে। ইফতার শেষে পাশের মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা। ইফতার শেষে পরিচিত বন্ধুরা আড্ডা দিলাম। শেষ রাতে সাহ্‌রি খেয়ে ঘুমাতে গেলাম।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় সকালবেলায় কাঠমাণ্ডু থেকে লুকলা যাওয়ার ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেছে। অলস দিন পার করে ভোররাতে কাঠমাণ্ডু থেকে বাগমতী প্রদেশের রামেছাপ জেলার সদর দপ্তর মন্থালির উদ্দেশে যাত্রা করে ভোরবেলায় রামেছাপ বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি আবহাওয়া খারাপ। দুপুর পর্যন্ত কোনো ফ্লাইট যেতে পারেনি। সুতরাং বিমানবন্দর মেঘে ঢেকে গেছে। বিমান অবতরণের অবস্থায় না থাকায় বিকেলবেলায় রামেছাপ বিমানবন্দরের পাশে একটা হোমস্টেতে উঠতে হলো। আবহাওয়ার চক্করে আরও একটি দিন নষ্ট হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তামকোশি নদীর তীরে অবস্থিত এই জনপদের একটি এলাকায় পায়ে হেঁটে ঘুরে এলাম। এলাকাটি আমাদের গ্রামের সাথে কী চমৎকার সাদৃশ্যপূর্ণ! পেঁয়াজ, সরিষা, আলু, ফুলকপি আর গমের ক্ষেতের আইল ধরে বহু ক্রোশ পথ হেঁটে এলাম। সন্ধ্যায় নেপালের মোমো দিয়ে ইফতার হলো তামকোশি নদীর তীরে অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয়।

কাঠমাণ্ডু থেকে লুকলাগামী ফ্লাইটের গোলকধাঁধায় দুই দিন পার হয়ে গেল। উপায়ান্তর না পেয়ে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশা বাদ দিয়ে রামেছাপ বিমানবন্দরে গিয়েও একদিন অপেক্ষা করার পর অবশেষে মুক্তি মিলেছে। আবহাওয়ার এই বৈরী রূপ মনে করিয়ে দেয় প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের যুগে মানুষ কত অসহায়! চল্লিশ মিনিটের বিমান যাত্রা শেষে লুকলা পৌঁছে দুই ঘণ্টা ট্রেক করে ফাকদিং পৌঁছে যাত্রা বিরতি। পরদিন দুধকোশি নদীর তীর ধরে আঁকাবাঁকা পর্বতের কূল-কিনারা দিয়ে শেরপা রাজধানী নামচে বাজার। গেল বর্ষায় দুধকোশি নদী ফুঁসে উঠে আশপাশের সবকিছু প্লাবিত করেছিল। এর ফলে পাহাড় ধসে ফাকদিং থেকে নামচে বাজারের রাস্তা ধসে পড়ে। বিকল্প রাস্তা দিয়ে নামচে বাজার পৌঁছাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

এবারের অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল খুম্বু অঞ্চলে অবস্থিত লোবুচে ইস্ট পর্বত চূড়ায় আরোহণ করা। নামচে বাজার পৌঁছে অভিযানের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড়

করে ফেলেছি। নেপালের শেরপা সম্প্রদায়ের রাজধানী হিসেবে নামচে বাজারের পরিচিতি বিশ্বজোড়া। অভিযাত্রীরা এখানে এসে উচ্চতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত একদিন সময় অতিবাহিত করে থাকে। আইরিশ পাব, রেস্তোরাঁ অভিযাত্রীদের পদচারণায় মুখর। বিকেল থেকে এসব রেস্তোরাঁর ফায়ার প্লেসের চারপাশে চেয়ার পেতে আড্ডা জমে। Hungry Yak Restaurant-এ লাইভ মিউজিকের আয়োজন করা হয়। এখানে পর্বতের ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখানোর ব্যবস্থাও আছে।

দুই দিন নামচে বাজারে অতিবাহিত করার পর সেখান থেকে পাংবোচের পথে রওনা দিলাম। এখানে আমাদাবলাম পর্বতের অসাধারণ দৃশ্য পথিককে মুগ্ধ করে দেয়। পথের দু-ধারে বর্ণিল রডোডেনড্রন ফুটে আছে। ক্লান্ত পথিকের পথচলা আনন্দময় করতে রডোডেনড্রনের ফাঁকে ছোট পাখিগুলো কিচিরমিচির সুর তুলেছে। চলতি পথে হঠাৎ করে সামনে এসে দাঁড়াল মোনাল। বর্ণিল রঙ আর মাথায় ঝুঁটিওয়ালা এই মোনাল নেপালের জাতীয় পাখি। পকেট থেকে মোবাইল বের করে ছবি উঠানোর চেষ্টা করতে গেলে পাখিটা ফুরুত করে ঝাউবনে হারিয়ে গেল। টেংবোচের কাছাকাছি পৌঁছানোর সময় মেঘের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় দৃষ্টিসীমায় সাদা দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিছু সময় পর মেঘের আড়াল থেকে দূরের সবুজ পর্বতগুলো উঁকি দিচ্ছে। এ যেন রুদ্র-মেঘের লুকোচুরি খেলা। টেংবোচে মনাস্ট্রিতে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেবুচেতে মধ্যাহ্নভোজন শেষে বিকেল চারটায় পাংবোচে পৌঁছানোর সময় তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

পরদিন সকালে একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছি। গত রাতে তুষারপাতের ফলে তীব্র ঠান্ডা পড়েছে। এছাড়া আজকের গন্তব্য পথ বেশি দূরে নয়। সকাল নয়টায় হেলেদুলে ট্রেকিং শুরু করে সোমারে পৌঁছে কফি পানের জন্য একটু সময় বিরতি দিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। সোমারে পার হওয়ার পর ইমজা খোলা নদী। এই নদীর উপর ছোট একটা সাসপেনশন ব্রিজ পার হয়ে সোজা উপরে উঠতেই ডিংবোচে। দুপুর ১২:৩০ মিনিটে ডিংবোচে রিসোর্টে পৌঁছে গেছি। চমৎকার রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। রিসোর্টের জানালা থেকে পুরো ডিংবোচের প্যানোরামা দৃশ্য অবলোকন করা যায়। মাথার উপর আমাদাবলাম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে বরুনৎসে আর মাকালু পর্বতের নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কথায় আছে সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী হয়; হলোও তাই। প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যপটে নতুনত্বের মেলা চলছে। বিকেল থেকে তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। বেলা বাড়ার সাথে সাথে তুষারের তীব্রতাও বেড়েছে। সন্ধ্যার আঁধারে তুষারতলে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে রইলাম। এমন সুন্দর দৃশ্য এক জীবনে খুব কমই দেখা যায়। এই সৌন্দর্যের উৎস কোথায় কেউ জানে না।

ডিংবোচে রিসোর্টের মালিক পাসাং পূর্বপরিচিত। পর্যটন মৌসুম বলে অনেক ব্যস্ত সময় যাচ্ছে। ব্যস্ততার মাঝেও পাসাং দাই তার রিসোর্টের বর্ধিতাংশ ঘুরে ঘুরে

দেখালেন। কফি পানের ফাঁকে আমার অভিযান পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা হলো। প্রয়োজনীয় ক্লাইম্বিং গিয়ার (পর্বতারোহণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী) এর জোগান দিতে পাসাং দাইকে অনুরোধ করলে তিনি দ্রুত সময়ে তার ব্যবস্থা করে দেন। রাতের খাবার শেষে লোবুচে অভিযানের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হলাম। পর্বতারোহণের জন্য প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সরঞ্জামাদি পরখ করে ক্লাইম্বিং শেরপার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হলো সকাল ৭টার মধ্যে লোবুচে হাইক্যাম্পের উদ্দেশে ডিংবোচে ত্যাগ করব। ভোর পাঁচটায় যথারীতি ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ শেষে হাইক্যাম্পের উদ্দেশে বেরিয়ে এলাম। গত রাতের তুষারপাতের ফলে প্রচুর বরফ জমেছে রাস্তায়। যেকোনো সময় আবার তুষারপাত শুরু হয়ে যাবে। তাই দ্রুত পা চালিয়ে যতটা সম্ভব আগেবাগে ক্যাম্পে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। থুকলা থেকে বাম দিকের রাস্তা ধরে বেসক্যাম্পে পৌঁছানোর সাথে সাথে আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেল। হাইক্যাম্প আরও দুই ঘণ্টার দূরত্বে খাড়া উপরে উঠে গেছে। তুষারপাতের ফলে জমা নতুন বরফের কারণে চলার পথ পিচ্ছিল হয়ে গেছে। পা চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে চিৎপটাং হওয়ার সমুহ সম্ভাবনা। চলতি পথ তুষারে ঢেকে গেছে। নরম বরফে পাথরগুলো ঢেকে যাওয়ার কারণে পথের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ফলে চলার গতিতে ছন্দপতন হলো। তুষারপাত মাথায় নিয়ে পাঁচ ঘণ্টার বিরতিহীন ট্রেকিং শেষে হাইক্যাম্পে পৌঁছে দুপুরের আহার শেষে তাঁবুতে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তুষারপাত থামার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

রাতের খাবারের সময় ডাইনিং তাঁবুতে বসে শেরপার সাথে সামিট পুশের বিষয়ে আলোচনা চলছে। এখানে এসে আরও কয়েকজন অভিযাত্রীর সাথে আলাপ হলো। আজ রাতেই আমরা চূড়ান্ত আরোহণের জন্য বের হব। বৈশাখী পূর্ণিমার আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। তুষারের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে হাইক্যাম্পের চারপাশ ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। সাদা বরফের উপর চাঁদের আলোর প্রতিবিম্ব চোখের প্রশান্তি এনে দেয়। তাঁবুতে প্রবেশ করে কিছু সময় বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। রাত ১টার সময় ঘুম থেকে উঠে হালকা নাস্তা খেয়ে সামিট পুশের জন্য তৈরি হলাম।

তাঁবুর চেইন খুলতেই দমকা বাতাস এসে গায়ে লাগল। তুষারপাত এখনো থামেনি। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে আইসবুটের ফিতা বাঁধতে গিয়ে হাত জমে যাওয়ার দশা। ব্যাকপ্যাকে দুই লিটার গরম পানি আর চকলেট নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। হেডলাইটের আলোয় পথ চলছি। দলে দলে অভিযাত্রীরা বেরিয়ে এসেছে। সবাই আজ এক মোহনায় দাঁড়িয়ে একই গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছি। হেডলাইটের আলো দূর থেকে জোনাকি পোকার মতো মনে হয়। তুষারের নিচে ফিক্সড রোপ (পাথরের ওয়ালে বেঁধে রাখা দড়ি) ঢেকে গেছে। নতুন বরফের কারণে পথও পিচ্ছিল হয়ে গেছে বলে চলার গতি ধীর হয়ে রিজ লাইনে জ্যাম বেধে গেছে। ভোর ৪টায় ক্রাম্পন পয়েন্টে এসে গরম পানি পান করে ক্রাম্পন (বরফে হাঁটার জন্য আইসবুটের তলায় পরিহিত সুঁচালো লোহার গ্রিপ) পরে জুমারের সাহায্যে বরফের ওয়াল বেয়ে উপরে আরোহণ করছি। বৈশাখী চাঁদ পর্বতের আড়ালে ডুবে গেল। ধীরে ধীরে

সকাল হলো। পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের ঝলকানি। দূরে নীলাভ লেক দেখা যায়। খুম্বু হিমবাহের বরফের পিলারগুলো দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্টের চূড়াটা চোখের সামনে। এত আনন্দ আয়োজন চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এসব দেখে পরিতৃপ্ত চিত্তে আরোহণ করছি। একটা সময় এসে পথের সমাপ্তি হয়ে গেল।

‘‘পথের দেবতা প্রসন্ন হেসে বলে — মূর্খ, পথ তো তোমার শেষ হয়নি। দিন-রাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মৃত্যু পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়।’’

সামনে একটা বরফের ফাটল। এই ফাটলের কাছে একটা ছোট জায়গা থেকে লাইন ধরে দড়ি বেয়ে রিজ লাইনে পৌঁছে একশত পঞ্চাশ মিটার সামনে এগোলেই লোবুচে ইস্ট পর্বতের চূড়া। বরফের ফাটলের কাছে এই ছোট জায়গা দিয়ে একই দড়িতে ওঠা-নামার ফলে মানবজট বেধে গেছে। জ্যাম এড়াতে আমি একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। ভিড় কিছুটা কমলে জুমারিং করে রিজ লাইনে পৌঁছে গেলাম। চৈত্র সংক্রান্তির সেই দিনে চমৎকার রোদ ছিল তখন। ধীরে ধীরে চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। চূড়ায় তিব্বতি ভাষায় লেখা প্রার্থনা সম্বলিত পতাকা গেঁথে রাখা। ১৩ এপ্রিল নেপালের স্থানীয় সময় সকাল ৮:৩০ মিনিটে লোবুচে ইস্ট পর্বত চূড়ায় বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার সাথে ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ফিলিস্তিনের পতাকা তুলে ধরেছি।

লোবুচে ইস্ট পর্বতের চূড়ায় কিছু সময় অতিবাহিত করে ফটাফট চারপাশের দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছি। চূড়ায় দাওয়া তামাং শেরপা আর আমি ছাড়া কেউ নেই। রিজলাইনে কয়েকজন অভিযাত্রী দেখা যাচ্ছে। তাদের আসার আগে আমাকে নেমে যেতে হবে। সামনে বহু পথ বাকি। তাই, ‘‘পথের দেবতা প্রসন্ন হেসে বলে — মূর্খ, পথ তো তোমার শেষ হয়নি। দিন-রাত্রি পার হয়ে, জন্ম-মৃত্যু পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়।’’

সে পথের বিচিত্র আনন্দযাত্রার অদৃশ্য তিলক ললাটে পরে গৃহত্যাগ করেছিলাম। চল এগিয়ে যাই।

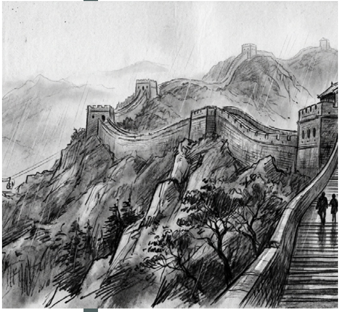

চীন ॥ পাহাড় ঝুঁকে পড়ে পদচিহ্নতলে

জেসমিন মুন্নী

চীনের নাম উচ্চারণ করলেই প্রথম যে ছবিটি চোখে ভেসে ওঠে, মেঘে মোড়া পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা পাথরের সর্পিল এক দেয়াল, চীনের মহাপ্রাচীর। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল এই বিস্ময়কে নিজের চোখে দেখা। অবশেষে গুয়াংজুতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্যানটন ফেয়ারে বায়ার হিসেবে অংশ নিতে স্বামীসহ চায়না ভ্রমণ। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা থেকে গুয়াংজু, তারপর বেইজিং ভ্রমণ শেষে সাংহাই হয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য ক্যানটন ফেয়ার।

গুয়াংজু পৌঁছেই দেখি আর্দ্র সকালটা তখনও পুরোপুরি জেগে ওঠেনি। রৌদ্রোজ্জ্বল সেই সকাল যেন দিনের মুখে প্রথম হাসি এনে দিয়েছে। ঠিক সেই সময়ই আমরা রওনা দিলাম চায়না ডোমেস্টিক টার্মিনালের পথে। গুয়াংজু এয়ারপোর্ট স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য বিস্ময়। ভেতরে ঢুকতেই শোয়েব যেন দিক হারিয়ে ফেলল! যদিও আমাদের হাতে প্রচুর সময় ছিল, তবুও বিশাল এয়ারপোর্টের ভেতর দিক-নির্দেশনা বুঝে চলা কষ্টসাধ্য।

শোয়েব ট্রিপ ডটকমের গোল্ড মেম্বার হওয়ায় লাউঞ্জের অ্যাক্সেস পেয়েছিল, তাই ভাবলাম সেখানে গিয়ে নাস্তা করে ইমিগ্রেশনে যাব। শেষমেশ অনেক খুঁজে লাউঞ্জটি পেয়ে ঢুকতেই মাথায় হাত! সব খাবারই পিগ মিট দিয়ে তৈরি। ভাবলাম শুকনো ফল আর বিস্কুট দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব, সঙ্গে এক কাপ ব্ল্যাক কফি। শোয়েবের অবশ্য চা ছাড়া চলে না। ঠিক তখনই রিসেপশনে বসে থাকা মহিলা

আমাদের অবস্থা বুঝে গরম গরম ভেজিটেবল ডিম সাম এনে দিলেন। আহা, একেই বলে সত্যিকারের ভিআইপি ট্রিটমেন্ট!

গুয়াংজু থেকে বেইজিং তিন ঘণ্টার আকাশযাত্রা, মনে হচ্ছিল আমি সময়ের এক দীর্ঘ সেতু পেরোচ্ছি। আবহাওয়া আকাশ পাতাল পার্থক্য। ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখলাম বেইজিংয়ে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আকাশে মেঘের আস্তর, মাঝে মাঝে সূর্যের ক্ষীণ রশ্মি ফাঁক গলে উঁকি দিচ্ছে। নিচে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘের সাদা ঢেউ নরম তুলার মতো বিছানো, প্রকৃতি নিজেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাসের দিকে।

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির কারণে বেইজিং-এর আকাশে নামার সময় মনে হচ্ছিল আমাদের প্লেন যেন কোনো ব্ল্যাক হোলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে শুধুই কালো অন্ধকার— এক অজানা গহ্বরের ভেতর দিয়ে আমরা নেমে আসছি। হঠাৎ সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করে যখন প্লেন নিচে নামল, মনে হলো যেন সাগরের ওপর ল্যান্ড করছে। বৃষ্টির মৌসুম না হলেও জলবায়ুর প্রভাবে এমন প্রবল বর্ষণ যে পুরো এয়ারপোর্ট এলাকা পানি জমে টইটুম্বুর হয়ে উঠেছিল। এই বৃষ্টিভেজা বিশৃঙ্খলার মাঝেও প্লেনের নিরাপদ অবতরণ যেন সত্যিই স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দিল।

বেইজিংয়ে তখনও হালকা বৃষ্টি ঝরছে। শরীরে ঠান্ডা হাওয়ার শিহরণ। এয়ারপোর্টে গরম কফি খেয়ে কিছুটা সতেজ হয়ে আমরা ডিডি কল করলাম। হোটেল পৌঁছে একদম জমে যাচ্ছিলাম।

পরদিন সকালে ডিডি চেপে যাত্রা শুরু হলো, জানালার পাশে বসে আমি দেখছিলাম ধীরে ধীরে শহর থেকে পাহাড়ের দিকে যাত্রা। শহরের কোলাহল পিছনে ফেলে প্রকৃতি যেন ক্রমে নিজের রূপ খুলে ধরছে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে দূর থেকে প্রথম দেখা মিলল সেই কিংবদন্তির প্রাচীরের— ধূসর পাথরের দেহ, বৃষ্টির কোলে মাথা রেখে ঝিমাচ্ছে, যেন ইতিহাসের দীর্ঘ নিঃশ্বাস!

মহাপ্রাচীরঃ মেঘ, বৃষ্টি আর ইতিহাসের বুকে এক স্বপ্নযাত্রা

বেইজিং থেকে প্রায় ৭৩ কিলোমিটার দূরে গ্রেট ওয়ালের এই অংশে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগেছিল, আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে। মূলত এই অংশটি Mutianyu Great Wall সম্পূর্ণভাবে পুনরুদ্ধার করা এবং তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হওয়ায় আমরা এটিকেই বেছে নিয়েছিলাম। এখানে সারি সারি ওয়াচ টাওয়ার আর ছোট ছোট দুর্গ যেন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মুতিয়ান্যুতে ক্যাবল কার, টবোগান রাইডের পাশাপাশি হাইকিংয়েরও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। ডিডি আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিলে দেখি, পর্যটকরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাদের সঙ্গে পা মেলালাম। ঠিক তখনই বৃষ্টি আরও ঘন হয়ে এলো, সঙ্গে তীব্র ঠান্ডা। চারপাশে কিছু স্থানীয় বিক্রেতা নানা জিনিস সাজিয়ে

বসেছে। আমরা দুটো রেইনকোট আর একটি উলের জ্যাকেট কিনলাম। শীতের পোশাক পরেও যেন ঠান্ডা কাঁপিয়ে দিচ্ছিল।

এরপর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বাসে উঠলাম ক্যাবল কার স্টেশনের দিকে যাওয়ার জন্য। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে বাস এগোতে লাগল। জানালার কাঁচের বৃষ্টির ফোঁটা আর কুয়াশার আস্তরণ মিলে বাইরের দৃশ্যটাকে করে তুলেছিল একেবারে স্বপ্নময়। পাহাড়ের ঢালে ঢালে মেঘের ধোঁয়া ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল, প্রকৃতি নিজেই যেন তার প্রাচীন, রহস্যময় রাজ্যে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

একপর্যায়ে বাস থেকে নেমে আমরা যেন কিছুটা স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন পথে এগোবো, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষে বুদ্ধি করে দেখলাম, যেদিকে মানুষের ভিড় বেশি— সেদিকেই সবাই এগোচ্ছে। আমরাও সেই পথেই হাঁটা ধরলাম। বাঙালিরা যেমন ভিড়ের দিকেই স্বস্তি খুঁজে পায়, আমরাও তার ব্যতিক্রম নই।

পাহাড়ি পথটি পাথর দিয়ে সুন্দরভাবে বাঁধানো ছিল, কিন্তু উঠতে উঠতে নিঃশ্বাস যেন ভারী হয়ে আসছিল। প্রতিটি ধাপ যেন শরীরের সঙ্গে এক অদ্ভুত লড়াই। কিছুদূর এগোতেই আবার ক্যাবল কারের জন্য টিকিট কাটতে হলো। এখান থেকেই আমাদের উপরের পথে যাত্রা শুরু হবে।

ক্যাবল কারে বসে যখন ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলাম, নিচের দিকে তাকাতেই চোখজুড়ে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল। চারপাশে সবুজ পাহাড়, তার মাঝে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মেঘে মোড়া উপত্যকা। সব মিলিয়ে এক স্বপ্নময় আবহ। আর দূরে, ধূসর এক রেখার মতো দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত Great Wall of China বা মহাপ্রাচীর। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন বাস্তব পৃথিবী ছেড়ে কোনো রূপকথার রাজ্যে এসে পড়েছি।

ট্যুর গাইডের কাছে প্রাচীরের ইতিহাস শুনতে শুনতে মনে হলো, আমি সময়ের চক্রে পিছিয়ে যাচ্ছি। উপরে পৌঁছে প্রাচীরের পাথরে পা রাখতেই যেন এক অদ্ভুত কম্পন ছড়িয়ে গেল অন্তরে। চীন সম্রাট শি হুয়াংদি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেন উত্তর দিকের যাযাবর জাতির আক্রমণ ঠেকাতে। পরবর্তীতে হান, সুই ও মিং রাজবংশ এই প্রাচীরকে আরও শক্ত ও দীর্ঘ করে তোলে। প্রায় ২১,০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত এই স্থাপত্য বিশ্বের ইতিহাসে মানুষের শ্রম ও প্রজ্ঞার এক অনন্য উদাহরণ।

আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন আজ সত্যি হলো। বৃষ্টিভেজা গ্রেট ওয়ালের পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো, স্বপ্নগুলো যদি সত্যি বিশ্বাস করা যায়, তবে একদিন পাহাড়ও ঝুঁকে পড়ে আমাদের পদচিহ্নের নিচে।

আমরা হাত ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিলাম। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে, কিন্তু বাতাসে মেঘের সোঁদা গন্ধ। চারপাশে শুধু পাহাড় আর ধূসর পাথরের বাঁকানো পথ যেন সময়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। আমার স্বামী বললেন, দেখো, এই দেয়ালটাই

একসময় ছিল সীমান্ত যেখানে ভয়, যুদ্ধ আর সাহস একসঙ্গে বাস করত। আমি চুপ করে মাথা তুললাম, দূরে প্রাচীরের গায়ে সূর্যের আলো ঝলমল করছে, মনে হলো ইতিহাসের বুকের উপর আলো পড়ছে নতুন ভোরের মতো।

১০ অক্টোবর। আজকের দিনটা ছিল স্পেশাল। শোয়েবের জন্মদিন। গ্রেট ওয়ালের প্রাচীরে দাঁড়িয়ে শুভ জন্মদিন বলাটা ছিল এক অদ্ভুত, অচেনা উচ্ছ্বাস। বাতাসে মিশে ছিল মেঘ, বৃষ্টির ফোঁটায় ছিল ভয়। আজ এই দূরদেশে দাঁড়িয়ে মনে হলো আমাদের উপস্থিতিই তো এমন অসম্ভব মুহূর্তকে সম্ভব করে তুলেছে। পরিচয়ের সেই প্রথম দিনের মতোই আজও বলতে চাই, ভালোবাসি প্রিয়। প্রতি বছর, পৃথিবীর নতুন কোনো কোণে দাঁড়িয়ে, তোমাকে শুভ জন্মদিন জানাব—একই ভালোবাসায়, নতুন আকাশের নিচে।

আবেগ সামলে প্রাচীরের পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম, মনে হলো প্রতিটি ধাপ যেন একেকটি ইতিহাসের অধ্যায়। Great Wall of China-এর নিচে পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটি আমার চোখে পড়ে, তা হলো পাথুরে রাস্তা। রাস্তা যেন সময়ের সাক্ষী হয়ে নীরবে পড়ে আছে। ছোট-বড় অসমান পাথর দিয়ে তৈরি এই পথটি হাঁটার সময় আলাদা অনুভূতি দেয়। পায়ের নিচে শক্ত পাথরের খসখসে স্পর্শ টের পাই। কোথাও পাথরগুলো মসৃণ হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য মানুষের পদচারণায় বছরের পর বছর ঘষে পালিশ লেগেছে। আবার কোথাও ভাঙাচোরা, উঁচুনিচু, সতর্ক হয়ে হাঁটতে হয়। বৃষ্টির কারণে পিচ্ছিল। অসাবধান হলেই কোমর কিংবা পা ভাঙবে। আবহাওয়ার কারণে পর্যটকের বাড়তি ঝামেলা নেই। আমাদের মতোই ব্রাজিলিয়ান এক কাপল ছবি তুলছিল। সুযোগ বুঝে আমরাও তাদের দিয়ে জোড়া ছবি তুলিয়ে নিলাম, তাদেরও তুলে দিলাম।

এই পাথুরে পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, আমিও যেন ইতিহাসের এক অংশ হয়ে যাচ্ছি। কত শত বছর আগে এই পথ দিয়েই হয়তো সৈন্যরা হেঁটেছে, প্রহরীরা গেছে তাদের দায়িত্বে। সেই পুরনো সময়ের প্রতিধ্বনি যেন এখনও এই পথের মধ্যে লুকিয়ে আছে। বাতাসে ঠান্ডা শিহরণ, চারদিকে পাহাড় আর নীলচে কুয়াশার ছায়া। উপরে উঠতে উঠতে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলেও মনে হচ্ছিল আমি যেন এক অজানা গর্বে ভরে উঠছি।

শোয়েব পাশে হাসিমুখে বলল, ভাবতে পারো, দু'হাজার বছর আগেও মানুষ এতো দূরদৃষ্টি ও শক্তি নিয়ে এমন এক মহাকীর্তি গড়েছিল? আমি কিছু বলিনি, শুধু মাথা নেড়ে হেসেছিলাম। কারণ সেই মুহূর্তে ভাষার দরকার ছিল না। ইতিহাস, প্রকৃতি ও মানব-অধ্যবসায়ের মিলনে যে আবেগ তৈরি হয়, তা শুধু হৃদয়ে অনুভব করা যায়।

Great Wall of China-এ ঠিক কতটি ওয়াচ টাওয়ার (প্রহরী টাওয়ার) আছে, তার নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা কঠিন। কারণ পুরো প্রাচীরটি হাজার হাজার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, এবং বিভিন্ন সময় ও রাজবংশে এটি নির্মিত হয়েছে। তবে ধারণা করা হয়, পুরো প্রাচীরজুড়ে কয়েক হাজার ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে। বিশেষ করে Ming

Dynasty-এর সময় নির্মিত অংশগুলোতে বেশি সংখ্যক টাওয়ার দেখা যায়। এই টাওয়ারগুলো সৈন্যদের পাহারা দেওয়া, সংকেত পাঠানো এবং বিশ্রামের জন্য ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে পর্যটকদের জন্য পুরো প্রাচীর খোলা নয়। কিছু নির্দিষ্ট অংশ যেমন বাদালিং, মুতিয়ানইউ, জিনশানলিং ইত্যাদি জায়গায় পর্যটকরা সহজে উঠতে পারেন। এসব এলাকায় সাধারণত কয়েকটি থেকে ১০–১৫টি টাওয়ার পর্যন্ত নিরাপদভাবে ওঠা যায়। আমরা মাত্র ৩টি টাওয়ারে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলাম মানে সাহস করেছিলাম। প্রতিটি টাওয়ার থেকে চারপাশের দৃশ্য আলাদা লাগে। পাহাড়ের পর পাহাড় আর তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রাচীর সত্যিই অপূর্ব।

উঁচু প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখি পাহাড়ের চূড়া থেকে চূড়ায় বেঁকেবেঁকে চলে গেছে পাথরের রেখা, যত দূর চোখ যায় তত দূর পর্যন্ত। সূর্য ধীরে ধীরে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেবার চেষ্টা করছে, প্রাচীরের পাথরে লেগে আছে বটলগ্রিন আলো।

মনে হলো, এই দেয়াল কেবল এক সামরিক প্রতিরক্ষা নয়— এ এক অমর প্রতীক, যেখানে মানবজাতি সময়, ভয় আর অসম্ভবকে জয় করেছে।

সূর্য ধীরে ধীরে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেবার চেষ্টা করছে, প্রাচীরের পাথরে লেগে আছে বটলগ্রিন আলো।

নিচে নামার সময় আবার ক্যাবল কারে বসে শেষবারের মতো চারপাশের দৃশ্য দেখছিলাম। মেঘের নিচে হারিয়ে যাওয়া প্রাচীর, দূরের পাহাড়, আর বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তটিই চিরকাল মনে রাখতে চাই।

ফেরার পথে ডিডিতে জানালায় মুখ ঠেকিয়ে আমি ভাবছিলাম— চীনের মহাপ্রাচীর কেবল এক স্থাপত্য নয়, এটি মানুষের অধ্যবসায়, ঐক্য আর সময়কে জয় করার প্রতীক। নিঃশব্দে গুছিয়ে নিচ্ছে রাতের প্রস্তুতি। আমার মনে হলো, চীন কেবল এক দেশ নয়— এ এক চলমান কাব্য, যেখানে আধুনিকতা ও ঐতিহ্য একসাথে হাঁটে হাতে হাত রেখে।

এই ভ্রমণ আমাকে শিখিয়েছে— বিশ্ব অনেক বড়, আর প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি শহর নিজের গল্প বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে। চীনের সেই রঙিন, শৃঙ্খল আর পরিশ্রমী জীবনের ছোঁয়া আমার মনে এক অমলিন স্মৃতি হয়ে রইল।

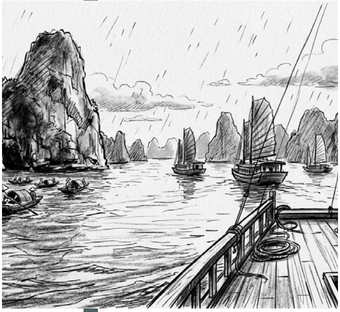

হ্যা লং বে

ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্

২০১৯ সালের ২ অক্টোবর রাতে ঢাকা থেকে ব্যাংকক হয়ে ভিয়েতনাম যাই। ৩ অক্টোবর ২০১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের লার্নিং রিসোর্স সেন্টার (Learning Resources Center) - থাই নগুয়েন ইউনিভার্সিটি (Thai Nguyen University), তান থিন ওয়ার্ড (Tan Thinh Ward), থাই নগুয়েন সিটি (Thai Nguyen City)- তে সেমিনার শেষে ৪ তারিখ আমরা ভিয়েতনামের পুরাতন রাজধানী হ্যানয়ে ফিরে আসি। হ্যানয় থেকে থাই নগুয়েন সিটির দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার যা দেশটির উত্তরে চীন সীমান্তের কাছে। আমরা বাংলাদেশি ৪ জনসহ ভিয়েতনামের ৩ জনন এর জন্য কর্তৃপক্ষ একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে দেয় হ্যানয় গমনের জন্য। আমরা পুরনো হ্যানয়ের একটি হোটেল খুঁজে তাতে উঠে পড়ি, রুমপ্রতি ভাড়া ১৭ ডলার। বিকেলে হোটেল ম্যানেজারের সহায়তায় জনপ্রতি ৩৮ ডলার দিয়ে সারাদিন (৫ অক্টোবর) হ্যা লং বে পরিদর্শনের প্যাকেজ কিনি।

হ্যানয় থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে ভিয়েতনামের উত্তর-পূর্বে হ্যা লং বে। সকাল ৯ টায় নির্ধারিত স্থান থেকে ট্যুর অপারেটর কোম্পানির মাইক্রোবাসে/কোস্টারে উঠি। প্রশস্ত বাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে তকতকে। আমাদের আগে আরও কয়েকজন উঠেছে। নানা অলিগলি থেকে

আরও কয়েকজন বাসে ওঠার পর সেটি হ্যানয় শহর পার হলো। এরপর দীর্ঘ ও প্রশস্ত রেড রিভার (Red River)। নদীটি নির্মলভাবে কলকল রবে বয়ে চলছে। খুব দূষিত বলে মনে হলো না। সেতুটি দীর্ঘ, সেতুর নিচে নানা ঘাস, উদ্ভিদ, লতাপাতা—একদম প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রকৃতিকে স্বাভাবিক থাকতে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। একটি বড় শহরের পাশে এমন নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকটা বিরল। আর বাংলাদেশে তো এমন দৃশ্য কল্পনাই করা যায় না।

দীর্ঘ সেতু পার হয়ে বাস একটি গোলাকার চত্বর পার হয়ে উত্তর-পূর্ব হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল। এখানে একটি পরিকল্পিত উপশহর গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে রয়েছে অনেকগুলো সুউচ্চ ভবন। বাসের স্বচ্ছ জানালা দিয়ে বাইরের গ্রামীণ ভিয়েতনামের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। আমেরিকার সাথে দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর পুরো ভিয়েতনাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেখান থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে যার পিছনে রয়েছে তাদের চরম কর্মনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও নিয়মানুবর্তিতা।

ঘণ্টা তিনেক পর আমরা হ্যা লং বে এলাকায় পৌঁছলাম। এখানে কায়দা করে আমাদের একটি প্রাকৃতিক মুক্তা চাষ প্রকল্প দর্শনের জন্য নামিয়ে দেওয়া হলো। হ্যা লং বে-র প্রাকৃতিক জল সুবিধাকে ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা চাষ করা হয়। এরপর প্রক্রিয়াজাত মুক্তা বিক্রির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা প্রকল্প এলাকাটি ঘুরে দেখলাম। প্রদর্শনের দারুণ শৈল্পিক আয়োজন। কর্মীরা প্রশিক্ষিত ও পেশাদার। তারা নানাভাবে আমাদের মুক্তা কিনতে প্রলুব্ধ করছে। দলের অন্য দেশের ২/১ জন কিনলেও আমরা বাংলাদেশিরা দূরে রইলাম। শুধু পছন্দ বা কেনার ইচ্ছে নয়—অর্থও একটি বড় বিষয়।

দুপুর ১টা নাগাদ আমরা হ্যা লং বে-র মূল বন্দরে প্রবেশ করলাম। এ এক মিলনমেলা, তাও বিদেশিদের। রয়েছে নানা পণ্যের পসরা। আমাদের গাইড নৌবন্দরে প্রবেশের জন্য একটি করে টিকিট ধরিয়ে দিল। সেই টিকিট পাঞ্চ করে আমরা আমাদের নির্ধারিত বোটে চড়লাম।

হ্যা লং উপসাগর (Ha Long Bay) উত্তর ভিয়েতনামের কুয়াং নিন (Quang Ninh) প্রদেশে অবস্থিত। এটি টনকিং উপসাগরের (Gulf of Tonkin) উত্তর উপকূলে অবস্থিত। হ্যা লং শহরের নামেই হ্যা লং (Hong Gai) উপসাগর। Ha Long Bay lies in the northwestern region of Southeast Asia, bordering Cat Ba Island to the west and Bai Tu Long Bay to the northeast.

উপসাগরটির আয়তন ১৫৫৩ বর্গকিলোমিটার। এর স্বচ্ছ নীল পানিতে রয়েছে নানা ধরনের চুনাপাথর, যা এর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। চুনাপাথরের তৈরি

প্রায় ২,০০০-এর বেশি ছোট-বড় দ্বীপ/টিলা রয়েছে। অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস সবচেয়ে ভালো দেখা যায়, তবে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির ঝুঁকি থাকে।

হ্যা লং বে ভিয়েতনামের একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র ও ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ১৯৯৪ সালে এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পান্না-সবুজ জলরাশি এবং চুনাপাথরের হাজারো দ্বীপ ও গুহার জন্য পরিচিত স্থানটি 'ডেন্ডিং ড্রাগন' নামেও পরিচিত। এখানে ক্রুজ ভ্রমণ, কায়াকিং এবং ভাসমান গ্রাম দেখার ব্যবস্থা। ভিয়েতনামের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এটি বিশ্বের বুকে জনপ্রিয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক অলৌকিক সৌন্দর্যের দ্বীপ হলো ভিয়েতনামের হ্যা লং বে (Ha Long Bay)। পাহাড় আর সমুদ্রের অপরূপ এক সন্ধি ঘটেছে এখানে।

আমাদের ভ্রমণ দলে বাংলাদেশ, ভারত, কম্বোডিয়া, ইসরায়েল, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশের ২০/২২ জন। বোট ছাড়তেই আমাদের লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানানো হলো। টেবিলে খাবার দেওয়া আছে—নুডলস, পটেটো ফ্রাই, সামান্য রাইস, সস, চিকেন ইত্যাদি। সেসব কোনো রকমে খেয়ে বিপদে পড়লাম পানি নিয়ে। টেবিলে কোনো পানি নেই কিন্তু দেওয়া হয়েছে এক পেগ মদ। হ্যাঁ, ভুল নয়, মদ!

বোটের লোক ও গাইডকে ডেকে ওটা বাদ দিয়ে মিনারেল ওয়াটার দিতে বললাম। ওরা অপারগতা প্রকাশ করল। অফিশিয়াল মেন্যুর বাইরে ওদের কিছু করার নেই। পানি কিনে খেতে হবে—এটাই হলো সমাধান। বাংলাদেশ দলের ৪ জনের মধ্যে ২ জন মদ্যপান করেন, ২ জন করেন না। সমাধান হিসেবে ভাবলাম, এক বোতল করে পানি দিলে আমরা মদের পেগ বিনিময় করতে পারি। অন্যথায় আমাদের প্রাপ্ত মদ্য হ্যা লং বে-র জলে ফেলে দিয়ে বোতলের জল কিনে খাব। অনেক গড়িমসি করে তারা বোতলজাত পানির বদলে বিনিময়ে রাজি হলো; এতেও তাদের লাভ। কারণ পানি এখানে আক্রা। সাধারণ দোকানে পানির দাম ২০ হাজার ডং বোতল, এখানে ৪০ হাজার ডং। ভিয়েতনামের মুদ্রা মান এত কম যে, ২০ হাজার ডং-এর কমে কিছু পাওয়া যায় না।

আমাদের বোট হ্যা লং বে-র নীল জলে সাঁতার দিল। আমরা বোটের ছাদে উঠে বসলাম। এখানে পরস্পর পরিচয় করলাম। বোটের ছাদটি খুবই সুন্দর। ছাদ জুড়ে কৃত্রিম ঘাসের টার্ফ, বসার কিছু চেয়ার, বেশ কিছু গাছের টব এবং একটি বড় মাস্তুল। আমাদের বোটের নামটিও খুব সুন্দর—New World 99|

মনে করা হয়, চুনাপাথরের দ্বারা সৃষ্ট হ্যা লং বে-র পাহাড়গুলো প্রায় ৫০ কোটি বছর আগের। উপসাগরে কিছুদূর পর পর এসব চুনাপাথরের অসংখ্য পাহাড় বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। হা লং বে-তে রয়েছে ১৯২৮টি দ্বীপ/পাহাড় বা টিলা। তবে বড় দ্বীপ

রয়েছে মাত্র দুটি। এখানে রয়েছে প্রায় ১৪ প্রজাতির ফুল, ২০০ প্রজাতির মাছ, মোলাস্কা পর্বভুক্ত ৪৫০ ধরনের প্রাণী। এখানে চারটি ভাসমান গ্রামও রয়েছে। এসব গ্রামের প্রায় সবাই মৎস্যজীবী।

বোটের ছাদে বসে আমাদের ভিয়েতনামী গাইড শোনাল হ্যা লং বে নামকরণের প্রচলিত লোককথা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ড্রাগন একটি পূজনীয় প্রাণী। ভিয়েতনামী শব্দ 'হ্যা লং' অর্থ 'ভূমিতে নেমে আসা ড্রাগন'। ভিয়েতনামবাসীরা এই উপসাগরকে ভিন হ্যা লং নামে ডাকে। হ্যা লং বে-কে নিয়ে স্থানীয় একটি প্রবাদও চালু আছে— ভিয়েতনামবাসীরা যখন দেশের উন্নয়নে কাজ শুরু করেছে তখন দস্যুদের সাথে তাদের প্রায় সময় যুদ্ধ বাঁধে। দস্যুদের থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সে সময় ঈশ্বর রক্ষাকর্তা হিসেবে একটি ড্রাগন পরিবারকে পাঠায়। ড্রাগনদের মুখের থু থু থেকে মণি-মানিক নির্গত হয়ে সাগরে পড়ে। মুক্তাগুলো সাগরে ছড়িয়ে যায় আর পাথরগুলো পরস্পর একত্রিত হয়ে দস্যুদের প্রতিরক্ষা দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। যখন দস্যুদের জাহাজ হ্যা লং আক্রমণ করতে আসে তখন জাদুকরী পাহাড়গুলো এবং অন্য পাহাড়কে পাশ কেটে যেতে গিয়ে একে অপরের সাথে ধাক্কা লেগে ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধের পরে ড্রাগনরা এই শান্তিময় স্থানে বাস করার ইচ্ছা পোষণ করে। যেখানে মা ড্রাগনরা অবতরণ করেছে, সেই স্থানের নাম হয়েছে 'হ্যা লং' আর যেখানে শিশু ড্রাগনরা মায়ের সাথে থাকত, সেই স্থানের নাম হয়েছে 'বাই তু লং দ্বীপ' ('হ্যা' অর্থ মা, 'লং' অর্থ ড্রাগন, 'বাই তু' মানে মায়ের সাথে ছেলে)। যে জায়গায় ড্রাগনরা লেজের সাহায্যে যুদ্ধ করেছে সে এলাকার নাম 'বাক লং ভি দ্বীপ' ('বাক' মানে লেজের আঘাতে সৃষ্ট সাদা ফেনা, 'ভি' মানে লেজ)।

গল্প শুনে বুঝলাম সব দেশেই রূপকথা বা মিথ প্রচলিত রয়েছে। সততার মাপকাঠিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও লোককথা ও দেশজ সংস্কৃতিতে খুবই মূল্যবান। হ্যা লং বে, উত্তর-পূর্বের বাই তু লং বে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের ক্যাট বে একই। তবে হা লং বে পুরো উপসাগরের ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক এবং গাঠনিক কাঠামোকে নির্দেশ করে। তবে এ অঞ্চলটি কেন্দ্রভাগে হওয়ায় এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সবার কাছে। উপসাগরের মূল অংশের আয়তন ৩৩৪ বর্গকিলোমিটার। আনুমানিক ৫০০ মিলিয়ন বছর আগে এসব পাথুরে দ্বীপখণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং ২০ মিলিয়ন বছর আগে থেকে আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে এর বিবর্তন শুরু হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, ১০ হাজার বছর আগে থেকে এখানে মানুষের বসবাস শুরু হয়।

আমাদের বোট প্রথমে থামল একটি পানিতে ভাসমান প্ল্যাটফর্মে। এখানে খালি পায়ে নামতে হলো। প্রত্যেককে একটি করে লাইফ জ্যাকেট পরতে হলো। এরপর চড়লাম একটি নৌকায়। প্রতি নৌকায় ৮/৯ জন চড়লাম। চালক একজন নারী।

নৌকাটি আস্তে আস্তে একটি পাহাড়ের কাছে গেল। পাহাড়ের একটি স্থানে ভিতরে প্রবেশের সামান্য সরু পথ। এটি একটি 'ওয়াটার কেভ' যার নাম Luon Cave।

আমাদের নৌকাটি অতিকষ্টে কেভের ভিতরে প্রবেশ করল, চালক সবাইকে সতর্ক করলেন। ভিতরে ঢুকে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। পাহাড়ের মাঝে একটি গোলাকার পানির বৃত্ত। পানি স্থির, তরঙ্গবিহীন। আমরা চিৎকার করলাম, শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো। কেমন যেন গা ছমছমে ভীতিকর অবস্থা। এমন জায়গা জীবনে আর দেখিনি।

লিওন ওয়াটার কেভ থেকে বের হয়ে আমাদের বোট থামল সামান্য দূরের একটি পাহাড়ে। এই পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে 'ডাও গো কেভ' (Dau Go Cave) যা এখানকার অন্যতম বড় গুহা। উনিশ শতকের দিকে ফরাসি পর্যটকরা এর নাম দিয়েছিলেন 'গ্রোট্টে ডি মারভেলেস' (Grotte des Merveilles)। তিনটি বিশাল চেম্বারে এটি বিন্যস্ত। গুহার ছাদ থেকে বিন্দু বিন্দু জল পড়ার ফলে চুনাপাথরের অসংখ্য ঝুলন্ত এবং মাটি ফুঁড়ে বের হওয়া স্তম্ভ গুহার পরিবেশকে একটি রহস্যময় পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

বোট থেকে নেমে গাইডকে অনুসরণ করে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম। গুহার ভিতরের রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করা আছে। আঁকাবাঁকা পথ, কোথাও চুনাপাথরের স্তম্ভ ঝুলে পড়েছে ওপর থেকে। সতর্ক না হলে মাথায় লাগতে পারে। প্রায় ঘণ্টাখানেক এর ভিতর দিয়ে হেঁটে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হলাম। আমাদের বোট পূর্বের ঘাট থেকে এই ঘাটে চলে এসেছে। সবাইকে গণনা করে বোট ছেড়ে দিল। আমরা ক্লান্তি দূর করতে বোটের ছাদে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম।

হঠাৎ গগনবিদারী চিৎকার শুনে সবাই সেদিকে তাকালাম। দলের ভারতীয় পর্যটক সাউট করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলছেন, Where রং সু রিভব? She is not in the boat. Maybe she is inside the cave. My wife...

বোটের সকল পর্যটক নড়েচড়ে বসল। বোট পুনরায় ঘাটে ভেড়ানো হলো। গাইড আর স্ত্রী হারানো ভারতীয় ভদ্রলোক দ্রুত চলে গেল গুহার ভিতর। আমরা সকলে দোয়া করতে লাগলাম যেন দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়। দু-একজন পর্যটক ভারতীয় ভদ্রলোককে গালিগালাজ শুরু করল—'শালা, বউ সামলাতে পারে না, আবার আসছে বিশ্বভ্রমণে?'

যাক, অল্পতেই সমস্যার সমাধান হলো। গাইডের সাথে ভদ্রলোক ফিরলেন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু গাইড ছেলেটি বলেই চলেছে— I am sorry, I have done a mistake. It was my duty...

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আমরা আবার গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা আমরা এখন সহজ ও স্বাভাবিক। ধনী-দরিদ্রের বিভেদ কেটে এখন আমরা বিশ্বপর্যটক।

বোট এগিয়ে চলল আমাদের পরবর্তী ও শেষ গন্তব্য টাই টপ দ্বীপ (Ti Top Island)। হ্যা লং বে-তে পর্যটকবাহী প্রায় সকল বোটই এখানে থামে। এখানে বালু ফেলে কৃত্রিম সৈকত বানানো হয়েছে। আমরা বোট থেকে নেমে হাঁটাচলা করে হাত-পা নাড়িয়ে নিলাম। এখানে ছোট ছোট অনেকগুলো দোকান রয়েছে। বিক্রি হচ্ছে ডাব। তবে দাম অনেক। পাহাড়ের ওপরে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার। কিন্তু সময় না থাকায় ওঠা হলো না। এবার সবাইকে ভালো করে গণনা করে বোট ছাড়ল ফেরি স্টেশনের দিকে।

স্রষ্টার এক অপরূপ সৃষ্টি এই হ্যা লং বে। শেষ বিকেলে এর সৌন্দর্য যেন ঠিকরে বের হচ্ছে। স্রোতবিহীন জলরাশিকে ছিন্ন করে কূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অনেক বোট। চুনাপাথরের একহারা গড়নের পাহাড়গুলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পানিতে পা ডুবিয়ে। অনেক হাউজবোট নোঙর করেছে সেখানে। পর্যটকরা রাত্রি যাপন করবেন তাতে, উপভোগ করবেন রাতের রহস্যময় সুধা। এই উপসাগরের ভিতর পাঁচ তারকা মানের হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে। মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী নানা প্যাকেজ নিয়ে থাকে।

বোট থামল ফেরি স্টেশনে। আমরা নির্ধারিত বাসে চড়তেই সেটি ছুটে চলল হ্যানয় শহর অভিমুখে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হলো। আমরা পৌঁছে গেলাম হ্যানয়ে, আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে। নামার আগে বারবার কানে বাজছিল গাইড ছেলেটির বিনয়ী ও অপরাধমূলক কণ্ঠস্বর— I am sorry, I have done a mistake. It was my duty...

ভদ্রতা, পেশাদারিত্ব আর বিনয়ের এক অপরূপ সমন্বয়।

মেডানের যীশু

তৌফিক রহমান

যাচ্ছি ইন্দোনেশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর মেডান। ইন্দোনেশিয়া বলতেই আমরা সাধারণত রাজধানী জাকার্তা কিংবা বালি দ্বীপের কথা ভাবি। কিন্তু মেডান যাব শুনে অনেকের মতো ঢাকাস্থ ইন্দোনেশিয়া দূতাবাসের কর্মকর্তারাও কিছুটা অবাক হলেন। জানতে চাইলেন—কেন মেডান যাচ্ছি? যখন শুনলেন বেড়াতে যাচ্ছি, তাঁরা আরও অবাক হলেন। যাই হোক, ভিসার দরখাস্ত গ্রহণ করলেও জানানো হলো ভিসা পেতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে। অবশ্য বর্তমানে এই সময় নাকি আরও বেড়েছে। বাংলাদেশিদের জন্য বিদেশ ভ্রমণ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। অল্প কিছু প্রতিবেশী দেশ ছাড়া এখন আর কোনো দেশই বাংলাদেশিদের জন্য 'অন অ্যারাইভাল' ভিসার সুবিধা দিচ্ছে না। আসলে এর জন্য আমরাই মূলত দায়ী। এক শ্রেণির অতি লোভী ট্রাভেল ও রিক্রুটিং এজেন্ট এবং তাদের দালালদের খপ্পরে পড়ে নিরীহ বাংলাদেশিরা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন, আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে সাধারণ ভিসা প্রত্যাশীদের ওপর। কোনো উন্নত দেশই এখন বাংলাদেশিদের বিশ্বাস করে ট্যুরিস্ট ভিসা দিতে চায় না। দিলেও অনেক সময় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে তবেই ভিসা দেয়। মূলত এই কারণেই আমার ভিসা পেতে বিলম্ব হয়েছে।

আমার ফ্লাইট ছিল মালয়েশিয়ার বাজেট এয়ারলাইনস 'বাটিক এয়ারে' (যার পূর্বনাম ছিল মালিন্দো এয়ার)। ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে তিন ঘণ্টার

ট্রানজিট শেষে এক ঘণ্টা দশ মিনিটের ফ্লাইটে ইন্দোনেশিয়ার মেডান। ফেরার সময়ও একই রুট। ঢাকার ট্রাভেল এজেন্টদের চেয়ে ভালো অফার পাওয়ায় আমি মেডানে অবস্থিত আমার ট্যুর অপারেটর বন্ধু উইলির শরণাপন্ন হই। ওর অফিস থেকে একই টিকিট প্রায় পনেরো হাজার টাকা কমে পাওয়ায় ওকেই টিকিট কাটতে বললাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম যে ওখানে গিয়ে টাকা দিয়ে দেব। বিদেশ ভ্রমণে এটিও এক বিরাট সমস্যা; বিদেশ থেকে টিকিট কাটলে যা দাম পড়ে, দেশ থেকে কাটলে তা প্রায় দশ-বিশ হাজার টাকা বেশি হয়। আমার কন্যার ক্ষেত্রেও দেখেছি, ও যখন কানাডা থেকে দেশে আসে, তখন ওখান থেকে টিকিট কাটলে বাংলাদেশ থেকে কাটার তুলনায় খরচ অনেক কম পড়ে।

মেডানে একটি পর্যটন মেলায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার এই যাত্রা। মেডানের স্থানীয় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন এর উদ্যোক্তা। আমার বন্ধু উইলি আবার এই সংগঠনের বড় নেতা; ওরই আমন্ত্রণ ও আগ্রহে আমার এই সফর। ইন্দোনেশিয়ায় এর আগে একবার এলেও মেডান যাওয়া হয়নি। ভাবলাম, বালির বদলে নতুন কোনো শহর দেখলে পরবর্তীতে বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছে তা তুলে ধরা যাবে। পাশাপাশি মেডান ও অন্যান্য দেশের ট্যুর অপারেটরদের সাথে বিটুবি (বিজনেস টু বিজনেস) সেশনে অংশ নেওয়া যাবে। আনন্দের বিষয় হলোড়থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন থেকে আমার পূর্বপরিচিত বেশ কয়েকজন ট্যুর অপারেটরও এই মেলায় অংশ নিতে মেডানে আসছেন। সুতরাং এটি হবে ট্যুর অপারেটরদের এক মিলনমেলা।

সর্বমোট চার রাত ও পাঁচ দিনের ভ্রমণসূচি। এর মধ্যে দুই রাত মেডানে বিটুবি সেশন ও সাইটসিয়িং শেষে বাকি দুই রাতের জন্য আমরা যাব মেডান থেকে প্রায় ৫ ঘণ্টার সড়কপথের দূরত্বে অবস্থিত সামোসির দ্বীপে। সেখানে যেতে হলে লেক টোবা থেকে এক ঘণ্টার ফেরি পার হতে হয়। দুটি বাসে আমরা প্রায় ৭০-৮০ জন বিদেশি ট্যুর অপারেটর যাচ্ছি। সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞ ট্যুর অপারেটর সিরিন লিম, থাইল্যান্ডের কার্ন, মালয়েশিয়ার গোমাথী আর ইন্দোনেশিয়ার উইলি—আমরা সবাই পূর্বপরিচিত। ২০২২ সালে ভারতের ওড়িশায় অন্য এক পর্যটন মেলায় অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম, তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। ফলে 'এক ঢিলে দুই পাখি' মারার লোভ থেকেই আমার এই মেডান যাত্রা।

সামোসির দ্বীপে যাওয়ার জন্য ফেরির কথা বলছিলাম। টোবা লেকের ওপর ফেরিতে উঠেই আমার বাংলাদেশের আরিচা ও দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের কথা মনে পড়ে গেল। উন্নত দেশের অনেক ফেরিতেই চড়েছি, কিন্তু এটি দেখতে হুবহু বাংলাদেশের ফেরির মতো। দুপাশে স্টিলের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে সেই একই রকম বেঞ্চ এবং চিপস-বিস্কুটের দোকান। পাশেই একটি ছোট কনফেকশনারি, যেখানে স্যান্ডউইচ ও বার্গার বিক্রি হচ্ছে। বসার বেঞ্চগুলোও আমাদের দেশের মতোড় খুবই আঁটসাঁট এবং জায়গা খুব কম। টয়লেটের অবস্থা আরও ভয়াবহ; আমাদের

দেশের মতোই অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু প্রকৃতি তো আর বাধা মানে না, তাই বাধ্য হয়ে কোনোমতে কাজ সারতে হলো। তবে নারীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়।

এবার আসি লেক টোবা প্রসঙ্গে। আমাদের বাসের গাইড বলছিলেন, লেক টোবা হলো ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার মেডানে অবস্থিত দেশটির বৃহত্তম প্রাকৃতিক লেক, যা বিশ্বের বৃহত্তম 'ভলকানিক লেক' বা আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট হ্রদ। প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৩০ কিলোমিটার প্রশস্ত এই লেকটি প্রায় ৫০৫ মিটার গভীর। এর মাঝেই পাহাড়ের গায়ে রয়েছে 'টোবা সুপার ভলকানো'। এটি বর্তমানে সুপ্ত থাকলেও কখন যে জাগ্রত হবে তা বলা মুশকিল! এই লেক থেকে সারা ইন্দোনেশিয়ায় সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া মৎস্য খামার, হাইড্রো পাওয়ার, কৃষিকাজ ও পরিবহনের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। এই লেক টোবা দিয়েই ফেরিতে করে আমরা সামোসির দ্বীপে যাচ্ছি।

সামোসির দ্বীপ স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি স্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ হলো বিশ্বের বৃহত্তম যীশু খ্রিস্টের স্ট্যাচু, যার নাম 'যীশু খ্রিস্ট দ্য সেভিয়ার'। অনেকে মনে করেন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর 'ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার'ই বিশ্বের সর্বোচ্চ যীশু মূর্তি। কিন্তু মেডানের লেক টোবার এই মূর্তিটি দেখার পর আমাদের সেই ভুল ভাঙল। ব্রাজিলের মূর্তির উচ্চতা মাত্র ৩০ মিটার বা ৯৮ ফুট, অন্যদিকে মেডানের 'যীশু খ্রিস্ট দ্য সেভিয়ার'-এর উচ্চতা প্রায় ৬১ মিটার বা ২০০ ফুট। অর্থাৎ এটি ব্রাজিলের মূর্তির তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি উঁচু। ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় খ্রিস্টধর্মের প্রধান ব্যক্তিত্বের এত বড় স্ট্যাচু! আবার বালি দ্বীপ হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রধান। ইন্দোনেশিয়ায় এসে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল—এটি যেন সব ধর্মের এক মিলনমেলা। আমাদের বন্ধু মহলেও তার প্রতিফলন আছে; থাইল্যান্ডের কার্ন বৌদ্ধ, সিঙ্গাপুরের সিরিন খ্রিস্টান, আমি মুসলিম আর মালয়েশিয়ার গোমাথী হিন্দু। পর্যটন শিল্প যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য রূপ, তা মেডানে এসে আবারও প্রমাণিত হলো। গাইড জানালেন, ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৮৭ ভাগ মুসলিম, ১০.৪৫ ভাগ খ্রিস্টান, ১.৬৭ ভাগ হিন্দু এবং ০.৭১ ভাগ বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে শান্তিতে বসবাস করছেন। 'ক্রাইস্ট দ্য সেভিয়ার' সামোসির প্রদেশের সিবিবি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এটি সাধারণ মানুষের দানের অর্থে নির্মিত এবং ২০২৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর এর উদ্বোধন হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে জাকার্তা ও বালির পাশাপাশি মেডানের টোবা লেক এবং যীশু খ্রিস্ট দ্য সেভিয়ার দর্শন পর্যটকদের জন্য এক নতুন ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হতে পারে। চলুন, আবার ঘুরে আসি।

শিলাইদহ ও অন্যান্য রবীন্দ্রতীর্থ

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

শাহজাদপুর: স্মৃতিধন্য কাছারি বাড়ি

২০২১ সালের ডিসেম্বর।

সকালে গাড়ি নিয়ে ঢাকা থেকে বগুড়ায় গিয়েছিলাম। একটা কাজ সেরে দুপুর নাগাদ আবার ঢাকার দিকে রওনা দিয়েছি। পথে গাড়ি থামিয়ে অপরূপ হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দির দেখলাম। ওটা সিরাজগঞ্জ জেলার অংশ। হাটিকুমরুল মোড় পার হয়ে আমাদের বামে যেতে হবে। কিন্তু আমার মনে হলো বামে যাব না, সোজা চলে যাই। একটা তীর্থস্থান দেখে আসি। কতদিন ওদিকে যাই না!

এই সিরাজগঞ্জের এক উপজেলার নাম শাহজাদপুর। এখন সাধারণ এক উপজেলা হলেও একসময় এখানে ছিল বিশাল এক জমিদারি। নাটোরের রানি ভবানী ছিলেন এই শাহজাদপুর জমিদারির মালিক। ১৮৪০ সালে শাহজাদপুর জমিদারি নিলামে উঠলে তেরো টাকা দশ আনা দিয়ে তা কিনে নেন কলকাতার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

পূর্ববঙ্গ আর ওড়িশার বিশাল এলাকায় জমিদারি কিনেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। পূর্ববঙ্গে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ছিল নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনার সদর শিলাইদহ, রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনার সদর পতিসর, আর পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরগনার সদর শাহজাদপুর। এখন স্বাধীন বাংলাদেশে এসব এলাকা কুষ্টিয়া, নওগাঁ আর সিরাজগঞ্জ জেলার অংশ। শিলাইদহ, পতিসর,

শাহজাদপুর—এসব এলাকার জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য নিয়মিত আসতেন ঠাকুর পরিবারের লোকজন, আর তাঁদের থাকার জন্য ছিল আরামদায়ক কুঠিবাড়ি।

১৮৯০ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত শাহজাদপুর জমিদারি দেখাশোনা করেন ঠাকুরবাড়ির সুপুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সাধারণত বোটে করে পদ্মা নদী পার হয়ে আরও কয়েকটা নদী হয়ে শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির ঘাটে এসে নামতেন। আর পানি কম থাকলে সোনাই নদীতে বোট রেখে রাউতাড়া থেকে পালকিতে চড়ে শাহজাদপুর আসতেন।

জমিদারির প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে এলেও রবীন্দ্রনাথ এখানকার প্রকৃতি আর মানুষের বিচিত্র জীবন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। এখানে বসেই কবিগুরু রচনা করেছেন কাব্য 'সোনার তরী', 'ভরা বাদরে', গল্প 'পোস্টমাস্টার', 'ক্ষুধিত পাষাণ', নাটক 'বিসর্জন'-সহ অনেক অনেক লেখা। ঠাকুর পরিবারের জমিদারি ভাগাভাগির কারণে অন্য শরিকরা দায়িত্ব নিলে ১৮৯৭ সালের পরে রবীন্দ্রনাথকে আর শাহজাদপুরে আসতে হয়নি, তবে এ জায়গার প্রতি তাঁর আমৃত্যু ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায় নানান চিঠিতে।

আমরা শাহজাদপুরের কাছারি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে পৌঁছাই। বাইরে থেকে হলুদ রঙের বাড়িটার গোল জোড়া থাম দেখেই রাবীন্দ্রিক ভাব চলে আসে। এটা অবশ্য আগে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মালিকানায় আসে। চমৎকার বাগান পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি আমরা।

নিচতলার সব রুমের চার দেওয়ালে ঝোলানো রবীন্দ্রনাথের জীবনের অসংখ্য আলোকচিত্র আর পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গেলেই দেখা মেলে রবিবাবুর ব্যবহার করা মহামূল্যবান সব জিনিসপত্রের। তাঁর পালকি আছে ওখানে, আছে তাঁর বিখ্যাত বজরার ছোট্ট প্রতিমূর্তি। খাট, লেখার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, সোফা, প্রচুর তৈজসপত্র, বেসিন, জমিদারি সিলমোহর ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। তবে ভালো লেগেছে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা দুই জোড়া কাঠের খড়ম দেখে। এগুলো পরেই কি তিনি খটখট করে হেঁটে বেড়াতেন শাহজাদপুর কুঠিবাড়ির চৌহদ্দির ভেতরে? তাঁর মাথার ভেতরে কি তখন তৈরি হতে থাকত কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ নিখুঁত সব গদ্য?

দোতলার চওড়া বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে মনে হয়, স্বয়ং বিশ্বকবি হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে শূন্য চোখে তাকিয়ে আপনমনে গানের কলি ভাবতেন, কিংবা মনে মনে কবিতার পঙ্‌ক্তি সাজিয়ে নিতেন। আমরা ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে দেখি বাইরের সুসজ্জিত বাগান আর নানারঙের ফুল-পাতা।

ফেরার পথে শাহজাদপুরের ব্যস্ত তিন রাস্তার মোড়ে দেখি, সাদা আলখাল্লা পরে পেছনে দুই হাত বেঁধে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন শ্মশ্রুমণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হয়তো বিদায় জানাচ্ছেন আমাদের। আমরাও মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে সামনে এগিয়ে যাই।

২. শিলাইদহঃ অকৃপণ রবির কিরণে

২০২২ সালের আগস্ট।

ফরিদপুর থেকে রওনা দিয়ে মেহেরপুর ঘুরে কুষ্টিয়া শহরে পৌঁছেছি আগের দিন রাতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সকাল সকাল নাস্তা শেষ করে রওনা দিলাম শিলাইদহের দিকে। আধা ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাই কুমারখালী উপজেলার সবচেয়ে পরিচিত নিদর্শন রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরে। ধার্মিক আর তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-আশয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ ছিল না; দায়িত্ববোধের কারণে তিনি পারিবারিক সম্পত্তি সুসংহতভাবে পরিচালনা করেছেন।

তিনি তাঁর পরিবারের অনেকের উপরেই জমিদারির বিভিন্ন অংশ দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এমন দায়িত্ব পেয়ে শুরুতে একটু ভড়কে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তবে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনার কথা ভেবে খুশিও হয়েছিলেন। কলকাতায় জন্ম হলেও নগরজীবনের কোলাহল কখনোই তাঁকে মুগ্ধ করতে পারেনি। নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি অনেকটা প্রথমবারের মতো সাধারণ ও তৃণলগ্ন মানুষের সাথে আন্তরিকভাবে মেশার সুযোগ পান।

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এসে এখানকার কুঠিবাড়িতে থাকতেন। জমিদারির কাজকর্ম দেখভালের কাঠখোট্টা কাজের মাঝেই চলত তাঁর কাব্যচর্চা। কুঠিবাড়ির চারদিকের আমবাগান, কাঁঠাল গাছ আর অন্যান্য চিরসবুজ গাছের মাঝে হেঁটে বেড়াতেন; মাঝে মাঝে বসে থাকতেন বিশাল পুকুরের পাড়ের শান বাঁধানো ঘাটে। আবার কখনো 'পদ্মা' নামের বোটে পদ্মা নদীর বুকে দিনের পর দিন ভেসে থেকে সাহিত্য রচনা করতেন।

১৮৮৯ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত অসংখ্যবার শিলাইদহে এসেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময়টায় তিনি গ্রামের সতেজ লাউমাচা, সুদর্শন খড়ের রুপ কিংবা নদীতে ভাসমান সরস শৈবাল দেখে মুগ্ধ হতেন। তাঁর শান্তি, স্বস্তি আর আনন্দের মূল কারণ ছিল মুক্ত পরিবেশ, উদার আকাশ, দূর দিগন্ত আর জলস্রোতের বিশাল বিস্তৃতি। এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড় পৃথিবীটাকে পেয়ে যান। এখানে বসেই তিনি সৃষ্টি করেছেন অনেক কালজয়ী রচনা।

আমরা শিলাইদহ কুঠিবাড়ির ফটক পেরিয়ে চত্বরে ঢুকি। কুঠিবাড়ির দুপাশে চারটা লম্বা তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে আকাশে উঁকি মারছে। মূল বাড়ির দিকে এগোই আমরা। তখনো বেশি বেলা হয়নি, কিন্তু মাথার উপরে জ্বলজ্বলে ঝলমলে রবি খররোদ বিতরণ করছে। রবির অকৃপণ কিরণে ধরণী ওষ্ঠাগতপ্রায়। বাচ্চারা রোদচশমা চোখে দিয়ে কিছু ছবি তুললেও এরপরে একছুটে কুঠিবাড়ির ছায়ায় সেঁধিয়ে গেল। আমরাও পেছন পেছন ঢুকে পড়ি রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবি আছে দেওয়ালে। তাঁর আঁকা ছবির প্রতিলিপি আছে বেশ কিছু। তবে আমি আগ্রহ করে খুঁজি রবিবাবুর ব্যবহৃত জিনিসপত্র। তাঁর ঘুমানোর খাট আছে এখানে, আছে তাঁর চলাচলের পালকি। তাঁর স্পিডবোট আছে, আর আছে পদ্মা বোটের ছোট্ট একটা মিনিয়েচার ভার্শন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আশপাশটা দেখি। এরপর নেমে আসি ধীরে ধীরে।

গিয়ে বসি বিশাল দিঘির পাড়ে। গাছের ছায়ায় তপ্ত হাওয়াও মৃদু হয়ে যায়, সামনে দোল খায় টলটলে জল। ছাত্রজীবনে এই ঘাটে বসেই একের পর এক কুলফি মালাই খেয়েছিলাম, কিন্তু এখানটা এখন শুনশান নীরব।

কুঠিবাড়ি চত্বর থেকে বেরিয়ে অবশ্য মনটা খুশি হয়ে যায়। কয়েকজন বসে আছেন লাল কাপড়ে জড়ানো বড় পাতিল নিয়ে, আর সেগুলোর ভেতরে আছে হিম-ঠান্ডা কুলফি। শুনেছি হালে কুলফির জন্য কুষ্টিয়া এখন ভ্লগার ও ব্লগারদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে। এখন রাস্তার পাশে মাঝে মাঝেই ছাউনি বানিয়ে কুলফিওয়ালারা বসেন। এক পরিবার থেকে কুষ্টিয়ার কুলফি বানানোর পেশা এখন ছড়িয়ে গেছে শত পরিবারে।

মানতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশের প্রায় সব জায়গায় মালাই পাওয়া গেলেও সবচেয়ে বিখ্যাত নিঃসন্দেহে কুষ্টিয়ার এই কুলফি মালাই। গরুর খাঁটি দুধ থেকে তৈরি হয় দেখে এর স্বাদ এমন অদ্বিতীয়। অন্যান্য অনেক জায়গায় গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করা হয়, তাই স্বাদে কিছুটা ভিন্নতা থাকে।

বিক্রেতা পাতিলের ভেতরে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বরফের টুকরোর ফাঁক দিয়ে বের করে আনেন ধাতব একটা সিলিন্ডার। মালাইয়ের ধাতব খোলসের মুখটা দম দিয়ে আটকানো থাকে। একটা ছুরি দিয়ে দম সরিয়ে খোলা হয় খোলসটা; টিনের কৌটা থেকে কুলফি বের করতে বিশেষ কেতায় কুলফিওয়ালা দুহাতের তালিতে কয়েকবার মোচড় দেন, এরপর অফ-হোয়াইট রঙের কুলফি পলিথিনের প্যাকেটে ঢেলে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঐতিহ্য মেনে কলাগাছের বরক বা পাতার অংশ দেওয়া হয় খাওয়ার জন্য। আজকাল সুবিধার জন্য প্লাস্টিকের চামচও দেওয়া হয় সাথে। বরক বা চামচ দিয়ে একটুখানি বরফশীতল হিমায়িত দুগ্ধ কেটে নিয়ে মুখে ফেলতেই ঠান্ডা ঘন দুধের স্বাদে মুখটা ভরে যায়, আর নাকটা ভরে যায় দুধের সাথে এলাচি-দারুচিনির মিলিত সুঘ্রাণে। ঠান্ডা থাকতে থাকতেই খেয়ে ফেলা হয়, তবে চেষ্টা করলেও গলে যাওয়ার আগে পুরোটা শেষ করা যায় না। খাঁটি উপাদানের কারণেই নাকি দীর্ঘক্ষণ শক্ত থাকে না এই মালাই। মাঝে মাঝে তাই পলিথিনের প্যাকেটের কোনায় মুখ লাগিয়ে টেনে নিয়ে অনুভব করতে হয় শীতল তরল সুখের আস্বাদন।

একটা মালাই শেষ করে অবশ্যই হাতে নিতে হয় দ্বিতীয় মালাই। গরমের প্রাচুর্য আর তৃষ্ণার তারতম্য ভেদে তৃতীয়-চতুর্থ মালাইও উঠতে পারে হাতে। মালাই শেষ

করার পরে বিক্রেতা পাতিল থেকে বের করে এক টুকরো বরফ দেন হাতে, আর সেটা দুহাতে ঘষে নিলেই হাত থেকে আঠালো দুধের ভাবটা কেটে যায়।

৩. পতিসর: 'আমাদের ছোট নদী'র খোঁজে

২০২৩ *সালের জানুয়ারি।*

সকাল থেকেই নওগাঁ জেলার এদিকে ওদিকে ঘুরছি। দুপুরের পরে শহর থেকে রওনা দিলাম আত্রাই উপজেলার দিকে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩০ সালে নাগর নদীর তীরে পতিসর নামের এলাকায় জমিদারি কেনেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশাল জমিদারিকে একান্নবর্তী পরিবারে ভাগ-বাটোয়ারা করে দেন। তখন কিছু পরগনা তাঁর ভাই কিংবা ভাইয়ের ছেলেদের ভাগে, আর কিছু তাঁর নিজের ছেলেদের দায়িত্বে পড়ে। ১৯২১ সালে জমিদারির দায়িত্ব পুরোপুরি ভাগ হয়। তবে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অধীনেই থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ থেকে শুরু করে একেবারে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত জমিদারি দেখভালের উপলক্ষ্যে পতিসরে আসেন।

পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘরে পৌঁছে সিংহদুয়ারের উপরে দুপাশে দুই সিংহমূর্তিকে দণ্ডায়মান দেখে ভালোই লাগল। দুয়ারের দুপাশে মোটা দুটো থাম। বাড়িটা আকারে বেশ ছোট হলেও বারান্দায় অনেকগুলো জোড়া-থাম আর ঢালু হয়ে যাওয়া চাল দেখেই সাবেকি ধরন টের পাওয়া যায়। ভেতরের চত্বরে আছে রবি ঠাকুরের প্রমাণ আকারের এক ভাস্কর্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার করা খাট, আরাম কেদারা, আলমারি, সিন্দুক—অনেক কিছুই আছে এখানে। অবাক হয়েছি একটা লম্বাটে বাথটাব দেখে। রবিবাবু বোটের ভেতরে নাকি এই বাথটাবে শুয়ে গোসল করতেন। আর সবচেয়ে ভালো লেগেছে তাঁর ব্যবহার করা কাঠের তৈরি একটা গ্লোব দেখে। আশ্চর্য ব্যাপার, এই গ্লোবে সব জায়গার নাম বাংলায় লেখা। এমন বাংলা ভূগোলক কখনো দেখিনি। সেই শতাধিক বছর আগেই যে ভ্রমণপ্রিয় কবি পাঁচটা মহাদেশ ভ্রমণ করেছেন, হয়তো এই গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই হয়েছে তাঁর অনেক পরিকল্পনা। আমি গ্লোবের গায়ে 'কলিকাতা', 'ঢাকা', 'চট্টগ্রাম', 'বঙ্গ উপসাগর' খুঁজে বের করি। অনেক অনেক চেনা নাম দেখে এক স্বপ্নাবিষ্ট তরুণের কৌতূহলী অনুসন্ধিৎসু মনের অলিগলিকে ছোঁয়ার চেষ্টা করি। এই গ্লোবটা হাতে নিয়েই কি তিনি উদাস হয়ে ভাবতেন—এরপরে জাপানে যাব, নাকি পেরু যাব, নাকি যাব ইউরোপের কোনো দেশে!

এই পতিসর কাছারিবাড়িতে বসে কবি অনেক কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে অমর হয়ে আছে শীর্ণ নাগর নদীকে দেখে লেখা তাঁর 'আমাদের ছোট নদী'। তবে এখন নাগর ঘাটে দাঁড়িয়ে একেবারে অদৃশ্য নাগরকে দেখে খুবই খারাপ লাগল। একটা ব্রিজ আছে, দুপাশে উঁচু পাড় আছে, কিন্তু নিচে কোনো পানি নেই। শুধু শুকনা মাটি আর ঘন ঘাস। বর্ষাকালে কেমন হয় জানি না,

তবে এই ঘোর শীতকালে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমাদের সেই ছোটো নদীটাকে।

৪. জোড়াসাঁকো: ইতিহাসের আঁতুড়ঘর

২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি।

এর আগে কয়েকবার কলকাতায় এলেও সেসব ছিল মূলত ভারতের বিভিন্ন দিকে যাওয়া কিংবা বিভিন্ন দিক থেকে দেশে ফেরার মধ্যবর্তী যাত্রাবিরতি। ঠিক কলকাতা দেখার জন্য কখনো আসা হয়নি। এবারে তাই খানিকটা সময় নিয়ে এসেছি, আর কলকাতাকে কিঞ্চিৎ ঠিকঠাক দেখার জন্য আমি একেবারে বদ্ধপরিকর। সেদিন সকালে উঠেই রওনা দিলাম তাই জোড়াসাঁকোর দিকে।

যশোরের পিরালি ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম কুশারীর বংশধর পঞ্চানন ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে কলকাতায় এসে ঠাকুর পদবি লাভ করেন। সেই পঞ্চানন ঠাকুরের পৌত্র নীলমণি ঠাকুর ইংরেজদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিপুল অর্থসম্পদের মালিক হন। নীলমণি ঠাকুরই পৈতৃক নিবাস পাথুরিয়াঘাটা ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে বৈষ্ণবচরণ শেঠের জমি কিনে ঠাকুর বাড়ির পত্তন করেন।

নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, যার ব্যবসায়িক বুদ্ধি আর অর্থবলে ঠাকুর পরিবার তখনকার কলকাতায় অন্যতম ক্ষমতাশালী আর অভিজাত পরিবারে উন্নীত হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই পুরো পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি। ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলেমেয়েদের জন্মও এখানে হয়। দেবেন ঠাকুরের পনেরো সন্তানের মধ্যে চৌদ্দ নম্বর সন্তানের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে প্রথমবারের মতো গিয়ে আক্ষরিক অর্থেই মুগ্ধ হয়েছি। লাল রঙের তিনতলা বিশাল দালান। নানান দিকেই তার প্রবর্ধন। মোটা মোটা থামের পেছনে লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার উপরের দিকে আবার কাঠের খড়খড়ি আদলের কারুকাজ। শখানেক কিংবা শতাধিক কক্ষের এই দালান এখন অবশ্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে ১৯৬১ সালে এখানে রবীন্দ্র ভারতী জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ঠাকুর পরিবারের অনেক নিদর্শন পরম যত্নে প্রদর্শিত হচ্ছে। যদিও জাদুঘরের ভেতরের কোনো কিছুর ছবি তোলার কোনো উপায় নেই। প্রতি কক্ষের ভেতরে থাকা প্রহরীরা এ ব্যাপারে খুবই সজাগ। আচ্ছা, এই প্রথার কারণ কী? নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত স্মৃতির পাশাপাশি ক্যামেরার ডিজিটাল স্মৃতিতেও যদি সব তুলে রাখা যেত, তাহলে বারংবার সেই অবিকল স্মৃতিতে ফিরে গিয়ে তাকে চিরজাগরূক করে রাখা কি আরও সহজ হতো না?

এই দালানে আছে ঠাকুর পরিবারের আঁতুড়ঘর। ১৮৬১ সালে সারদাসুন্দরী দেবী এখানেই রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দেন। ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য প্রায় সব সদস্যের জন্মও এই আঁতুড়ঘরে। এই দালানের ঘরে বসেই জীবনের অধিকাংশ ক্ষণ কাটিয়েছেন

কবি, রচনা করেছেন কত অসাধারণ সাহিত্যকর্ম! জীবন সায়াহ্নে এই দালানেই তাঁর অপারেশন হয়। আবার এখানেই আছে সেই ঘর যেখানে শুয়ে ১৯৪১ সালের এক দুপুরে শেষবারের মতো চোখ বুজেছেন এই অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষটা। সেই ঘরটায় ঢুকে মন বিমর্ষ হয়। লাল মেঝের রুমটার মাঝে মাঝারি আকারের নিচু একটা খাট। তার উপরে বালিশ ছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথের একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। ওপাশে দুটো চেয়ার। একপাশে রবির একটা আবক্ষ মূর্তি। রুমের মেঝেতে দেওয়াল ঘেঁষে বসে অনেকেই নির্নিমেষ তাকিয়ে আছেন বিছানা আর তার উপরে রাখা কবিগুরুর ছবিটার দিকে।

বিভিন্ন রুম আর বারান্দায় হাঁটার সময় তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পুরোটা মনের পর্দায় ভেসে উঠতে থাকে। তাঁর শোয়ার ঘর, খাবার ঘর, পড়ার ঘর—সবই একেবারে বাস্তব। বিস্ময়কর এত এত লেখার অধিকাংশই তিনি লিখেছেন এই দালানের বিভিন্ন রুমে বসে, এটা ভেবেই গায়ে কাঁটা দেয়। বিমুগ্ধ চিত্তেই বের হই আমরা।

৫. দক্ষিণডিহি: পঞ্চ পুরুষের শ্বশুরবাড়ি

২০২৫ সালের জুলাই।

আমাদের এবারের খুলনা ভ্রমণ প্রায় শেষ। আজ রাতেই আমরা ঢাকায় ফিরব। খুলনার বাকি সব দ্রষ্টব্য আমার আগেও একাধিকবার দেখা হয়েছে। তবে একটা জায়গায় কখনোই যাওয়া হয়নি সময়াভাবে। আজ সেখানে যেতেই হবে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী ছিলেন খুলনার দক্ষিণডিহি এলাকার পিরালি বংশের মেয়ে। তাঁদের ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবীও ছিলেন দক্ষিণডিহির সন্তান। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে দেওয়ার সময়ও যে সেই একই দক্ষিণডিহি এলাকায় কন্যার সন্ধান করা হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই দক্ষিণডিহি যে রবীন্দ্রনাথের পাঁচ পুরুষের শ্বশুরবাড়ি।

১৮৮৩ সালে ২২ বছর বয়সি রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় দক্ষিণডিহির ১১ বছর বয়সি ভবতারিণী দেবীর সাথে। তবে বিয়ের পরে ঠাকুর পরিবারের প্রথা মেনে পুত্রবধূর নাম বদলে রাখা হয় মৃণালিনী দেবী। শুধুই কি পারিবারিক প্রথা, নাকি কবি স্বামীর পছন্দ অনুযায়ী স্ত্রীর কাব্যিক নাম রাখার প্রচেষ্টা, কে জানে!

আমরা খুলনা থেকে রওনা দিয়ে পৌনে এক ঘণ্টা পরে পৌঁছাই ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়িতে। একসময় রায়বাড়ি নামে পরিচিত দোতলা দালানটা সংস্কারের পরে বেশ চমৎকার রূপ পেয়েছে। জানালার সবুজ পাল্লায় কাঠের খড়খড়ি দেখলেই সাবেকি ভাবটা টের পাওয়া যায়। ছাদে আছে লোহার কড়িকাঠ আর কড়িবরগা।

বাড়িটায় রবি ঠাকুর কিংবা তাঁর পরিবারের ব্যবহৃত জিনিসপত্র কিছু নেই। তবে অনেক ছবি আর নথিপত্র প্রিন্ট করে দেওয়ালে টাঙানো আছে। শুনেছি, প্রকৃত অর্থে

শ্বশুরবাড়ি হলেও রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো আসেননি। এমনকি তাঁদের বিয়েও হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। তবুও এটা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অবস্থিত চারটা উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র নিদর্শনের একটা।

৬. উপসংহার: এক অন্তহীন যাত্রা

সেই দেড়শ বছর আগের মানুষ হয়েও রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর পাঁচটা মহাদেশের ত্রিশটা দেশে ভ্রমণ করেছেন। তখনো বাণিজ্যিক বিমানযাত্রা শুরু হয়নি বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের মূল বাহন ছিল জাহাজ আর রেল। তাই যাত্রা হতো কিছুটা ধীরগতির আর সব জায়গায় অবস্থান হতো কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত। এসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেই তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, পারস্য, সিঙ্গাপুর, জাভা, চীন, জাপান, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা—আরও অনেক দেশে। কী বিপুল ভ্রমণানুরাগ থাকলে এত রকম কাজের ফাঁকেও প্রবল আগ্রহ নিয়ে পৃথিবীর নানান প্রান্তের এত এত দেশে সফর করা যায়! রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ রচনাও রয়েছে প্রস্তার।

নিতান্ত কাকতালীয়ভাবেই আমার পরপর পাঁচ বছরে পাঁচটা রবীন্দ্রধামে যাওয়া হয়েছে। পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রবি ঠাকুরের আরও অনেক স্মৃতিধন্য স্থান। এ বছরে কি যাওয়া হবে নতুন কোনো রবীন্দ্রতীর্থে? কে জানে!

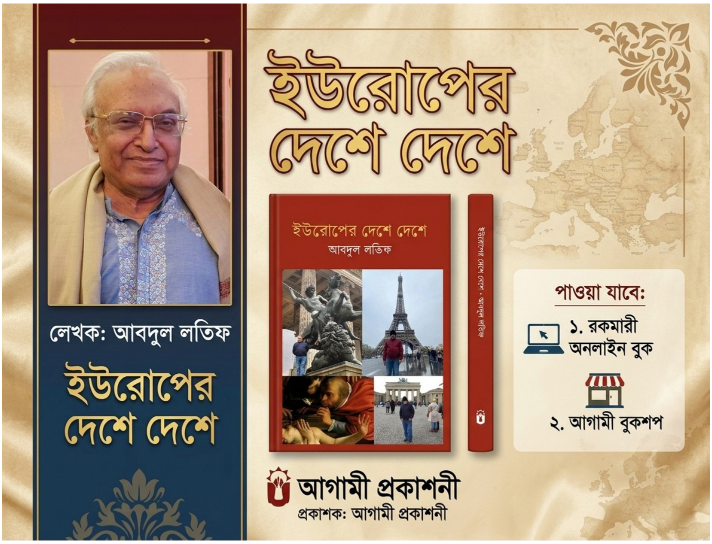

ঠাকুরোভা, প্রাগের রবীন্দ্র চত্বর

মাহফুজুল হক জগলুল

I have been fascinated both by the inspiration in which Tagore's literary work is rich and by the charm of his personality, which is equally evident in his pure humanity and in his philosophy. Tagore has sung for his sons and grandsons of his country, not merely for his own generation, and he leaves them both a rich heritage.

Dr. Vincenc Lesny

(১৯৩৭ সালে প্রকাশিত Rabindranath Tagore: His Personality and Work বইয়ের চেকোস্লোভাকিয়ান লেখক)

আমরা চার স্থপতি জুরিখ থেকে মিউনিখ হয়ে অনেক রাতে যখন প্রাগে পৌঁছি, তখন আশেপাশের সব রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গেছে। পুরনো প্রাগের নারোডনি সড়কের পাশে ছোট হলেও অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি মেট্রোপোল ডিজাইন হোটেলে বাক্সপেটরা রেখে চারজনই বের হয়েছি হালাল খাবারের খোঁজে। রাতের প্রাগে দল বেঁধে হাজারো ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশির ভাগই তরুণ বয়সের; এদের একটি স্কটিশ দলের সাথে কিছুটা ভাব জমিয়ে জানতে চাইলাম,

রাতে খাবারের জন্য কোথায় যেতে পারি। প্রশ্ন শোনার পর দেখি পুরো গ্রুপটাই একসঙ্গে হেসে উঠল। ওরা বলল,

— আমরাও তোমাদের মতোই খাবার জায়গা খুঁজছি।

এভাবে আমরা, দুই মহাদেশের দুটি দল একত্রে অনেকক্ষণ ধরে চিপা গলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলাম। কোনো খাবারের রেস্তোরাঁ খোলা পেলাম না। প্রতি গলিতেই অসংখ্য বার খোলা আছে, কিন্তু সেখানে আমাদের মতো চার ক্ষুধার্ত বাঙালির পেটপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। রাত তখন একটা বেজে গেছে, অগত্যা ফিরে গেলাম হোটেলে। দেখি বুদ্ধিজীবী টাইপের বুড়ো রাগী রিসেপশনিস্ট ল্যাপটপ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গুতাগুতি করছে। সাহায্য চাইতেই বলল, প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে গেলে ওয়েনসেলাস স্কয়ারের কাছে কিছু বার্গারের দোকান খোলা থাকতে পারে। ওখানে যদি না পাই, তাহলে আর কোথাও পাওয়া যাবে না; আজ রাত তাহলে ভুখাই থাকতে হবে। তার কথা মতো হাঁটা শুরু করলাম ওয়েনসেলাস স্কয়ারের দিকে। মিনিট পনেরো হাঁটার পর পেয়ে গেলাম একটি বার্গারের দোকান। মাংসের বার্গার না, ভেজিটেবল বার্গার। খুব ক্ষুধার্ত আর অনিশ্চিত ছিলাম বলে কি না জানি না, সে রাতে যে বিশাল সাইজের ভেজিটেবল বার্গার খেয়েছিলাম, অমন সুস্বাদু বার্গার আমি জীবনে আর খাইনি। বলাবাহুল্য, কোনো জায়গায় হালাল খাবার না পেয়ে পরের কয়েক দিনও আমাকে কয়েকবার ওই রেস্তোরাঁর ভেজিটেবল বার্গার খেয়ে কাটাতে হয়।

অনেক উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রাগের প্রথম সকালে ঘুম ভাঙল। প্রাগ নিয়ে মনের মধ্যে বহুকালের এক উচ্ছ্বাস জমা ছিল। মধ্যযুগের দারুণ এই সুন্দর শহরের একটি স্বতন্ত্র আরবান চিত্রকল্প ও এর বুদ্ধিবৃত্তিক সৌন্দর্যের সমৃদ্ধ ধারণা বহু আগে থেকেই মনের মধ্যে গেঁথে ছিল। এ ছাড়া প্রাগ হচ্ছে ঔপন্যাসিক এবং লেখক ফ্রান্ৎস কাফকার শহর, এ কারণেও আমার কাছে প্রাগের আবেদন অনেক বেশি। সকালে নাস্তা সেরে হোটেলের রিসেপশনিস্টের কাছে যখন ট্যুরিস্ট ম্যাপটা চাইলাম, সে খুব যত্ন করে ম্যাপের ওপর গোল গোল চিহ্ন দিয়ে একজন পর্যটকের যা যা দেখা দরকার তা সুন্দর করে দাগিয়ে দিল। কথায় কথায় পূর্বরাতেই তাকে বলেছিলাম, আমরা চার বাংলাদেশী স্থপতি এসেছি তোমাদের শহর দেখতে। তাই সে প্রথমেই বলল,

— যাও, এখান থেকে মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলেই দেখতে পাবে বিশ্বখ্যাত স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক গেহরির জনপ্রিয় স্থাপত্য Dancing House, তোমরা যেহেতু স্থপতি তাই এটাই তোমাদের প্রথম দেখা উচিত।

যদিও সাধারণভাবে সবাই ভবনটিকে ফ্র্যাঙ্ক গেহরির ডিজাইন বলে, আসল তথ্য হচ্ছে—আমেরিকান স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক গেহরির সাথে ক্রোয়েশিয়ান স্থপতি ভ্লাদো মিলুনিচ এবং চেক বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ স্থপতি ইভা জিরিচনার, এই তিনজন মিলে

এই ডিজাইনটি করেছেন। সামান্য ছোট একটা নয়তলা বিল্ডিং ডিজাইন করতে তিন দেশের তিনজন এমন বাঘা বাঘা ডিজাইনার প্রয়োজন হলো কেন, এমন প্রশ্ন আসতেই পারে। তবে আমার ধারণা, Dancing House দেখার পর এই প্রশ্নটি আর থাকবে না। আকারে এটি ছোট হলেও প্রকারে যে বিশাল কাজ হয়ে উঠতে পারে, সেটির একটি দারুণ উদাহরণ হতে পারে এই ডিজাইনটি।

রিসেপশনিস্টের কথা মতো হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদূর পরই আমাদের হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল, কেননা সামনেই প্রাগের বিখ্যাত পরম প্রশান্ত ভ্লাতাভা নদী। এবার হয় আমাদের বাঁয়ে যেতে হবে অথবা ডানে। ম্যাপ অনুযায়ী আমরা নদী ডানে রেখে বাঁ দিকে উধহপরহম ঐড়ঁংব বরাবর হাঁটা শুরু করলাম। প্রাগের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ভ্লাতাভা চেক প্রজাতন্ত্রের দীর্ঘতম নদী। প্রাগের সৌন্দর্যে অনন্য মাত্রা যোগ করেছে এই নদী। নদীর ওপর বানানো চার্লস ব্রিজ শহরের আরও একটি প্রধান দর্শনীয় স্থাপনা। হাঁটতে হাঁটতে তাকিয়ে দেখি ভ্লাতাভায় নৌকা করে অসংখ্য পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি নদীর দেশের মানুষ, ভিনদেশে নৌকাভ্রমণ আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি জোর কদমে উপচে পড়া উচ্ছ্বাস নিয়ে হাঁটছি Dancing House অর্থাৎ নৃত্যরত ভবন দেখার আগ্রহ নিয়ে। নদীর পানিতে গথিক (Gothic), রেনেসাঁ (Renaissance), বারোক (Baroque) এবং নিওক্লাসিক্যাল মিশ্র স্থাপত্যশৈলীর কালানুক্রমিক ধারায় গড়ে ওঠা প্রাগের অনিন্দ্যসুন্দর বাড়িগুলোর অপূর্ব সুন্দর সাজানো ছায়া পড়েছে, তা যেকোনো মানুষকেই মুগ্ধ করবে।

ভ্লাতাভা নদীর তীরের কাছেই প্রাগের নভে মেস্তো (Nové Město) এলাকায় ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে নির্মিত এই Dancing House-কে পোস্ট-মডার্ন স্থাপত্যশৈলীর এক আকর্ষণীয় উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ডিজাইনে ভবনটিকে একটি নৃত্যরত দম্পতির রূপক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দুটি প্রধান অংশ: ডানে সোজা স্থিতিশীল টাওয়ার, যা ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোর প্রতীক; আর সামনের নাচের বাঁকানো অংশটি নাচের ভঙ্গির প্রতীকী উপস্থাপন। উপাদান হিসেবে ভবনটিতে কাঁচ, ইস্পাত এবং কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে। কাঁচের দেওয়াল এবং ভবনের ওপরের ধাতব গম্বুজ অন্যরকম এক আকর্ষণ যোগ করেছে। স্থাপত্যশৈলীতে খুব ইনফরমাল হলেও ভবনটি মূলত অফিস স্পেস এবং টপফ্লোর রেস্তোরাঁ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ রেস্তোরাঁর ছাদ থেকে ফ্রুট জুস খেতে খেতে প্রাগ শহরের অসাধারণ প্যানোরামিক দৃশ্য উপভোগ করি সবাই। প্রাগের এই রূপ যেকোনো মানুষের মন কেড়ে নেবে। তবে স্থপতিদের একটি বড় অংশ মনে করে শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা আশেপাশের নানা ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যশৈলীর সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই স্থাপত্য কর্মটি এখানে পরিপূর্ণভাবে বেমানান। শুধু

বেমানানই নয়, এটি এই শহরের শত শত বছরের স্থাপত্য পরম্পরাকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করেছে। এর উত্তরে স্থপতি ফ্র্যাঙ্ক গেহরি বলেছেন,

"Dancing House is a symbol of freedom and movement, standing out in contrast to the rigid structures of the surrounding area."

স্থপতি গেহরির ভাষ্যমতে, এই স্থাপত্য ডিজাইনে তিনি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের পশ্চিমা সিনেমা জগতের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী ও একই সাথে হলিউডের বিখ্যাত মিউজিক মুভি জুটি ফ্রেড ও জিঞ্জারের নৃত্যরত চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। এজন্যই মজা করে তিনি ভবনটিকে ডাকেন "Fred and Ginger" বলে। তাঁর মতে সোজা স্থিতিশীল টাওয়ার হচ্ছে ফ্রেড (Fred), যা ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোর প্রতীক; আর বাঁকানো, গতিশীল অংশটি হচ্ছে জিঞ্জার (Ginger), যা অপূর্বভাবে নারীর নাচের ভঙ্গিকে প্রকাশ করে। সাত তলায় যে রেস্টুরেন্টটি রয়েছে তার নামও হচ্ছে—Ginger & Fred Restaurant Glass Bar।

চলচ্চিত্র তারকাদের নিয়ে পৃথিবীতে আর কোনো স্থাপত্য হয়েছে কি না সঠিকভাবে আমার জানা নেই, তবে শুনেছি কানাডায় Marilyn Monroe Towers ডিজাইন করা হয়েছে মেরিলিন মনরোর দেহসৌন্দর্যের উপস্থাপন হিসেবে। অন্যদিকে মনে পড়ে বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেইন চলচ্চিত্র তারকা মাধুরী দীক্ষিতের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র "হাম আপকে হ্যায় কৌন" দেখার পর মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিয়ে অনেকগুলো ছবি আঁকেন। এর আগে তিনি বাঙালি নায়িকা সুচিত্রা সেনকে নিয়েও ছবি আঁকেন এবং পরে অমিতাভ বচ্চনকে নিয়েও ছবি আঁকেন। শুনেছি হলিউডের মেরিলিন মনরো, এলভিস প্রিসলি, এলিজাবেথ টেইলরকে নিয়েও বিখ্যাত শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন; আবার সালভাদোর দালিও নাকি ইনগ্রিড বার্গম্যানকে নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। আমাদের রাজ্জাক-কবরি বা রাইসুল ইসলাম আসাদকে নিয়ে আমাদের বড় শিল্পীদের কেউ কি কোনো ছবি এঁকেছেন?

স্থপতি হিসেবে Dancing House দেখা শেষ হলো। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে গেলাম পালাতস্কি স্কয়ারে ফ্রান্তিশেক পালাতস্কি স্মৃতিস্তম্ভ (František Palacký Monument) চত্বরে। মনুমেন্টটি চেক প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীক। বিখ্যাত চেক রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, লেখক ও চেক জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত ফ্রান্তিশেক পালাতস্কির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এই মনুমেন্ট। স্মৃতিস্তম্ভের কেন্দ্রে পালাতস্কির বসা একটি পাথরের ভাস্কর্য রয়েছে; তবে এই চত্বরে ব্রোঞ্জের বেশ কিছু অভিনব শৈলীর ভাস্কর্য রয়েছে যা এদের অভিনবত্বের কারণে যে কারোরই মনোযোগ কেড়ে নেবে। মনে করা হয়, ভাস্কর্যগুলো চেকদের জাতীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন ও জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতীক।

পালাতস্কি স্কয়ার (Palackého náměstí)-এর কাছেই সেন্ট থমাস চার্চ, হাঁটতে হাঁটতে সেখানেও গেলাম সবাই। ১৬৭৯ সালে ইতালীয় স্থপতি জিওভানি জর্জিও দ্বারা ডিজাইন করা এই চার্চটি চেক ক্যাথলিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কেন্দ্র। চার্চের চত্বরে রয়েছে সুন্দর একটি ওপেন এয়ার কফিশপ। সেখানে বসে আড্ডা দিতে দিতে আমরা কফি আর দারুণ স্বাদের স্লাইস করা কেক খেলাম। আমাদের কোনো মসজিদ চত্বরে এমন কফিশপ কি আশা করা যায়?

ওখান থেকে হেঁটে আমরা গেলাম জোসেফভ এলাকায় ডুউহোভা স্ট্রিট এবং ভিয়েনা স্ট্রিটের সংযোগস্থলে ছোট প্লাজার মতো স্পেসে স্থাপিত প্রিয় লেখক ফ্রান্‌ৎস কাফকার একটি ডায়নামিক মেটাল ভাস্কর্য দেখতে। ডায়নামিক বলছি এ কারণে যে, কাফকার আবক্ষ ভাস্কর্যটিকে বহু স্টেইনলেস স্টিল সমান্তরাল স্লাইসে ভাগ করা হয়েছে আর এই স্লাইসগুলো যান্ত্রিকভাবে ঘোরে; তাই ভাস্কর্যটির মাঝে একধরনের নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে যা জনবহুল চত্বরের সব শ্রেণির মানুষদের হয়তো কিছু সময়ের জন্য হলেও দাঁড়াতে বাধ্য করে—হোক না কাফকা নামের এই মানুষটি তার কাছে নিতান্তই অপরিচিত।

Dancing House দেখা হলো, ভ্লাতাভা নদীর অপরূপ রূপ দেখা হলো, চেক মনুমেন্ট দেখা হলো, দেখা হলো সেন্ট থমাস চার্চ আর কাফকার ভাস্কর্য; কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। কিছুতেই মন ভরছে না, কেননা বহু বছর ধরেই ইচ্ছে ইউরোপের কেন্দ্রভূমি এই প্রাগে স্থাপিত আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য দেখার, কিন্তু সারাদিনেও সেটা দেখা হচ্ছে না। তখনই ঠিক করলাম, তালিকার অন্য যা আছে সব বাদ দিয়ে প্রথমেই যেতে হবে ঠাকুরোভা, যেখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত আবক্ষ ভাস্কর্য। কিছু কিছু তৃষ্ণা বর্ণনা করা যায় না বা এর যৌক্তিক কার্যকারণও ব্যাখ্যা করা যায় না, যার সম্পর্ক থাকে হৃদয়ের অনেক গভীরে; ঠাকুরোভা যাওয়ার তাড়না নিশ্চিতভাবে এমনই কিছু একটা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুবার ভিয়েনা হয়ে প্রাগে গিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৯২১ সালে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর। পরের বার ১৯২৬ সালে। ১৯২১ সালে তাঁর সংক্ষিপ্ত সফরে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তিনিই প্রথম অ-ইউরোপীয় নোবেল বিজয়ী। সারা পৃথিবীর সংস্কৃতিবান মানুষ শুনতে চায়, জানতে চায় এই ঋষির মতো দেখতে মানুষটির কথা। সদ্য যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সন্ত্রস্ত মানসে তাই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলো সেখানকার বিপর্যস্ত শিল্পী ও সৃজনশীল সমাজের মধ্যে নতুন চিন্তা এবং যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে জন্ম নেওয়া সর্বব্যাপী হতাশার বিপরীতে নতুন আশাবাদ ও সৃজনশীলতার সূত্রপাত করে। এর মাধ্যমে প্রাগ তথা ইউরোপীয় চিন্তাশীল সমাজ বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়।

যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ কবিকে সরাসরি স্পর্শ করতে না পারলেও এই সময়ের অনেক আগেই তিনি হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, পিতা ও দুই সন্তান। তাই প্রিয়জন হারানোর কষ্ট তিনি নিজের জীবনে এরই মধ্যে অন্তরের গভীরে অনুভব করেছেন। ১৯২৬ সালের সফরে প্রাগের জাতীয় নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেই সারা বিশ্বে, বিশেষ করে ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের ওপর মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়; তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় চেকদের রবীন্দ্রপ্রীতি বোধ হয় অনেক বেশি। এমন কথাও শোনা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়া চেক অনেক সৈনিক 'গীতাঞ্জলি' থেকে কবিতা তাদের পকেটে করে সঙ্গে নিয়ে যেত। অন্যদিকে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত ব্রিটিশ কবি উইলফ্রেড ওয়েনের পকেটেও পাওয়া গিয়েছিল 'গীতাঞ্জলি'র এই গানটি:

'যাবার আগে এই কথাটি বলে যেন যাই— যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।'

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়বার প্রাগ ভ্রমণের পরপরই ১৯৩১ সালে চেক ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনী লেখা শুরু করেন প্রাগের চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর ভিনসেন্স লেসনি। তাঁর বই ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়; পরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত এই বইটির ইংরেজি অনুবাদের নাম হচ্ছে Rabindranath Tagore: His Personality and Work।

লেসনির এই বইয়ের প্রারম্ভে তাঁকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের বাংলায় হাতেলেখা একটি চিঠি হুবহু ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চিঠিটি ছিল এমন:

"... প্রিয় আচার্য লেজ্‌নি, শান্তিনিকেতনে একদিন তোমার সঙ্গে আমাদের মিলন হয়েছিল সে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি। নানা জাতির বিদ্যাসম্মিলনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের হৃদয়ের যোগস্থাপন শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তোমার সহায়তা ও সৌহৃদ্য আমরা মূল্যবান বলে মনে করি। অল্পকালের মধ্যে বাংলা ভাষার অন্তরে প্রবেশ করে আমার রচনার উপরে তুমি যে রকম অধিকার লাভ করেছ, সে আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয়। এমন ধারণা এবং বিচারের শক্তি আর কোনো বিদেশীর মধ্যে আমি দেখিনি। আমার লেখার সঙ্গে তোমাদের দেশের পাঠকদের যে পরিচয়সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছ সে জন্যে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো।

ইতি ৫ই অগাস্ট ১৯৩৬

স্নেহানুগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

বই প্রকাশের অনেক আগে লেসনি কিন্তু শান্তিনিকেতনে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি শান্তিনিকেতনে জার্মান ও গ্রিক ভাষা শেখাতেন।

শান্তিনিকেতনে আসবার আগেই তিনি সংস্কৃত ভাষাও শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে বাংলা শেখাতেন। সে সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং নাটক চেক ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত বইটি তিনি শেষ করেছিলেন এভাবে:

"From insight into the beauty of nature he arrived at a feeling of confidence in the destiny of mankind, from a conviction of the nobility of manÕs mission in the world he derives a wise philosophy, which culminates in his unhesitatingly positive attitude towards life and in his later conception of the divine nature of mankind."

তবে কিছুটা আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লেসনির বইটিকে পছন্দ করেননি। রবীন্দ্রনাথকে খুশি করা অত সহজ নয়। এ বইয়ের ভূমিকা লেখক বিখ্যাত সি. এফ. অ্যান্ড্রুজকে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

"শান্তিনিকেতন

৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় চার্লি,

আমার সম্বন্ধে লেখা লেস্‌নির বইটি ভালো হয়নি — বইটা ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত না হলেই ভালো হতো। বইটা ভুলে ভর্তি—সেটা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার রচনার সংক্ষিপ্তসার বলে যেটা দিয়েছে সেটা খুবই অসম্পূর্ণ, আর এটায় আমার লেখার মূল্য যেন সস্তা হয়ে গেছে।"

সার্বিকভাবে রবীন্দ্রদর্শন তৎকালীন প্রাগের চিন্তাশীল শিল্পী আর বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল আর তার স্বীকৃতি হিসেবে প্রাগ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির বিশাল মনোরম চত্বরে শহরের জোন-৬-এর একটা এলাকার নাম দেওয়া হয়েছিল ঠাকুরোভা (Thakurova)। আর এখানেই একটি সুন্দর পরিপাটি ঘাসের চত্বরের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্থাপন করা হয়েছিল উঁচু কাঠের বেদীর ওপর রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ একটি ভাস্কর্য।

কাফকার ভাস্কর্য থেকে ঠাকুরোভা গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে সেদিন। ভাস্কর্যের নিকটবর্তী প্রাগ শহরের মেট্রো স্টেশনটির নাম আজও কিন্তু ঠাকুরোভা। এই স্টেশনে নিয়মিত ওঠানামা করছেন এমন অনেককেই জিজ্ঞেস করেছি—জায়গাটার নাম ঠাকুরোভা কেন? তারা অনেকেই বিব্রত হয়ে হেসেছেন, কেউ কেউ কথা না বলেই হেঁটে চলে গেছেন; কিন্তু কেউই বলতে পারেননি ঠাকুর থেকে ঠাকুরোভা নামের উৎপত্তির কথা।

লেসনি ও অন্যান্য শিক্ষাবিদের সাথে চেকোস্লোভাকিয়াতে রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে যে প্রাগ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে গিয়ে গমগম করা প্রাণোচ্ছল অনেক ছাত্রছাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম; তারা কেউই বলতে পারে না রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্যটি কোথায় বা আদতে এমন কোনো ভাস্কর্য আছে কি না। সামনে ইউনিভার্সিটির চমৎকার গ্লাস লুভারে মোড়া বিশাল আধুনিক স্থাপত্যে ডিজাইন করা লাইব্রেরি ভবন, আর লাইব্রেরির নিচতলাতেই চমৎকার ক্যাফেটেরিয়া।

ক্যাফেটেরিয়ার চারদিকের গ্লাস ফ্যাসাদ দিয়ে সুন্দর আলো আসছে। প্রচুরসংখ্যক টেবিল সাজানো রয়েছে, অগণিত ছাত্র ও শিক্ষকেরা সেখানে খাওয়াদাওয়া করছে। পাশের টেবিলেই হয়তো গুরুগম্ভীর বয়স্ক শিক্ষকের দল আর অন্য টেবিলে তরুণ ছাত্ররা কিছুটা বিশৃঙ্খলভাবে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, কোনো পক্ষকেই বিরক্ত বা অপ্রস্তুত হতে দেখছি না। কোনো কোনো টেবিলে দেখছি ছাত্র আর শিক্ষকরা একত্রে খাচ্ছে আর কথা বলছে। অগত্যা আমরাও সেখানে লাঞ্চ করতে বসলাম। ক্যাফেটেরিয়া পুরোটাই চালাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। তারাই ক্যাশিয়ার, তারাই ওয়েটার, তারাই সব। চমৎকার এদের ব্যবহার। এক তরুণ ছাত্র দারুণ হাসিহাসি মুখে এসে আমাদের অর্ডার দিতে সাহায্য করল আর খুব আন্তরিকভাবে বলল ডেসার্ট হিসেবে যেন আজকের বিশেষ চিজ কেকটা অবশ্যই খেয়ে দেখি। খাবার খেলাম, ডেসার্ট হিসেবে চিজ কেকও খেতে হলো কিন্তু ঠাকুরোভা ভাস্কর্য সম্বন্ধে কোনো তথ্য না পাওয়ার কারণে কিছুটা বিরক্ত অনুভব করছিলাম। আশপাশের ছাত্রছাত্রীদের আবার জিজ্ঞেস করলাম রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য সম্পর্কে। চারদিকে এত ছাত্র আর শিক্ষক কিন্তু কেউই জানে না এমন কোনো ভাস্কর্যের কথা; আমাদের প্রশ্ন শুনে শুধু হাসে, যেন খুব অবান্তর কিছু জানতে চেয়েছি তাদের কাছে। একপর্যায়ে রেগে গিয়ে বললাম,

— আরে বাবা, এই জায়গার নাম ঠাকুরোভা কেন হলো তা জানো তোমরা?

আমাদের রাগের উত্তরে তারা শুধু বিব্রতভাবে ভদ্রোচিত সুন্দর হাসি দেয়, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। দেখলাম, কাছেই বিশাল আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট ভবন। ভাবলাম সেখানে যাই, আমার ধারণা ছিল আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের পোলাপানরা সাধারণত অনেক সেয়ানা হয়ে থাকে; তারা সারাজীবন অনেক প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসের খোঁজখবর রাখে, নিশ্চয়ই এটাও তারা জানবে। কিন্তু না, আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো; দেখলাম এখানকার আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের পোলাপানরা আরও বেশি ভেজিটেবল।

শেষমেশ এক লিকলিকে পড়ুয়া টাইপ ছাত্র পেলাম—পিঠে একটা বইয়ের ব্যাগ, কিছুটা কুঁজো হয়ে হেঁটে হেঁটে খুব ব্যস্তসমস্তভাবে কোথায় যেন যাচ্ছিল। অবশেষে সে-ই একমাত্র বলতে পারল ভাস্কর্যের লোকেশন, তবে তার ওপর

আমাদের তেমন ভরসা হলো না। তাই তাকে অনুরোধ করলাম আমাদের সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। কিন্তু সে যেতে রাজি হলো না; সাধারণত সিরিয়াস ভাবধারার ছাত্ররা একটু কম পরোপকারী হয়ে থাকে। সেটা মেনে নিয়েই তার নির্দেশিত পথেই আমরা এগোলাম আর কিছুক্ষণ হাঁটার পরই পেয়ে গেলাম দুই পাশে বিশাল গাছের সারির মাঝে সবুজ ঘাসের চত্বরের মাঝে কাঠের বেদীর ওপর বসানো আমাদের রবি ঠাকুরের আবক্ষ ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য।

আসলে নতুন প্রজন্মের নতুন জগতের নতুন আকাঙ্ক্ষায় এখানকার যুবক-যুবতীরা রবীন্দ্রনাথকে বোধ হয় এখনো আবিষ্কার করতে পারেনি। হয়তো পারবেও না কোনো দিন, অথবা হয়তো পারবে কোনো একদিন। যাই হোক, ভাস্কর্যটির সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো—আমার রবীন্দ্রনাথকে এই জাতি সম্মান করেছে, সেই সম্মান আমার অস্তিত্বকেও ছুঁয়ে গেছে অবলীলায়। কোনো এক অদ্ভুত জাদুতে আমিও তখন সবকিছুর সঙ্গে সম্মানিত ও একাত্মবোধ করতে লাগলাম। নিজের অজান্তেই আমার মনের গভীর থেকে রবীন্দ্রনাথের সেই গান বেজে উঠল:

“বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

নয়কো বনে, নয় বিজনে

নয়কো আমার আপন মনে,

সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,

সেথায় আপন আমারো”

এই সুদূর ইউরোপের অচেনা মাটিতে একজন বাঙালি হিসেবে, একজন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে এর চেয়ে বেশি আমি কী-ই বা আর চাইতে পারি?

বোম্বে বিচ: ক্যালিফোর্নিয়া

রওনক আফরোজ

গন্তব্য বোম্বে বিচ। মুম্বাইয়ের না, ক্যালিফোর্নিয়ার বোম্বে বিচ! নাম শুনে প্রথম দিন আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম। হোক্স না, এটা ক্যালিফোর্নিয়ার সালটন সাগরের উপকূলের এক জনপদ।

বরাবরের মতোই আজও ট্রিপের শুরুতে ভিজিটর সেন্টারে থামার কথা, কিন্তু সাইনটা চোখে পড়ার পর গাড়ির গতি কমাতে কমাতে প্রবেশপথ পার হয়ে গেল। মন উড়ুক্কু হলে চোখের আর কী দোষ?

সালটন সি ভিজিটর সেন্টারটা বাসা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মক্কা (Mecca) নামের শহরে অবস্থিত। নাম পড়ে আমিও কপাল কুঁচকে বুঝতে চেষ্টা করেছি এ নামের শহর এখানে কীভাবে এল!

ইন্দিও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ছোট, প্রাণবন্ত, ফুটফুটে শহর। এখান থেকে গ্রেপভাইন বুলেভার্ড হয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ১১১ সাউথে কোচেলা ভ্যালির ওপর দিয়ে দশ মিনিট ড্রাইভ করলে শহরের ঝকঝকে চেহারা আর দেখা যায় না। রাস্তার দুই পাশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিংয়ের ভেঙে পড়া দেয়াল, জং ধরা মেটালের পাঁজর, কাঠসাঁটা একদা-কাঁচের জানালা, সম্পূর্ণ মৃত গ্যাস স্টেশনগুলোর মাঝে মাঝে জীবন্ত দু-একটা গ্যাস স্টেশনের ডিজিটাল সাইনগুলোও টিমটিমে।

এটাই এখানকার মক্কা। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড কাউন্টির একটি অসংগঠিত এলাকা, যেটা সালটন সাগরের উত্তর উপত্যকায়। কৃষিকর্ম বিশেষ

করে খেজুর চাষ এবং বিশাল হিস্পানিক জনবসতির জন্য পরিচিত এই শান্ত, গ্রামীণ এলাকা।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করা চারা থেকে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান খেজুর-শিল্পকে ঘিরে বিশেষ কৃষিকেন্দ্র হয়ে ওঠা এই এলাকায় 'আরবীয়' ভাবধারাকে উপস্থাপিত করতে এবং মরুভূমির ভূদৃশ্য ও রোমান্টিকতার সাথে মিল রেখে এলাকাটিকে রিসোর্ট এলাকা হিসেবে প্রমোট ও প্রচার করার জন্য ১৯০০ সালের প্রথম দিকে 'ওয়াল্টার্স' নামক এই শহরকে মক্কা নামে পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বিষয়গত সংযোগ স্থাপনের প্রয়াসে এই এলাকায় 'ক্যারাভান সরাই' নামে হোটেল ছাড়াও আঞ্চলিক ব্র্যান্ডিংয়ে আরবীয়-থিমযুক্ত নকশা ও স্থাপত্যে অনেক স্থাপনা তৈরি করা হয়। আশেপাশের শহরের নাম থারমাল, ওয়েসিস (Thermal, Oasis, Rancho Mirage ইত্যাদি) সেই একই কারণে।

ভাবনার দোলাচল থেমে গেল রাস্তার দু-পাশের বিস্তৃত খেজুর গাছের অমসৃণ শৈল্পিক দেহসম্ভার দেখে। সারি সারি সব একই সাইজের গাছ। দশভুজা গাছেরা আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরেছে নিজেকে। কোনো কোনো বাগানে মায়ের পাশে শিশুগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

কী চমৎকার দৃশ্য! কৈশোরে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইটি আমাকে নিচে পাহারায় রেখে কতদিন খেজুরের রস চুরি করেছে। তখন ওইসব গাছ দেখে তো এমন ভালোলাগা, উল্লাস অনুভূত হয়নি! হওয়ার কথা ছিল কি?

কবি নজরুলের সাহারা মরুর না, এ কলোরাডো মরুর খর্জুর-বীথি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আলজেরিয়া খেজুরের বীজ দিয়ে যেটার পত্তন হয়েছিল। 'লু' হাওয়ায় ওড়না উড়িয়ে নেচে যাওয়া কোনো পরি-নর্তকীকে নজরুল ছাড়া অন্য আর কেউ দেখেছে কি না, জানি না। আমিও কোনো পরি দেখলাম না। শুধু দেখছি খর্জুর বীথির ওপরে নীলাকাশের বুকে উড়ছে সাদা মেঘের ওড়না।

গাড়ি স্লো করতে করতে সামনের প্রবেশদ্বার পার হয়ে যাওয়ায় পেছনের একটা অপ্রশস্ত পথ দিয়ে পার্কিং লটে ঢুকতে হলো। বিশাল পার্কিং লটের একদিকে পুরোনো ছোট ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বিল্ডিং, ওটাই—সালটন সি ভিজিটর সেন্টার। পার্কিং লটের এক প্রান্তে পাশাপাশি কংক্রিটের রঙচটা গোলাকৃতির ছাতার নিচে কয়েকটা পিকনিক টেবিল-চেয়ার একের পর এক সাজানো। প্রায় জনশূন্য পিকনিক এরিয়া।

সেন্টারের ভেতরটা ছোট, সুন্দর। স্যুভেনির আইটেম, পোস্টকার্ড, বিভিন্ন রকম স্টাফড পাখি, স্টাফড র‍্যাটল স্নেক (ঝুনঝুনি সাপ), খেঁকশিয়াল ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। ওখানে আমি ছাড়া আরও দু-জন দর্শনার্থী, ভারতীয় স্বামী-স্ত্রী। মহিলা নানান রকম প্রশ্ন করছে, ভদ্রলোক পাশে দাঁড়িয়ে।

দু-জন রেঞ্জার আগ্রহ ও ধৈর্য নিয়ে নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় এই রেঞ্জাররা প্রকৃতিপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী হয়। তবে এরা অধিকাংশই কমিশনড পুলিশ। আলাস্কা থেকে অ্যালাবামা—কোথাও কখনও কোনো পার্ক রেঞ্জারকে আমি গুমটোমুখো দেখিনি। এরা সদাহাস্য, সদাবিনয়ী, সদাতৎপর।

'সাগর', নামকরণ করলেই তো আর সাগর হয় না; তবুও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ ফুট নিচে মরুর কোলে ১৫ মাইল প্রস্থ এবং ৩৫ মাইল দীর্ঘ এই জলাধারকে এরা সাগর-ই বলে, "সালটন সি"। নামিবিয়ার নামিব মরুর উষ্ণ বালুর পাহাড় যেমন হঠাৎ করেই শীতল আটলান্টিকে নেমে গেছে, তেমন-ই হঠাৎ কলোরাডো মরুর বুকে সাগর নামের এই জলাধার; তবে ভূ-আবদ্ধ, বের হবার পথ নেই। মরীচিকা না, মরুদ্যানও না, ৫২৫ বর্গমাইল জুড়ে থেমে যাওয়া পানি।

১৯০৫ সালে কলোরাডো নদীর বন্যার পানি সেচের জন্য তৈরি ক্যানাল ভেঙে সালটন বেসিনে ঢুকে আটকে গিয়ে বিচ্ছিন্ন জলাধার হিসেবে থেকে যায়। এর অন্য নাম, "এক্সিডেন্টাল সি"।

টক লেবু থেকে যেমন লেমোনেড তৈরি করা হয়—কলোরাডো নদীর চলমান উপচে পড়া পানি ব্যবহার করে কৃষিকর্ম পক্ষান্তরে সমৃদ্ধ হতে থাকে। সালটন সি ও এর চারদিকের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কারণে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই সাগরকে ঘিরে ক্রমে তৈরি হয় বিশাল বিনোদন কেন্দ্র। জলক্রীড়া, নৌ-বিহার, মাছ ধরা ইত্যাদির জন্য এটা একটা জনপ্রিয় গন্তব্য ছিল। অনুষঙ্গ হিসেবে আশেপাশের জনপদে, বিচে গড়ে ওঠে নাইটক্লাব, হোটেল, ম্যারিনা ইত্যাদি। স্থানীয় মরুবাসী ছাড়াও বাইরের ভ্রামণিকগণও এখানে আসতে শুরু করেন। এদের মধ্যে হলিউড তারকাদের অনেকে প্রমত্ত শহরের কোলাহল ছেড়ে অবকাশ যাপনে এদিকে আসেন। সুখ্যাত গায়ক ফ্র্যাঙ্ক সিনাত্রারাও সেই সময় এখানে সংগীতানুষ্ঠান করেছেন।

সত্তর দশকের শুরু থেকে ক্রমে একদিকে সালটনের পানি শুকিয়ে যেতে থাকে; অন্যদিকে, কীটনাশক আর সার দূষিত পানি তলদেশের খনিজ রাসায়নিক পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষতিকর পাউডার তৈরি হয়। ফলে, মাছ, পাখি মরে যেতে শুরু করে। লবণাক্ততা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেলে জলপ্রেমীদের সাথে ক্রমে উধাও হয়ে যায় সংশ্লিষ্ট বিনোদন ও বাণিজ্য; পেছনে পড়ে থাকে উপকূলের ভঙ্গুর অবয়ব।

আলাস্কা থেকে পাতাগোনিয়া যাওয়ার "প্যাসিফিক ফ্লাইওয়ে"-র পথে শীতের পাখিদের বিরতির জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্পট ছিল। পাখি-প্রেমী, পেশাদারি ফটোগ্রাফারও সে কারণে এখানকার নিয়মিত অতিথি ছিলেন। কিছু পাখি এখনও আসে। আমিও এসেছি মৃত, পরিত্যক্ত এক সাগর দেখতে।

"কী আছে, বিশ্ব ঘুরে এত কিছু দেখার পরে, ওখানে কী দেখতে যাচ্ছ?" আমার এক আমেরিকান কলিগ অবাক চোখে জানতে চেয়েছিল। বলেছি, কেন ওটা দেখতে যাব না, সেটা-ই দেখতে যাচ্ছি।

আমি আগ্রহ নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সাগরের ওপারে পাহাড় দাঁড়িয়ে, এ পাশে ঝোপঝাড় বুকে দীর্ঘ বালিয়াড়ি শুয়ে। এর এক প্রান্তে ভিজিটর সেন্টার, পাশের সার্ভিস রোডের ওপাশে হাইওয়ে এক-এগারো।

ভিজিটর সেন্টারে দেখা প্রামাণ্যচিত্রে এই এলাকার অতীতের জমজমাট অবস্থা দেখে বুঝলাম আজকের এই শূন্যতার ব্যাপ্তি কতখানি। স্মৃতিমন্দ্রিত সেই সময়টা কাত হয়ে পড়ে থাকা ট্যাভার্নের ধাতব ছাদ, বোর্ড-ওয়াকের ভাঙা পাটাতন, নৌকা নামানোর র‍্যাম্প, মাছ ধরার স্টেজ—এসবের মধ্যে আটকে আছে। অবধারিত সময় কেমন বদলে দিয়েছে সবকিছু।

ছোট-ছোট ঝোপঝাড় এড়িয়ে বালুর ওপর দিয়ে পানির দিকে হাঁটতে লাগলাম। এর মধ্যে দু-একজন ভিজিটর এদিক-ওদিক দেখা গেল। আমার পাশ দিয়ে বিশাল ক্যামেরা, ক্যামেরার স্ট্যান্ড হাতে দু-জন মহিলা হেঁটে সাগরের দিকে চলে গেলেন। সংখ্যায় অল্প হলেও ফটোগ্রাফাররা তাহলে এখনও এদিকে আসেন। এখানে বাতাসে কেমন যেন ভারি, ঘন। যত পানির কাছে গেলাম দুর্গন্ধ আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

সময় বদলে গিয়ে ইতিহাস হয়। যদি বস্তুর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করি তবে অতীত এখন কোন লোকে অথবা অ-লোকে বিরাজমান, কে জানে!

আকাশে ধূসর মেঘ, বাতাসে জড়িয়ে আছে লুপ্ত এক জন-জীবনের দীর্ঘশ্বাস। আমেরিকার একমাত্র রাজপ্রাসাদ হাওয়াইয়ের রানি আইওলানির সজ্জিত প্রাসাদ-জাদুঘর, পেরুর মাচুপিচু, কম্বোডিয়ার আংকর ওয়াটে গিয়েও আমার এমন অনুভূতি হয়েছিল। কষ্টের কেমন একটা অপরিচিত অনুভূতি ভাবিয়েছিল। সভ্যতার সৃষ্টি ও ধ্বংসের একই ইতিহাস, প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সময় বদলে গিয়ে ইতিহাস হয়। যদি বস্তুর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করি তবে অতীত এখন কোন লোকে অথবা অ-লোকে বিরাজমান, কে জানে! বিষণ্ন মনে আমি গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলাম। এই রোডট্রিপের পরের স্টপ বিখ্যাত বোম্বে বিচ। মুম্বাইয়ের না, ক্যালিফোর্নিয়ায় বোম্বে বিচ!

একটাই রাস্তা। হাইওয়ে এক-এগারো ধরে সালটন সি স্টেট রিক্রিয়েশন এরিয়া ভিজিটর সেন্টার থেকে বোম্বে বিচ দক্ষিণে প্রায় ২০ মাইল পথ। এই পথটি সালটন সাগরের পূর্ব তীর ধরে মরুভূমির দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে গেছে। ফাঁকা হাইওয়ে। এর সমান্তরালে রেললাইন। অতিদীর্ঘ ধীরগতির একটা মালবাহী ট্রেন আমার উল্টো দিকে চলে গেল।

জিপিএস জানাল এসে গেছি। "ওয়েলকাম টু বোম্বে বিচ"—এবার আর সাইন মিস করিনি।

ডানের রাস্তায় ঢুকে কোয়ার্টার মাইল যেতে "ইনফরমেশন" সাইন দেখে পাশের পার্কিংলটে গাড়ি পার্ক করলাম। ওখানে আরও চারটা গাড়ি আছে। অপ্রশস্ত বারান্দা পার হয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আমি একদম হতচকিত হয়ে গেলাম।

কোথায় ইনফরমেশন সেন্টার? এটা তো রেস্টুরেন্ট কাম বার! ডাইভ-বার। গ্রাম্য কায়দায় এর বাহিরটা সাজানো, ভেতরটা আরও অদ্ভুত। ভিড় গমগম করছে, খাবারের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—এডোবো, পোড়া চিজ, ঝলসানো মাংস! এখন লাঞ্চটাইম। সবার হাতেই বিয়ারের বিরাট গ্লাস অথবা অন্য কোনো পানীয়, সামনে খাবার। সবাই কথা বলছে, উচ্চকণ্ঠে হাসছে। কে বলছে আর কে শুনছে বোঝা মুশকিল। এক অন্যরকম মুখরতা। তাদের হিলবিলি মার্কা চেহারাগুলো যেন অতীতের অদ্ভুত কোনো সময়ের। ভেতরের দেয়াল এবং ছাদ স্বাক্ষরিত ডলারের নোট দিয়ে ঢাকা। বার-টেবিলের ওপরে, চারদিকে ঝুলছে সবুজ ডলারবিল। কোথাও আঠা দিয়ে সাঁটানো, কোথাও সুতো দিয়ে মালার মতো করে গাঁথা। টেবিলের ওপরে সাজানো স্বচ্ছ বোতলে ডলার। ঘরের একপাশে রাখা পিয়ানোর রিডগুলো পর্যন্ত ডলারময়।

প্রাচীনগন্ধী, অদ্ভুত এই ক্যারাভান-সরাই বা সরাই "স্কি ইন" নামের সেই বিখ্যাত ডাইভ বার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩৭ ফুট নিচে অবস্থিত, পশ্চিম গোলার্ধের সবচেয়ে নিচু বার হিসেবে পরিচিত। এই অদ্ভুত, ঐতিহাসিক বার স্থানীয়দের জন্য নিশ্চয় যথেষ্ট স্মৃতিকাতর আবহের উৎস। আমেরিকার শেফ, বিশ্ববিখ্যাত ভ্রামণিক অ্যান্থনি বোরডেইন এই রেস্টুরেন্ট-বারের কথা একসময় উল্লেখ করেছিলেন।

আমার পেড্রো পারামোর কামেলা টাউনের কথা মনে পড়ে গেল। এটা কোথায় এলাম! ভাবতে ভাবতে দ্রুত বের হয়ে পার্কিংলটে এসে দাঁড়ালাম। সামনে রাস্তার ওপারে "ইনফরমেশন" লেখা সাইনের তিরচিহ্নটা এখনও এদিকেই দেখাচ্ছে। এটার ডানদিকের গলির পাশে নির্ণয়-অযোগ্য কিছু স্থাপনা, বামে পাশাপাশি চিত্রিত একটা মোবাইল হোম আর একটা বেশ বড় রিক্রিয়েশন ভেহিকেল—সবকিছুই মলিন, পরিত্যক্ত।

রাস্তার ধারে আরও কয়েকটা সাইনবোর্ড। থাকুক, আমার ইনফরমেশন দরকার নেই। একটু হেঁটে খোলা জায়গায় এসে বুঝতে চেষ্টা করলাম কোন দিকে যেতে হবে। রাস্তার পশ্চিম পাশে ছোট ছোট ঝোপঝাড় বুকে মরুভূমি, পূর্বে কিছু ভাঙাচোরা বাড়িঘরের ভেতর দিয়ে সাইনহীন সংকীর্ণ রাস্তা চলে গেছে। পেছনে যে রাস্তা রেখে এসেছি এটা তারই এক্সটেনশন!

এই রাস্তা ধরেই উপকূলের সন্ধানে এগোতে থাকলাম। রাস্তার ডানে ফাঁকা মরুভূমি। বামে অদ্ভুত ল্যান্ডস্কেপ সমৃদ্ধ ভিন্ন এক জগৎ। পরিত্যক্ত জিনিসপত্র দিয়ে শৈল্পিক এবং অনন্য সব ডিজাইন। এক পামের পাতার বেড়ায় অঙ্কন, পরিত্যক্ত গাড়িতে, বাড়িঘরে ছবি আঁকা, মানুষের চেহারার ক্যারিক্যাচার, কাল্পনিক কিম্ভূতকিমাকার কোনো-কোনো চরিত্র, কাল্পনিক জীবজন্তু, মোচড়ানো লোহালক্কড়, গাড়ির টায়ার, ভাঙা চেয়ার—এসব দিয়ে ভাস্কর্য। এমন কোনো বস্তু মনে হয় জগৎসংসারে নেই

যেটা এখানে ব্যবহার করা হয়নি। কী বিস্ময়, এ এক পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক ল্যান্ডস্কেপ যেন!

জনশূন্য অদ্ভুতুড়ে জায়গা। রাস্তার পাশে বালুর ওপরে ইঞ্জিন চালু রেখে আমি গাড়ি থেকে নেমে এলাম। এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে, গলা উঁচিয়ে কোনো মানুষের নমুনা পেলাম না। "খাঁ খাঁ করছে", এ কথা শুনলে যে দৃশ্য চোখে ভাসে, মানবহীন এই ভৌতিক জায়গাটা তেমন-ই খাঁ খাঁ করছে। আমি নিশ্চিত মধ্যদুপুরে আমি স্বপ্ন দেখছি না। একটা বিয়ারও খাইনি। কারা করেছে এসব শিল্পকর্ম? এই এলাকার সব মানুষই কী ওই রেস্তোরাঁয়? এ তো হুয়ান রুলফের সেই কামালা সিটি! ওই রেস্তোরাঁয় কী তবে পেড্রো পারামোও ছিল!

জানালাহীন, সিঁড়িহীন অথচ হাঁটুসমান উঁচু আয়তাকার কেরোসিন কাঠের তৈরি পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানের খালি জায়গাটুকু থেকে ঘরের ভেতরে উঁকি দিতে যাব, হঠাৎ একটা ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ পেয়ে দ্রুত গাড়িতে এসে বসলাম।

ভিজিটর সেন্টার থেকে সংগ্রহ করা ম্যাপটায় চোখ বুলিয়ে প্রেতপুরীর রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে একমুখী একটা রাস্তায় অজান্তেই ঢুকে গেলাম। রাস্তার বাম পাশে যথেষ্ট খোঁড়াখুঁড়ি করে ওভাবেই ফেলে রাখা হয়েছে। ডানে ফ্লাড ওয়ালের মতো সাত-আট ফুট উঁচু খাড়া মাটির পাহাড়। সামনে কিছুটা জায়গায় পানি জমে আছে। আন্দাজ করলাম ফ্লাড ওয়ালের ওপাশে সালটন সি এবং বিচ। সামনে জমে থাকা পানির গভীরতা জানি না, তাই ঝুঁকি না নিয়ে চিপার মধ্যে কোনো রকমে গাড়ি ঘুরিয়ে পেছনে ফেলে আসা অন্য একটা গলিতে ঢুকলাম। ওই বার প্লাস রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আসার পরে এতটা সময় কোনো মানুষ দেখিনি। সেই যে ঠাকুরের গানটা, "তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি"। আমি অবশ্য বাঁশির বদলে নাকডাকা শুনেছি। বোম্বে বিচে যে ৩০০ জন মানুষের বাস করার কথা শোনা যায়, তারা তাহলে এইসব আধিভৌতিক অথবা অতিভৌতিক বাড়িঘরগুলোতেই বসবাস করে।

মানবহীন এই মিথিক্যাল মরুটাউন তখন দ্বিপ্রহরের টানটান রোদ খাঁ খাঁ করছে। বিবশ বাতাসে উড়ন্ত ধুলায় রোদের তুলি থেকে নানা রঙ ছড়িয়ে পড়ছে। একটা দু-টো কাক, ক-টা ধূসর রঙের অচেনা পাখি নীলাকাশের পথ ধরে অজানায় উড়ে গেল।

ভয়-ডর আমার এমনিতেই কম। তাছাড়া দিনের আলো যতক্ষণ আছে, না ঘাবড়ালেও চলবে। পেড্রো পারামো যতই মাচো হোক, অন্ধকার ছাড়া ওর ভূত এই রোদে বের হবে না। জরাজীর্ণ বাড়িঘর, বিষাদখিন্ন বাতাস, পরিত্যক্ত বিনোদন-গাড়ির গাত্র-চিত্র—আমার ভেতরেও এক ধরনের শূন্যতা জাগিয়ে তুলল। ঠাকুরকে মনে পড়ল, "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে"...

আরও একটু এগিয়ে চাপা গলিটা থেকে বের হতেই সত্যি কী ভূত দেখলাম! রাস্তার পাশে ছিপছিপে, প্রায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা একটা মেয়ে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বেতকায় কিন্তু রোদ-পোড়া ত্বক। হাফপ্যান্ট, ট্যাংকটপ, স্লিকার পরা,

মাথায় হেডফোন। বয়স সতেরো-আঠারো। নাহ্, ভূত না, একদম জীবন্ত মানুষ, পা মাটিতে।

—এক্সকিউজ মি, ডু ইউ লিভ হিয়ার? জানালার কাঁচ নামিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলাম।

—ইয়াপ, আই ডু। হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? মেয়েটা সাইকেল নিয়ে এগিয়ে এল।

—আই থিঙ্ক আই অ্যাম লস্ট! ডু ইউ অলসো থিঙ্ক আই অ্যাম লস্ট? আমি মুচকি হাসি।

মেয়েটাও হেসে ফেলে। দাঁতগুলো হলদেটে।

—হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর?

—বোম্বে বিচ, হাউ ক্যান আই...

—ওকে, স্ট্রেইট এহেড। মেয়েটা ইশারা করে।

বলে কী, সামনে তো মাটির পাহাড়! ওপাশে কী আছে কিছুই দেখা যায় না!

—আর ইউ সিওর? ক্যান আই ড্রাইভ আপ দেয়ার?

—ইয়েস, ইয়েস ইউ ক্যান; কিন্তু খুব সাবধানে যাবে। মাটির রাস্তা, রাফ। কিপ অন দ্য রোড ডোন্ট গো অফ....ইউ মাইট গেট স্টাক ইন মাড।

মাটির পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছি। অটো ট্রান্সমিশনের এসইউভি; অনেক সুবিধা। এক্সিলারেটর জোরে চেপে ধরলাম। একটানে উঠে এসে সমতল পেয়ে থেমে গিয়েই আমি থমকে গেলাম—হোলি মোলি, এটা কী?

সামনে বিশাল উপুড়-আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ স্থাপত্য-জাদুঘর দাঁড়িয়ে আছে শিল্প অনুরাগী দর্শনার্থীদের অপেক্ষায়। নির্দিষ্ট কোনো পার্কিং লট নেই, আবার যেদিক-সেদিক যেতে নিষেধ করেছে মেয়েটা। চোরাবালি, কাদায় গাড়ি আটকে যাক—সেই রিস্ক নেওয়া যাবে না। একটি সেমিট্রাকের পাশে গাড়ি পার্ক করলাম।

বালিয়াড়ি জুড়ে কোথাও ছোট ছোট জটলা, কোথাও বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে, কেউ ছবি তুলছে। চারদিকে ছড়ানো, ছিটানো বিভিন্ন রকমের ধাতব, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি স্থাপত্য। একটায় রোদ ঝলকাচ্ছে তো একটা জং ধরা, ধুলোভরা। পরিত্যক্ত রেস্টুরেন্টের মডেল, মৃতগাছ, চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজানো কৃত্রিম উঠোন, নৌকার কঙ্কাল, মা-মেরির একটা সাদা মূর্তি। এসব ছাড়িয়ে দূরে পাহাড়ের ব্যাকড্রপে শাড়ির পাড়ের মতো পড়ে আছে এক টুকরো সালটন সাগর।

এটাই বোম্বে বিচ। এইমাত্র জনপদে দেখে আসা পরাবাস্তব পরিবেশটা এখানে নেই। মার্কেটিংয়ের সুবিধার জন্য সালটন রিভিয়েরার অংশ হিসেবে ভারতের বিখ্যাত বোম্বে বিচের অনুকরণে ১৯২৯ সালে ডেভেলপাররা এই এলাকার নাম রেখেছিল। স্বর্ণযুগে মরুবাসীদের জন্য সেটা ছিল এক আনন্দময়, ক্লান্তি, ক্লেদ মুক্ত, রমরমা অবকাশ যাপনের আকাঙ্ক্ষিত উপকূল। এখন এখানে ভূতের ছায়া একে অন্যের গায়ে ধাক্কা খায়। আজ এর পানি ছোঁয়াও নিষেধ!

টাঙ্গুয়ার হাওরের রুদ্ধশ্বাস দিন

শাহনাজ আক্তার

সুনামগঞ্জের বন্যার খবর বরাবরই সংবাদপত্রের পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় দেখতাম। ২০২২ সালের জুন মাসে টাঙ্গুয়ার হাওর ভ্রমণে গিয়ে আমি নিজেই সেই মহাপ্রলয়ের সাক্ষী হয়ে রইব, তা ছিল কল্পনাতীত!

১৩ জুন, ২০২২। ঢাকার তপ্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেতে আমরা রাতের বাসে রওনা হলাম সুনামগঞ্জের পথে। মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম একটু বৃষ্টির জন্য, অথচ জানতাম না সেই বৃষ্টিই আমাদের জন্য কী ভয়ানক রূপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। পরদিন ভোরে যখন সুনামগঞ্জে নামলাম, চারপাশ তখন ধূসর মেঘে ঢাকা। নাস্তা সেরে অটোতে করে যখন তাহেরপুর ঘাটে পৌঁছালাম, তখন শুরু হয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ট্রলারে উঠতেই সেই বৃষ্টি রূপ নিল মুষলধারে বর্ষণে।

বৃষ্টি একটু কমলে আমাদের ট্রলার চলল ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। চারদিকে থৈ থৈ পানি, গাছপালা আর রিসোর্টের মাঝ দিয়ে ভেসে চলা—এক অপূর্ব অনুভূতি! ট্রলারের ছাদে বসে হাওরের মাছ আর আলু ভর্তা দিয়ে দুপুরের আহার সেরে আমরা রওনা হলাম নীলাদ্রি লেকের দিকে। মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা মেঘের লুকোচুরি আর আধো-আলোর সেই সন্ধেটা ছিল মায়াবী। রাতে টেকেরঘাটে আড্ডা আর গল্পে মেতে রইলাম আমরা।

পরদিন সকালে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা লাকমাছড়া ঝর্ণার সৌন্দর্য দেখে যখন শিমুল বাগানের দিকে রওনা হলাম, তখনই প্রকৃতির মেজাজ বদলে গেল। আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর উত্তাল ঢেউয়ে আমাদের

ট্রলার খড়কুটোর মতো দুলতে লাগল। মাঝির কণ্ঠে আশঙ্কার সুর, "স্রোত খুব ভয়ানক, লাইফ জ্যাকেট পরে নিন।"

ভয়ে আমাদের বুক কাঁপছিল। সাঁতার না জানা সঙ্গীদের চোখেমুখে তখন স্পষ্ট আতঙ্ক। শামীম ভাই অভয় দিচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির সেই উন্মাদনার সামনে মানুষ কত অসহায়, তা প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছিলাম।

চারপাশে শুধু পানি আর পানি, কোথাও একটু মাটির দেখা নেই। হঠাৎ আমাদের মাঝি একটি উঁচু রাস্তা ভেসে থাকতে দেখে ট্রলার ভেড়ায়। রাস্তার ওপরে তখন হাঁটু সমান পানি। মুহূর্তের মধ্যেই সেই পানি কোমরের দিকে উঠতে শুরু করল। বিদ্যুৎ নেই, মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন। আমরা এক কাপড়ে ভিজে একাকার হয়ে আছি। চারদিকে শুধু পানির গর্জন আর বজ্রপাত। এমনকি বন্য শিয়ালগুলোও আশ্রয়ের খোঁজে লোকালয়ের রাস্তায় চলে এসেছে। রাতটি ট্রলারেই কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে সুরমা ব্রিজের কাছে যখন পৌঁছালাম, শুনলাম আমাদের ঠিক আগেই এক ট্রলার থেকে নামতে গিয়ে দুজন মানুষ প্রবল স্রোতে ভেসে গেছে। বুকটা ধক করে উঠল। মানুষের জীবন প্রদীপের শিখাটা কতটা ভঙ্গুর!

সুনামগঞ্জ শহর তখন পানির নিচে। কোনো হোটেল রেস্তোরাঁ খোলা নেই, থাকার জায়গা নেই। হাজার হাজার মানুষ আর শত শত যানবাহন আটকে আছে এক অনিশ্চিত গন্তব্যে। খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দিলে বৃষ্টির পানি বালতিতে জমিয়ে আমাদের তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছে। শামীম ভাইয়ের দূরদর্শিতায় আমরা কিছু শুকনো খাবার আর পানি পেয়েছিলাম, যা আমাদের টিকে থাকার রসদ জুগিয়েছে।

পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ, সবার সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। এরই মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষার্থীর উদ্ধারের খবর এল। আমরাও আশায় বুক বাঁধলাম। কিন্তু অনিশ্চয়তা কাটছিল না। অবশেষে এক সহৃদয় মাঝির দেখা পেলাম, যিনি নিজের পরিবারসহ জামালগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর ট্রলারেই আমরা ভৈরবের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম।

মাঝ রাতে যখন ট্রলার চলল, আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দিচ্ছে। সেই চাঁদের আলোয় প্রলয়ঙ্করী বন্যাকেও অদ্ভুত সুন্দর মনে হচ্ছিল। মাঝির স্ত্রী আমাদের জন্য পরম মমতায় ডাল-ভাত রান্না করে খাওয়ালেন। সেই সাধারণ খাবারের স্বাদ অমৃতকেও হার মানিয়েছিল।

১৯ তারিখ যখন ভৈরব থেকে ঢাকার বাসে উঠলাম, তখন এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলাম, জীবন কত অদ্ভুত! এই কয়েকটা দিনে চেনা মানুষগুলো আরও আপন হয়েছে, আর অচেনা মানুষগুলো হয়ে উঠেছে পরিবারের অংশ। বন্যা আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেল, টিকে থাকার জন্য মানুষের বিলাসিতার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু এক চিলতে আশ্রয় আর সহমর্মিতার।

সুনামগঞ্জের সেই উত্তাল জলরাশি আর মানুষের হাহাকার আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজীবন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সীমানা পেরিয়ে

সাইফুল ইসলাম রিপন

প্রাণীকুলে সকল প্রাণীই একটা সীমানা নির্ধারিত করে নেয় নিজের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় খাদ্য নিশ্চিত ও বংশবিস্তারে। নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাণী বাস করতে পারে। এর বেশি হলে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, পরিবেশ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। যেমন ধরুন মাসাইমারা, কেনিয়া। একটা নির্দিষ্ট এলাকা। তৃণভোজী প্রাণীদের জন্য নির্দিষ্ট সমান পরিমাণ ঘাসের বেশি উৎপাদন সম্ভব নয়। সেটার ওপর নির্ভর করে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা। আবার এর ওপর নির্ভর করে মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা। তাই সিংহ অন্য সিংহের বাচ্চাকে হত্যা করে, কিংবা চিতা চিতার। এরা কেউই চায় না যে প্রাণীর সংখ্যা বেশি হয়ে তাদের খাদ্যের সংকট হোক। তৃণভোজীরা অন্য প্রজাতির সঙ্গে আক্রমণে যায় না, কারণ তাদের খাদ্য আলাদা। যেমন, আফ্রিকার মাইগ্রেশনে জেব্রা সবার আগে চলে। জেব্রা শুধু ওপরের কচি ঘাস খেতে পারে। ওদের মুখটা সেভাবে তৈরি, ঘাসের নিচ পর্যন্ত পৌঁছায় না। এরপরে আসে ওয়াইল্ড বিস্ট। সে নিচের গোড়ার ঘাস খায়, সেভাবেই তার মুখমণ্ডল সৃষ্টি। তাই জেব্রার সঙ্গে ওয়াইল্ডার বিস্টের সংঘাত হবার সম্ভাবনা নেই।

আমার ধারণা ছিল শুধু কিছু কিছু প্রাণী এই সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে সীমাবদ্ধ। আসলে সেটা না। প্রায় সব প্রাণীই সীমানা নির্ধারণ করে। আফ্রিকার প্রাণীকুলের

যে বিরাট মাইগ্রেশন একটা চক্রে ঘুরতে থাকে, সেটারও একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সাইবেরিয়ার পাখিগুলিও শীতে উড়ে একটা নির্দিষ্ট দেশে যায়। ম্যাগপাই নামক কাক প্রজাতির একটা পাখি আছে, ভীষণভাবে সীমানা রক্ষাকারী। গণ্ডার, হাতি—সবাই একটা সীমানার ভেতরে থাকে।

আমি কানাডার যে অঞ্চলে থাকি, সেখানে অনেক প্রজাতির হরিণ। ভাবতাম এই হরিণগুলি বুঝি দিকনির্দেশনাহীনভাবে চারণ করতে থাকে। হয়তো মাইলের পর মাইল কোন দিকে চলে যায় খাবার খেতে খেতে। কোনো আবাসস্থল নেই। কিন্তু না, এরাও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ভেতরে চলাফেরা করে। সাধারণত পাঁচ-সাত বা দশ বর্গমাইলের ভেতরে। আমার এক শিকারি বন্ধু একটা পুরুষ হরিণকে ছয় বছর চোখে চোখে রেখেছিল। যখন সেই হরিণের শিংগুলি পূর্ণ দৈর্ঘ্যে পরিণত হয়, তখন সেটাকে শিকার করে শিংগুলি আরোহণের জন্য। ভীষণ অবাক হই তথ্যটা জেনে। সে শীতে-গ্রীষ্মে সব সময় খবর রাখত কোথায় হরিণটা থাকছে। এই বন্যপ্রাণীগুলির জীবনচক্র খাওয়া আর বংশবিস্তারের ভেতর সীমাবদ্ধ, অন্য কোনো উদ্বৃত্ত তৈরি এদের জীবনপ্রক্রিয়ায় নেই। কিন্তু মানুষের—আকাশের অনেক অনেক ওপারেও যার স্বপ্ন বিচরণ করে, উদ্বৃত্ত তৈরি যার একমাত্র কাজ—তার সীমানা কোথায়!

যখন এই লেখাটা লিখছি, তখন আমি প্রশান্ত মহাসাগরে একটা প্রমোদতরীতে ভাসছি। এটা কি ভ্রমণ! আমরা যখন নদীপথে ভ্রমণ করি, গতির সাথে সাথে বদলাতে থাকে আশেপাশের দৃশ্যপট। বদলে যায় জনজীবন, এমনকি সভ্যতাও। নীলনদ নৌপথে ভ্রমণের বোধহয় সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে নীলনদে যদি দক্ষিণ দিকে আসা যায়, অবাক বিস্ময়ে বদলে যেতে থাকে গতিপথের দুই পাশের দৃশ্যাবলি, সভ্যতা। মানুষের ধরন, গায়ের রং, ভাষা, সংস্কৃতি—সব। প্রমোদতরীগুলিতে সেটার সুযোগ নেই। চারদিকে শুধু নীল সমুদ্র। সূর্যের আলোর উজ্জ্বলতার তারতম্য ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। একটা ভাসমান নগরীর মতো। কয়েক সহস্র বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের এক অপূর্ব সমাহার। নিশ্চয়ই এটা একটা ভ্রমণ। হয়তো প্রমোদ ভ্রমণ হতে পারে। ভ্রমণ আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। কেউ এক শহর থেকে আরেক শহরে যেতে থাকলে সেটাকে আমরা ভ্রমণ বলি না, সেটা হয়তো পথ চলা। প্রয়োজনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্য আরেক স্থানে যাওয়া। ভ্রমণের ভেতরে প্রকৃতিকে দেখবার একটা বাসনা থাকে, শুধুই দেখবার জন্য। তার সৌন্দর্য, রং, সুবাস ইত্যাদি অনেক কিছু উপলব্ধি করা ভ্রামণিকের কাজ। সৌন্দর্যকে শারীরিকভাবে ব্যবচ্ছেদ করে তার জন্মরহস্য উদ্ঘাটন ভ্রমণের বিষয় নয়।

ভ্রমণের বিষয় হলো প্রকৃতির সম্পূর্ণ সময়টাকে মনের ভেতরে নিয়ে তার স্পন্দন অনুভব করা।

শুধু সৌন্দর্য আবিষ্কার ছাড়াও ভ্রমণের ভেতরে অচেনা পথে চলে যাওয়ার একটা ঝোঁক থাকে, যেটা একটা রোমাঞ্চকর অবস্থার সৃষ্টি করে! অবিশ্বাস্য সেই অনুভূতি! সেটাও ভ্রমণের একটা অনেক বড় অঙ্গ।

আমার জীবনের প্রথম ভ্রমণ কোনটা, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব। এটা আমার সবচেয়ে শৈশবের একটা স্মৃতি। যেহেতু এটা খুবই রোমাঞ্চকর এবং তীব্র অনুভূতি, তাই আমার সজীব স্মৃতিতে আছে। তখন আমার ৪/৫ বছর বয়স। ৬-এর বেশি না, এটা নিশ্চিত করে বলতে পারি। আমার চাচা তিতু, যিনি আমার বাবার মামাতো ভাই, আমার চেয়ে এক বছরের কিছু বড়, বন্ধুর মতো। আমাকে সাথে নিয়ে হারিয়ে যাওয়ার সন্ধান দেন! "চলো ভাতিজা, বেড়ায়ে আসি।" শুরু করি ওনার সঙ্গে হাঁটা। আমার শিশু পা আর ওনার কৈশোরের শুরুর পদক্ষেপ। কিছুক্ষণ যাবার পরে অচেনা রাস্তা সব, কিছু চিনি না। পাবনা শহরের ঠিক মাঝখানে আমাদের বাড়ি। সেখান থেকে ওনার উদ্দেশ্য পাবনা স্টেডিয়ামের দিকে যাওয়া। আমি বলছি ১৯৬৪/৬৫ সালের দিকের কথা। তখন এই স্টেডিয়ামটাকে জিন্নাহ পার্ক বলা হতো। পাবনা বাণী সিনেমা হলের পাশ দিয়ে পশ্চিমে কিছুদূর গেলেই পাকা রাস্তা শেষ। তার কিছুদূর পরে ইছামতি নদী। একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হতে হবে। কী ভয়! আবার একটা উত্তেজনা! ভয়ানক রোমাঞ্চকর! ছোট ছোট পায়ে বাঁশের সাঁকো পার হওয়া। নদীর ওই পশ্চিম পাড়ে সেই প্রথম আমার পদচারণা। অসাধারণ একটা সময়, তীব্র ভয় মেশানো। ফিরতে পারব তো? শুরু হলো আমার জীবনে প্রথম সীমানা পেরোনোর অধ্যায়।

ভ্রমণের বিষয় হলো প্রকৃতির সম্পূর্ণ সময়টাকে মনের ভেতরে নিয়ে তার স্পন্দন অনুভব করা।

পরের প্রায় সম্পূর্ণ রাস্তাই কাঁচা। চাচা কোন দিক দিয়ে নিয়ে গেলেন বলতে পারব না। কিন্তু আমার মাথার ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তা আসতে থাকে। মনে পড়তে থাকে মা-খালাদের কোলে বসে শুনে আসা ছেলেধরা কিংবা হারিয়ে যাওয়া শিশুদের করুণ পরিণতির গল্পগুলি। ভয় আর রোমাঞ্চ পাশাপাশি নিয়ে পৌঁছাই সেই স্টেডিয়ামে। তিতু চাচা ফেরার সময় বলেন, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরবেন। আমার ভয় বাড়তে থাকে। আবার ইচ্ছাও আছে সেই অচেনা পথ দিয়ে ফেরার। বেশ খানিকটা ঘুরপথে আমরা ফিরতে থাকি। এবার পাবনার আরেকটা সিনেমা হল, রূপকথার পাশ দিয়ে ফেরা। এখানেও একটা বাঁশের সাঁকো। আবার সেই দুলে দুলে পার হওয়া। নদীর পূর্বপাড়ে এসে কিছুদূর এগোতেই আমার পরিচিত রাস্তাগুলি চোখের সামনে আসতে থাকে। চেনা জগতে ফিরে এসে ভয় কেটে যায়। বেশ কিছু রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিয়ে

একটা আনন্দ এসে পড়ে মনে। তিতু চাচা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে ওঠেন, "কই ছিলাম না, আমি সব চিনি।" ওনার সাথে সাথে আমারও আত্মবিশ্বাস জন্মাতে থাকে। বাড়তে থাকে আমার নিজস্ব জগতের সীমানা। পরিচিত গণ্ডির বাইরে যাবার একটা ঝোঁক, অচেনাকে দেখবার আগ্রহ। একটা ভ্রমণের জীবন। চিনতে থাকি শহরের আনাচে-কানাচে। ১৯৭১ সালে আমার বয়স ১১ থেকে ১২-এর মধ্যে। আমি আর আমার ছোট ভাই, দুজনে হেঁটে ২১ মাইল পথ অতিক্রম করে চাটমোহর যাই। ১৯৭১ সালেই আর একবার পাবনা থেকে ৫৩ কিলোমিটার দূরে আমাদের আদি বাড়িতে যাওয়া হয়। আমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে থাকি ভ্রমণের জন্য। নিজের অজান্তেই শরীর এবং মন গঠিত হতে থাকে ভ্রমণের পথে হাঁটতে।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, মানুষ নামক প্রাণীর সীমানা কতটুকু! এ প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর আছে আমার কাছে। আমি মনে করি একটা মানুষ যতটুকু স্থান ভ্রমণ করে, ততটুকু তার সীমানা। শুধু সীমানা নয়, যে যতটুকু জায়গা দেখে, সে ততটুকু এলাকার মালিক। যত বিস্তৃত জায়গা ভ্রমণ করা যায়, তত সীমানাহীন প্রকৃতিতে মিশে যাওয়া যায়। এটাই ভ্রমণের মূলমন্ত্র ও সীমানা অতিক্রম করার চালিকাশক্তি বলে আমার খুব দৃঢ় বিশ্বাস। মানুষ তার শেষ সীমানায় পৌঁছে প্রকৃতিতে মিশে যেতে চায়। মানুষ যতো দেখে, ততই প্রকৃতির কাছে যেতে থাকে। উপলব্ধি করতে থাকে কত কিছু দেখার বাকি! ইউটার আর্চেস পার্কে পাঁচ মাইল পাহাড়ি পথ পাড়ি দিয়ে দেখে আসতে হয় Delicate Arch-কে। কত অহংকারী সে, স্থির থাকে। আর দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাকে দেখতে আসে। মানুষের ভ্রমণের যতগুলি উপায় আছে, তার ভেতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হাঁটা। হেঁটে যেতে সময় লাগে। প্রকৃতির আলো-বাতাস, বুনো গাছগুলির গন্ধ, মানুষের কোলাহল স্পর্শ করতে করতে যাওয়া যায়। সে এক অফুরন্ত জীবনযাত্রা। আধুনিক সভ্যতার দাপটে সেটার সংখ্যা খুব কমে এসেছে। তাই এই সীমানা বাড়িয়ে নেয়াটাও কিছুটা সহজ হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জায়গার স্মৃতি মাথার ভেতরে জমতে থাকে, যে স্মৃতির মালিক আমি। এবং একটা সময়ে বেশ কিছু স্মৃতি একাকার হয়ে যায়। মনে হয় এই একই বিশ্বমাতার এত রূপ! কিংবা কখনও মনে হয়, সবগুলি রূপ মিলেমিশে একটা বিমূর্ত রূপ ধারণ করে এই পৃথিবী। মানুষের চোখে দেখার সীমানাও বাড়তে থাকে। লক্ষ্য থাকে অনেক দূরে বিন্দুর মতো দেখা যায়—এমন একটা সীমানা পেরিয়ে যাবার। কোনো এক সময় হয়তো সীমানা পেরিয়ে পৌঁছেও যায় আরেক প্রান্তে। শেষ হয় মানবজীবনের ভ্রমণ।

এখানে আমার যে সীমানা পেরোনোর কথা বলব, সেটা হলো নেপালের কিছু অংশ। ঘটনাটা ২০১৯-এর মে মাসের। আমি তিব্বত যাওয়ার উদ্দেশে কাঠমুণ্ডু যাই। তিব্বত পারমিটের জন্য আবেদন জমা দিই শুক্রবার সকালে। শনি-রবি বন্ধ, সোমবার যেয়ে মঙ্গলবার বিকালে তিব্বত পারমিট হাতে পাব। চার দিন

আমার কাছে। এই চার দিন ভালো সময় কাটাবার জন্য আমি নেপালের চিতওয়ান সাফারিতে যাব বলে মনস্থ করলাম। গাড়িতে করে যাওয়া। নেপালের পাহাড়ি পথের অনেক ঘুরপথে গাড়িতে করে গিয়েছি। সেটাতে আমি কিছুটা অভ্যস্ত। তাছাড়া পৃথিবীর বাণিজ্যিকভাবে সফল সাফারি যেগুলি—আফ্রিকার মাসাইমারা, তাঞ্জানিয়ার সেরেনগেতি-নগরংগোরো কিংবা নামিবিয়ার ডেজার্ট সাফারি আমার দেখা। সে তুলনায় চিতওয়ান সাফারি তেমন নামকরা নয়, তবুও আমি দেখতে চাই। আমি জানি প্রকৃতির কোনো তুলনা হয় না। আফ্রিকার গণ্ডার ও তার পরিবেশ আর চিতওয়ানের গণ্ডার ও তার পরিবেশ—দুই জগৎ। তুলনার কোনো উপায় নেই। আফ্রিকাতে সাভানা, আর এখানে বড় বড় গাছের জঙ্গল। অনেক সবুজময়, আবেগময়ও—অন্তত আমার কাছে। পাখির দিক থেকে অগণিত ধরনের পাখি এখানে। দুচোখ ভরে দেখলেও মনের খিদে মিটবে না, এতই সুন্দর এরা। তার ওপরে ময়ূর, অগণিত, এখানে-সেখানে। কয়েক ধরনের কুমির আছে ওখানে। আমার আকর্ষণ অন্যদিকে, বৃহৎ বন্যপ্রাণী দেখার—বুনো হাতি, ভালুক, বেঙ্গল টাইগার ইত্যাদি। আর সত্যি যদি ভাগ্যবান হই তো একটা লিওপার্ডের দেখা মেলে, আস্তে আস্তে বলি।

কাঠমুণ্ডু থেকে শুক্রবার সকালে রওনা দিয়ে বিকালের দিকে বেশ আলো থাকতেই আমরা পৌঁছে যাই চিতওয়ান সাফারির সবচেয়ে কাছের শহর সাওরাহাতে। খুবই ছোট্ট একটা শহর। হেঁটেই সব জায়গায় যাওয়া যায়। আমার ট্যুর অপারেটর যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে, সেটার নাম Hotel Hermitage। হারমিটেজ শব্দের অর্থ খুব নির্জন এলাকা, যেখানে বসে তপস্যা করা যায়। সত্যিই এই হোটেলটা তেমন একটা নির্জন জায়গায়। সম্পূর্ণ একটা গ্রাম্য পরিবেশ। সাথেই নদীর বাঁক, আর এই বাঁকটার ওপরে এই হোটেলের একটা আউটডোর লাউঞ্জ! যেটাতে বসলে দুই পাশের নদীর বাঁকটা আপনার দুই বাহুর মতো। আর বুকের ওপর দিয়ে কলকল করে প্রবাহিত নদীর জল। বেশ ছোট একটা নদী, ওপারেই শুরু হয়েছে চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক। থাকার ব্যবস্থাটাও পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও রুচিসম্মত। ছোট ছোট দোতলা বাংলো টাইপের স্থাপনা। বাড়তি কিছু নাই। কোনো তারকাসম্মতও নয়, কিন্তু শান্তির। আমি মুগ্ধ হই!

শহরের ভেতর দিয়ে পাঁচ-সাত মিনিট হাঁটলেই একটা খেয়াঘাট। এই খেয়াঘাটের ওপারে চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশপথ। বিকালেই চারপাশটা দেখতে বের হই। হাঁটতে যেয়ে প্রথমে যেটা অনুভব করি, সেটা হলো আর্দ্রতা! সাংঘাতিক, জলীয় বাষ্পে ভরা। আমার ধারণা ছিল নেপালের সবটুকু এলাকা পাহাড়গুলির ওপরে। সমুদ্র সমতল থেকে অনেক অনেক উঁচুতে। ধরেই নিয়েছিলাম নেপালের সর্বত্রই শুষ্ক আবহাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো, ঘেমে একসা হতে থাকি। চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক সমুদ্র সমতল থেকে চার-পাঁচশ ফিট ওপরে। অনেক জলাশয় আর

বিস্তীর্ণ বন থাকার কারণে বাতাসের আর্দ্রতা একদম একটা অসহনীয় পর্যায়ে থাকে। এই অল্প একটু হেঁটে খেয়াঘাটে এসে প্রথম যে অবাক হলাম, সেটা হলো—ওপারেই চিতওয়ান ন্যাশনাল পার্ক, যেখানে অনেক ভয়ানক প্রাণীর বসবাস! অবাক হলাম এই ভেবে যে, অনেক পার্ক দেখা মানুষ আমি। এত কাছাকাছি যে এত বৈচিত্র্যময় প্রাণী মানুষসহ বসবাস করতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। এই প্রথম অনুভব করি মানুষ আর হিংস্র প্রাণীর এত সহজ সহাবস্থান। সত্যিই অভিভূত হই। নদীর পাড়ে অল্প কিছু দূরে বেশ ভিড় দেখতে পাই। আমিও এগিয়ে যাই; তিনটা গণ্ডার নদীতে গা ভাসিয়ে আপন মনে কুলের ডুবে যাওয়া ঘাসগুলি খাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে যাই। মনে হয় গণ্ডারগুলিও এই এলাকার মানুষের সাথে একই সমাজে বাস করছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাণীকুলের সকল প্রাণীকে একদম পাশাপাশি এনে একে অপরকে বন্ধুর মতো সম্মান করে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছে। মন ভরে যায়। ভাবতে থাকি, ওই গণ্ডারটির মতো আমিও এই প্রকৃতির একটা প্রাণী যে চষে বেড়াচ্ছে। ওই প্রাণীটি হয়তো শুধু খাদ্যের জন্য, আর আমরা সীমানা বাড়ানোর জন্য।

পরেরদিন সকালে আমার চিতওয়ান জঙ্গল দেখা শুরু হয়। খেয়ার নৌকায় পার হয়ে এপারে এসে একটা উন্মুক্ত সাফারি গাড়িতে। আমার সাথে আমার গাইড বন্ধু, ওর নাম সান্তা। খুব অভিজ্ঞ সে। নদীর পাড় থেকেই ঘন বন। মুহূর্তেই বুঝতে পারি আফ্রিকার সাফারি থেকে চিতওয়ানের সাফারির তফাৎ! আফ্রিকাতে সাভানা—দিগন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি। মাঝে মাঝে কিছু বড় গাছ। হাতি, চিতা, গণ্ডার, সিংহ এমনকি লিওপার্ডও উন্মুক্ত আকাশের নিচে। অনেকটা খুঁজতে হয় না, অনেক দূর থেকেই দৃশ্যমান। কিন্তু এই ঘনবনে খুঁজে দেখতে হবে। অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এটা। অনেক অনেক ধৈর্য ধরতে হবে। কিংবা খুব সন্তর্পণে অপেক্ষা করতে হবে। সত্যি করে এই প্রাণীগুলি দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এদের গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে হবে। জানতে হবে এই এদের জীবনযাত্রা। এক কথায় ভালোবাসতে হবে এইসব প্রাণীগুলিকে, তবে যদি দেখা মেলে। আফ্রিকার সাফারিগুলির মতো সময় বেঁধে গাড়ি চালিয়ে চিতওয়ান সাফারির প্রাণীকুল দেখা সম্ভব না। এটা বুঝে আমার আগ্রহ শতগুণে বেড়ে যায়। মনে হয় এটাই যেন আমার জীবনের সেরা সাফারি। কিছুদূর যেতেই অসংখ্য রকমের পাখি দেখা শুরু হয়ে গেল! আফ্রিকার তুলনায় বেশ কয়েকগুণে বেশি হবে। আর ময়ূর অগণিত, যেখানে-সেখানে! কেউ পেখম মেলে নাচছে রমণীর মনোরঞ্জনের জন্য। কেউ বা উড়ে সন্ধান করছে খাদ্যের। একদম সিনেমার দৃশ্য সব। মনে হয় আমি কল্পনায় আছি। ঘনবনের আলোছায়ার ভেতরে দেখতে থাকি রঙিন দৃশ্যগুলি। মন্ত্রমুগ্ধ হতে থাকি। গণ্ডার মেলে বেশ কয়েকটা। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে গণ্ডারগুলি মোটামুটি মানুষের উপস্থিতি মেনে নিয়েছে। যেমন মেনে নিয়েছে আফ্রিকার চিতা কিংবা সিংহ। তাই এই গণ্ডারগুলি মানুষ থেকে দূরে যাবার চেষ্টা করে না। বুনো শুয়োর দেখেছি। বেশ কয়েক রকমের বানর। আর কয়েক প্রজাতির হরিণ। আমার মন ভরে যায়। অনুভব করি, আফ্রিকার সাভানার

ধূসর সাফারির চেয়ে এই সবুজ বনের আর্দ্রতা মাখানো সাফারি আমার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি।

সন্ধ্যায় ফিরে স্নানাহার সেরে আমি স্থানীয় আদিবাসী থারু সম্প্রদায়ের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে যাব। আমার গাইড সান্তাকে দেখলাম নদীর পাড়ের লাউঞ্জে, সাথে একজন অস্ট্রেলিয়ান ট্যুরিস্ট। এই এলাকাতে সব জায়গায়তেই ভাঙ নামক নেশাকর গুল্মের জন্ম হয়। অনেকটা গাঁজার মতো। সান্তা সেটার পাতা কেটে ছোট করা ইত্যাদি তামাক সাজানোর মতো কাজগুলিতে সাহায্য করছে। অস্ট্রেলিয়ান সাহেব 'বঙ' নামক একটা ডাব্বা এনেছে, দেখতে আমাদের সিসা টানার যন্ত্রের মতো, সেটা দিয়ে গাঁজা টানা হবে। ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ আগ্রহের লাগল। আমাদের তামাকের চেয়ে এটা উল্টো। আমাদের তামাকে মাঝখানে ওপরে থাকে তামাক, নিচে পানির ডিব্বা আর পাশ দিয়ে টান দিতে হয়। এক্ষেত্রে পাশে গাঁজা ধরে রেখে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা। নিচে পানি আর ওপরে—যেখানে আমাদের তামাক রাখার ব্যবস্থা—সেটা দিয়ে টান দিতে হয়। ভাবলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যাবার আগে একটু গাঁজায় টান দিয়ে নিই। অস্ট্রেলিয়ান ওস্তাদ ব্যাখ্যা করল—দুই ধাপে টান দিতে হবে। প্রথম ধাপে হালকা অর্ধেক টান দিয়ে গাঁজার ধোঁয়াটা পানির ভেতরে চুবিয়ে রাখতে হবে। ওরা বলে নৎবরিহম। অর্থাৎ ধোঁয়াটাকে পানির ভেতরে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তার পরে টান দিতে হবে। ভাব দেখালাম—সব বুঝে গেছি। কোনো ব্যাপার না! একটা টান দিয়েছি অনেক হাভাতের মতো, একদম সরাসরি আমার মগজে যেয়ে লেগেছে। সারাটা দুনিয়াই নড়েচড়ে কেঁপে উঠল! আমার কাছে মনে হলো এটা মাথা নিচু করে টান দিতে হয় বলে সরাসরি মগজে প্রতিক্রিয়া শুরু করে। আমি আর দ্বিতীয় টান দেওয়ার সাহস করি না। যথেষ্ট নেশা নিয়ে থারুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখি। একটা বিষয় খুব তীব্রভাবে অনুভব করি—এই পশ্চাৎপদ দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা কতটা সম্মান ও আন্তরিকতা দিয়ে তাদের সংস্কৃতিকে মানুষের সামনে তুলে ধরছে। অনুষ্ঠান শেষ করে একটা রেস্টুরেন্টে থারু খাবার খেয়ে ঘরে ফিরি।

পরদিন সকাল থেকে আমার একদম পরপর ব্যস্ততা। সকালে উঠে থারুদের গ্রাম দেখা। আমার গাইড সান্তা আমাকে সব বোঝাতে থাকে—মাটির বাড়ির দেয়ালের নকশাগুলি পর্যন্ত। অনেকটা বাংলাদেশের সাঁওতালদের গ্রামের মতো। এই দিন ছিল হাতির পিঠে করে ভ্রমণ আর নৌকা ভ্রমণ। আমার আগ্রহ বুনো হাতি, ভালুক, বাঘ, লিওপার্ড—এগুলি দেখা। এই সাফারিতে এইসব প্রাণী দেখেছে এমন মানুষ আমার বন্ধুদের ভেতরেই আছে। জানি লিওপার্ড গাছে থাকে। আফ্রিকার সাভানায় বড় গাছের সংখ্যা কম হওয়াতে কোন গাছে লিওপার্ড থাকে সেটা দূর থেকেই দেখা যায়। এবং ঘাস হওয়ার কারণে প্রায় সব গাছেরই কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু এই বনে কোথায় কোন গাছে লিওপার্ড বাস করছে, তা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই নিজে থেকেই

লিওপার্ড দেখার আশা ছেড়ে দিই। আমার গাইডকে বলি বুনো হাতি দেখানোর কথা। সে বলে সম্ভব, কিন্তু এই সাফারি প্ল্যানে সম্ভব না। যদি না অসম্ভব ভাগ্যবান হন। হাতির দল কোথায় আছে জেনে সেদিকে যেতে হবে আমাদের। জঙ্গলের ভেতরে সম্পূর্ণটাই হাঁটা পথ হবে। সব মিলিয়ে একটা রাত দুই দিনের পরিকল্পনা। বুনো হাতি দেখার পরিকল্পনাও বাদ দিলাম। শেষে মনে করলাম কানাডাতে আমরা যেমন বুনো ভালুক প্রায়ই দেখি, তেমন ভালুক নিশ্চয়ই পাব। সেখানেও হতাশ করল আমার ট্যুর গাইড সান্তা। তাঁর ব্যাখ্যা চিতার মতো—এই ভালুকগুলিও গাছে থাকে। সাধারণত মানুষ চলাচলের রাস্তা থেকে ভেতরে। অত সহজ হবে না দেখা। বাকি রইল বাঘ—রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বনে বাঘ দেখতে পারার মতো ভাগ্য কয়টা মানুষের আছে! সান্তা বলল জঙ্গলে যেয়ে "টাইগার টাওয়ার"-এ থাকতে হবে। হাতির পিঠে বনময় ঘুরে আবারও অনেক রকমের হরিণ, ময়ূর। নানা রকমের পাখি আর মাঝে মাঝে গণ্ডার দেখতে পাই। নৌকা ভ্রমণটাও খুব ভালো ছিল। কুমির পাই বেশ কিছু। তাছাড়া গাছের ডালে মাছরাঙা পাখিগুলি ডাঙা থেকে যেমন লাগে, নদী থেকে তেমন না। নদী থেকে পাখিগুলির একটা আক্রমণাত্মক চেহারা দেখতে পাওয়া যায়, যেটা খুব চঞ্চল! সারাদিন ঘুরে পরের দিন সকালে টাইগার টাওয়ারে থাকার পরিকল্পনা নিশ্চিত করে ঘরে ফিরি।

খুব ভোরে রওনা দিতে হবে টাইগার টাওয়ার যাওয়ার জন্য। যাওয়ার সময় নৌকায় আর ফেরার সময় বনপথে হেঁটে হেঁটে ফিরব। বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ি। এদের নৌকাগুলি খুব চাপা—বাংলাদেশের তালগাছের ডিঙিগুলির মতো। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই আমার মাথার টুপিটা বাতাসে উড়ে নদীতে হারিয়ে যায়। ভাবি তেমন সমস্যা হবে না। কিন্তু ওই ভ্যাপসা গরমে নদীর ওপরে প্রায় সারাদিন খালি মাথায় তীব্র রোদ আমাকে অসুস্থ করে ফেলে। যেটার খেসারত আমাকে তিব্বতে যেয়ে অনেক বেশি দামে দিতে হয়। এই জলপথটা খুব মিষ্টি। ডিঙি নৌকা হওয়াতে একদম জল ছুঁইছুঁই হয়ে যাওয়া। অজস্র পাখি, বিশেষ করে মাছ, শামুক কিংবা এই ধরনের প্রাণীখেকো পাখি। আমার শরীর খারাপের কাঁপুনি শুরু হলেও উপভোগ করতে থাকি প্রকৃতিটা। এখানেও বেশ ময়ূর দেখি আমরা, গণ্ডারও ছিল। বিকালের দিকে আমরা পৌঁছে যাই টাইগার টাওয়ারে। নদী থেকে একটু ভেতরে কাঠের তৈরি প্রায় পাঁচতলা সমান একটা টাওয়ার, সবার ওপরে থাকার ব্যবস্থা। খুব ভালো লাগে দেখে। আমরা নৌকা থেকে নামার কিছু পরেই হঠাৎ করে বনের ভেতর থেকে বিকট পশুর ডাকের শব্দ আসতে থাকে। খুব কাছে এবং খুব জোরে। সান্তা বলল দুই পুরুষ গণ্ডারের এলাকা নিয়ে যুদ্ধ। কিছু পরে আমরা কাছের বনের ভেতরের গাছ নড়তে দেখে বুঝতে পারি এখান দিয়েই চলছে সীমানা নিয়ে মারামারি। কিছুক্ষণ পরে দেখি বন থেকে বেরিয়ে একটা গণ্ডার ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর দিকে ছুটছে। অল্প কিছুক্ষণ পরে আরেকটা গণ্ডার এটাকে তাড়া করতে করতে আসছে। আমি সব ভিডিও করছি। প্রথম গণ্ডারটাকে দ্বিতীয় গণ্ডারটা একদম তাড়িয়ে নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিল। পাবনার ভাষায় বলে

'গাঙ পার করে দেওয়া'। দ্বিতীয় গণ্ডারটা কিছুক্ষণ নদীর ভেতর থেকে ফিরে গেল। এমন একটা দৃশ্য দেখতে পারার আনন্দে আমি আহ্লাদিত হলাম। ভীষণ একটা তৃপ্তি। ভিডিওটা আমার YouTube Channel-এর একটা সেরা ভিডিও। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা আসতে থাকে। সান্তা তার বাঘ দেখার অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকে। এই নদীতেই সন্ধ্যায় বাঘ সাঁতরে পার হতে দেখেছে!

সন্ধ্যার সাথে সাথে আমরা টাইগার টাওয়ারে উঠে যাই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠা। একদম ফ্লাশ ওয়েস্টার্ন টয়লেটসহ ট্যাপের জল, সৌরচালিত বিদ্যুৎবাতি। আধুনিক সব ব্যবস্থা। শোবার ঘরটা খুব সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। চারদিকে জানালা দিয়ে বনের গভীরে দেখা যায়। স্বপ্নের মতো একটা পরিবেশ। রাতের খাবার, সকালের প্রাতরাশ সব কিছুরই সর্বোচ্চ ব্যবস্থা। আমরা রাতের খাবারের পরে টাওয়ারে থেকেই অনেক রাত পর্যন্ত বন্য প্রাণীদের জ্বলজ্বলে চোখ খোঁজার চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে বাঘের গর্জন কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর গর্জনে ঘুম ভাঙবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই। সকালে প্রাতরাশ সেরে ফেরার প্রস্তুতি। আমার একটু জ্বর জ্বর করতে থাকে। হাতের কাছের কিছু ওষুধ খেয়ে হাঁটতে শুরু করি। ফেরার হাঁটা পথটা কত কিলোমিটার আমার মনে নাই। সান্তা চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাকে কাছাকাছি বাঘ আছে সেটা প্রমাণ করবার। কখনও দেখাচ্ছে বাঘের সদ্য পায়ের ছাপ। মাঝে মাঝে পায়ে চলা পথ ছেড়ে বনের গভীরে চলে যাচ্ছে বাঘের সন্ধানে। আর আমি শহরে ফিরে আসার ক্লান্তি মেখে বুনো গাছগুলিকে সরিয়ে দিয়ে আলো-অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। পথে অনেকগুলি পিঁপড়ের ঢিবি। সেখানে পিঁপড়াখেকো দুই-একটা ভালুক থাকাও উচিত ছিল। তবুও যতটুকু দেখলাম ততটুকুও অনেক। নিজের সীমানাটা যে পেরিয়ে যেতে পারলাম, সেটাই তো নিজের পাওয়া! যেটার মালিক আমি।

রঙের শহরে ধোঁয়ায় শান্তি

সেলিম সোলায়মান

উদরভর্তি যাত্রীসমেত মিনিট চল্লিশেক আগে নেমেছিল বলাকা সুবর্ণভূমিতে। যেকোনো ফ্লাইটেই দেখেছি, ল্যান্ডিং করার সাথে সাথেই যাত্রীরা নামার জন্য শুরু করে দেয় তুমুল হুড়াহুড়ি। আমি থাকি চুপচাপ বসে, সিটে, তোড়জোড় কমার অপেক্ষায়। হয়নি আজও ব্যতিক্রম। লাজু আর হেলেনের "আমরা কি নামব না?"—জাতের বেহুদা প্রশ্নেরও দিই না উত্তর।

হ্যাঁ, কেউ কেউ অযথা করলেও সবাই অকারণে হুড়াহুড়ি করে না নিশ্চয়ই। কানেক্টিং ফ্লাইটের তাড়া থাকতেই পারে অনেকের। আর ফ্লাইট অবতরণে বিলম্ব ঘটলে কানেক্টিং ফ্লাইট ধরার জন্য উদ্বাহু হয়ে বাংক থেকে বোঁচকা-বুঁচকি নামাতে নামাতে নিজেদেরও দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়াটা স্বাভাবিক ওই রকম যাত্রীদের। এদিকে আজ আমাদেরও আছে কানেক্টিংয়ে কানেক্ট করার হাঙ্গামা।

বিলম্বতাজনিত পূর্ব তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে বিমানের খুব যে ভালো ইমেজ আছে আমার কাছে, তা তো অবশ্যই নয়। মোবাইলের পর্দা বলছে সময়ের ব্যাপারে বলাকার হয়নি কোনো গড়বড় আজ। তবে টিকিট বুক করার সময় বলাকার 'লেইট লতিফ' সুনাম মগজে ঘাই মারায় ঝুঁকি নিতে সাহস হয়নি। শুরুতেই ঠিক করেছিলাম তাই, থাই এয়ারওয়েজের ব্যাংকক-চিয়াংমাই রুটের ফ্লাইট নেব

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার। তাতে বলাকা তার স্বভাব মেনে দু-এক ঘণ্টা বিলম্ব করলেও মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়াতে হবে না। দুই নারী ভ্রমণসঙ্গীর সম্মানেই নিয়েছিলাম ওই বাড়তি সতর্কতা। তদুপরি এবারকার ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য তো বউয়ের পায়ের চিকিৎসা।

অতএব ধীরে-সুস্থে মোটামুটি শেষের দিকেই বেরুলাম বলাকার উদর থেকে। এরপর গদাইলস্করি চালে বোর্ডিং ব্রিজ আর অ্যারাইভাল লাউঞ্জের লম্বা পথ পেরিয়ে ইমিগ্রেশনের দিকে এগোতেই এল কানে পেছনে হন্টনরত বউয়ের প্রশ্ন—

"আচ্ছা, এটা কি ব্যাংককের সেই এয়ারপোর্ট, আগে এসেছিলাম যেটাতে?"

—হ্যাঁ, সেই সুবর্ণভূমিই তো। খুব তো একটা পরিবর্তন দেখছি না। কেন?

"নাহ্, ওই যে একটা বিশাল সোনালি রঙের অজগর আর মূর্তি যে ছিল, ওইটা তো দেখলাম না।"

বুঝলাম লাজুর চোখ "সামুদ্রা মন্থন" নামের চমৎকার ওই বিখ্যাত ভাস্কর্যটি খুঁজছে। গেলাম পড়ে ধন্দে। আচ্ছা, পুরাণের দেবতা ও অসুর মিলে সমুদ্র ছেঁকে অমৃত বের করার কাহিনীটি মূর্ত হয়েছে দুর্দান্তভাবে যে ভাস্কর্যটিতে, সেটি কি আগমনী নাকি বহির্গমন লাউঞ্জে? নাহ্, নিশ্চিত নই। অনিশ্চিতভাবে বললাম, দেশে ফেরার সময় হয়তো দেখা হবে ওটার সাথে। মনে হচ্ছে, আছে ওটা ডিপার্চার লাউঞ্জে। আচ্ছা, চল চল আগে ইমিগ্রেশন শেষ করা যাক।

"ওরে বাবা! এতো লোক! কী বিশাল লাইন!"

সারি সারি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকের কিউ বিশাল অজগর হয়ে এঁকেবেঁকে দুটো না আড়াইটা 'ডব্লিউ' বানিয়ে এগিয়ে যাওয়া দুনিয়ার বারোজাতের মানুষের লম্বা লাইন দেখে হেলেন এ কথা বলে উঠতেই বললাম—

—চল চল দাঁড়িয়ে যাই আমরাও। যত দেরি করব, ততই তো পিছিয়ে যাব। দেখছিস না আসছে লোক অনবরত। প্রতি মুহূর্তে ফ্লাইট নামে তো। অবশ্য কাজ এরা করে ঝটপট।

যেই কথা সেই কাজ। গেলাম দাঁড়িয়ে লাইনে তিনজন। মনে পড়ল ব্যাংককের পুরোনো এয়ারপোর্ট, ডন মুয়েং ইন্টারন্যাশনালের কথা। যে যাবতকাল ধরে ব্যাংককে এসে নেমেছি সুবর্ণভূমিতে, প্রতিবারই ঘটেছে এটা। অর্থাৎ মনে পড়েছে ডন মুয়েংকে। হয়নি এবারেও ব্যতিক্রম। সাথে এ মুহূর্তে একই সাথে মগজের কোষে উঠল বেজে—

'দূরে বহুদূরে,

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে,

খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পাড়ে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।'

নাহ্, ডন মুয়েং-এ আমার প্রথমা তো নয়ই, কোনো ধরনেরই কোনো প্রিয়া বসবাস করেন না। নব্বই দশকে নিতান্তই সাধারণ মানের ছোট্ট ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে উড়ে এ জীবনে প্রথম যেই পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছিলাম, সেটি ছিল ডন মুয়েং। কুয়ার ব্যাঙ আমার, চোখে ধাঁধা লেগে গিয়েছিল তাতে।

যদিও ১৯১৪ সনে রয়্যাল থাই এয়ারফোর্সের বেস হিসেবে যাত্রা করা পৃথিবীর প্রাচীনতম বিমানবন্দরগুলোর অন্যতম ডন মুয়েং-এর বয়স তখন পেরিয়ে গেছে ৯০! ১২ জাতের হরেক রঙের মানুষে গমগম সরগরম ডন মুয়েং বেশ ঘাবড়েই দিয়েছিল তখন। ভাবছিলাম, কখন জানি পথ হারিয়ে যাই চলে কোনো বনে।

আর সেখানেই তো প্রথম দেখেছিলাম ঝলমল সাজের বিশ্বের নামকরা সব ফ্যাশন সামগ্রী, ওয়াইন আর পারফিউমের ডিউটি ফ্রি শপ। সেবারই ফেরার সময় মনের সাথে যুদ্ধ করে কষ্টে জমানো ডলারে কিনেছিলাম আক্রা দামে ছোট একটা আরমানি পারফিউম, ডিউটি ফ্রি থেকে প্রথম। মানে ওখানেই হয়েছিল আমার বেশ কটা প্রথমের প্রথম অভিজ্ঞতা!

প্রথম প্রিয়ার কথা যে মনে পড়ে জীবনের নানান বাঁকে, নানান ক্ষণে, সে কথা তো করেছেন কবুল মুক্তকণ্ঠে স্বয়ং কবিগুরু। যিনি আবার সর্বজনস্বীকৃত প্রেমের গুরু। কিন্তু আমি তো ওই ব্যাপারে এক্কেবারে এলেবেলে জাতের নবিশ। এ জাতের মানুষের তাই প্রথম ঘটা যেকোনো কিছুর কথাই কি মনে পড়ে নাকি নানান সময়ে? অন্য কারো মনের খবর তো জানি না। তবে আমার যে তা পড়ে, সেই প্রমাণ তো পেলামই এইমাত্র।

এদিকে তারই লেজ ধরে এবার সুবর্ণভূমিতে প্রথম আসার স্মৃতিও পড়ল মনে। সময়টা ২০০৬ সালের শেষদিকের কোনো একটা মাস হবে। হতে পারে অক্টোবর। কারণ মনে আছে সেই আসার কিছুদিন আগেই ঘটেছিল থাইল্যান্ডে এক মিলিটারি ক্যু। যার ফলে সে সময়ের থাইল্যান্ডের অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ক্ষমতা হারিয়েছিলেন! পড়ছিলাম সে খবর, রেশমি থাইয়ের পাখায় উড়তে উড়তে বিমানবালার দেয়া ব্যাংকক পোস্ট পত্রিকায়।

ছিল তাতে বড় হেডলাইনে থাকসিনের ভয়াবহ সব দুর্নীতি আর তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বয়ান। ইনিয়ে-বিনিয়ে তো না, এক্কেবারে সরাসরি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লেখা সিনাওয়াত্রার জঘন্য সব একনায়কসুলভ আচরণের বিবরণ পড়েছিলাম। সে সময় রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিয়েই থাই মিলিটারি জান্তা তড়িঘড়ি ও কিছুটা আধাখেঁচড়াভাবেই

চালু করেছিল সুবর্ণভূমি। এয়ারপোর্টের নানান জায়গাতেই চলছিল তখনও নানান কাজ।

সেবার আনকোরা সুবর্ণভূমিতে পা দিয়ে এর বিশালত্ব আর সাজসজ্জার চাকচিক্যে চমকে গিয়েছিলাম। তবে নতুন এই এয়ারপোর্টের কোথায় প্রাকৃতিক ডাকের ঘর? কোথায় ধূম্রসেবন ঘর? আর কোথায়ই বা ইমিগ্রেশন? এসব খুঁজে পেতে যন্ত্রণা হয়েছিল বেশ। মনে হয়েছিল তখন, নাহ্ ডন মুয়েং-ই ছিল ভালো। ওটা তো নিজের হাতের তালুর মতোই। তদুপরি ডন মুয়েংকে ঘিরে যে আছে আমার বেশ ক'টা প্রথম স্মৃতি, তাও তো বলেছিই।

মনে পড়ল এবার, প্লেনে ব্যাংকক পোস্টে থাকসিন-কিসসা পড়ায় নিবিষ্ট আমি বেশ খুঁজে পেতে আনকোরা এই বিমানবন্দরের টয়লেটের হদিস পাওয়ার পর সেটির দরজার হাতলটিকে নড়বড়ে অবস্থায় ঝুলতে দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম আরে পত্রিকা পড়ে তো ভেবেছিলাম এ হলো চোরের রাজা চোর! এখন তো দেখছি এ এমনই ছিঁচকে যে তার চুরি থেকে টয়লেটের দরজার হাতলও রক্ষা পায়নি!

নাহ্, শুধু যে সেদিনেরই ব্যাংকক পোস্টে ছাপা থাকসিন-কিসসা পড়েই আমার ওই ধারণা হয়েছিল তা কিন্তু নয়। এর আগেও নানান সময় পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছিলাম থাকসিনবিরোধী তুমুল প্রচারণা। কমপক্ষে দুবার তো ব্যাংককের রাস্তায় মুখোমুখি হয়েছিলাম থাকসিনবিরোধী চলমান হলুদ সরষের ক্ষেতেরও।

হ্যাঁ, থাকসিনের পক্ষে লাল জবার মিছিলও যে দেখেছি, সত্য তাও। জানি না এখনকার এ গ্রহের একক বিশ্বমোড়ল দেশে দেশে তথাকথিত রঙিন বিপ্লবের নামে যে গোলযোগ ছড়িয়ে দিচ্ছে, সে কারণেই কি থাইরা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তখন হলুদ আর লালে? ২০০৪ সালে সোশ্যাল মিডিয়ার বরাতে ইউক্রেনে যে কমলা গোলযোগ হয়েছিল, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই কি আক্ষরিক অর্থেই লাল শার্ট, হলুদ শার্ট পরে নেমেছিল রাস্তায় থাইরা? রাজা বনাম থাকসিন যুদ্ধে!

ঘটনা বা কারণ যাই হোক। থাইল্যান্ডের রাস্তার ওই হলুদ বনাম লাল থাইদের যুদ্ধংদেহী মহড়ার কারণ হোক আভ্যন্তরীণ নিখাদ সত্য কিংবা রটিত অনাচার, কিম্বা থাকুক বা না থাকুক তাতে বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিগত দুরভিসন্ধিমূলক উস্কানি—এই আদার ব্যাপারী আমি জাহাজের খবর নিতে গিয়ে পুরো খবর না জেনেই কেন জানি হয়ে গিয়েছিলাম তখন থাকসিনবিরোধী। দিয়েছিলাম যোগ রাজভক্ত হলুদদের দলে!

ফলে পরদিন সন্ধ্যায় মিটিং শেষে অফিসিয়াল ককটেলে নুচানার্ত পিনায়াপং-এর গ্লাসে গ্লাস ঠুকে বলেছিলাম, হোক জয় থাই রাজার। কী চমৎকারই না তোমাদের রাজা! প্রজাদের উনি বাকস্বাধীনতা, গণতন্ত্র দিতে চান। চান দুর্নীতির অবসান!

তাতে ককটেল সন্ধ্যার মোহন আলোয় নুচের ফর্সা হলদে চেহারায় হঠাৎ দেখা দেয়া কালচে মেঘের আভা পিটিয়ে দিয়েছিল ঢেরা! "ইল্লত যায় না মলে"। সুন্দরীর মন ভেজানো, ভজানো কথা বলার বদলে ওই ভরসন্ধ্যাতেই কি না দিয়েছিলাম তাকে রাগিয়ে! তবে বিচলিত হইনি তেমন তাতে। বরং হয়েছিলাম বিব্রত এই ভেবে যে, বহুদিনের পরিচয়ে সহকর্মী থেকে বন্ধু হয়ে ওঠা নুচ অধমের ওই মন্তব্যকে নিজেদের অন্দরমহলে এই বাঙ্গালের নোংরা নাকের অনুপ্রবেশ হিসেবে গণ্য করল না তো?

পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য দ্রুত বলেছিলাম সরি। তারপর অবলীলায় চাপিয়ে দিয়েছিলাম সব দোষ ব্যাংকক পোস্টের ঘাড়ে। অনেকটা জোর করে হেসে হাতে ধরা রেড ওয়াইনের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিতে দিতে গ্লাসের বুদবুদ ফেটে এসেছিল থাংরেজি জিজ্ঞাসা—

"আচ্ছা, মিডিয়াকে তুমি কী মনে করো?"

হুম! প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশনের মানে লাভ ও লোভ বাড়ানোর আধুনিক কল। চমস্কির ভাষায় বললে বলতে হয়, আধুনিক সময়ের শক্তিমানদের ভাষার আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার। বলেই ভেবেছিলাম নিজ মনে, আরে তাই তো! বিভ্রান্ত হয়েছিলাম কেন তবে ব্যাংকক পোস্টের রটনায়? নিজ দেশের মিডিয়াকে তো মোটেই বিশ্বাস করি না। একই তো অবস্থা বিবিসি, সিএনএন, ভোয়ারও। খুলেছে ততক্ষণে নুচের মুখ—

"তাহলে তুমি কেন ওইসব আধিপত্যবাদী রটনায় করলে বিশ্বাস? ১৯৯৭ সনের এশিয়ান ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে মুখ থুবড়ে পড়া থাইল্যান্ডের অর্থনীতি থাকসিন আমলেই গতি পেয়েছে। কমিয়েছে সে দারিদ্র্যের হার। হয়েছে সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্টের মতো মেগা প্রজেক্ট। বিস্তৃত হয়েছে ব্যাংককের মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক। স্টক মার্কেট হয়েছে শক্তিশালী। গ্যাস পাইপলাইন তৈরি করা সহ এনার্জি সেক্টরেও প্রচুর বিনিয়োগ করেছে সে, নিয়ে এসেছে বিদেশি বিনিয়োগ। গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্যও থাকসিন নিয়েছিল নানান প্রজেক্ট। আমাদের অর্থনীতির জন্য থাকসিনই ভালো। তার ব্যাপারে দমন-পীড়নের যে অভিযোগ আছে, সে সব তো করছে সে ড্রাগ ডিলারদের দমানোর জন্য। ড্রাগ ডিলারদের কি চুমু খেতে হবে নাকি? দুর্নীতি নাই কোন দেশে বলো তো? এখানে যা হয়েছে, তা হলো মিলিটারি ক্যু। করেছে ওরা ক্যু এমন সময়ে, ছিল যখন থাকসিন জাতিসংঘে।"

একটানা নুচের দীর্ঘ বিবরণ শুনে ফের দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলাম, ঠিক বলেছ একদম। আমাদের মতো অনুন্নত আর উন্নয়নশীল দেশে ঘুষ নামে যা ঘৃণ্য, উন্নত দেশে সেটাই পবিত্র লবিং মানি। তা তুমি যে ক্যু বলছ ওটার কারণ কী?

"এই তো এসেছো লাইনে, বন্ধু। এবারের ক্যু এর মূল কারণ হলো, থাই এলিটরা থাকসিনের জনপ্রিয়তাকে ভয় পায়।"

—কারা সেই এলিট?

"আর কে? রাজপরিবার ও তাদের এক সময়ের নিয়োজিত সামন্ত পরিবারগুলো। সাথে আছে মিলিটারি ও সিভিল ব্যুরোক্র্যাটরা। দরিদ্র ও গ্রামের মানুষদের মধ্যে থাকসিনের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা। সে জন্যই ভোটে পাশ করেছিল। অবশ্য সেই থেকেই তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল এলিটরা।"

—তাহলে টিকে ছিল সে কী করে এতোদিন?

"তাও ওই রাজপরিবারের জন্যই। থাকসিন রাজপুত্রের বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। প্রাসাদে রাজা বনাম রাজপুত্রের মধ্যে আছে বিরোধ। তবে ইদানিং ড্রাগ ডিলারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর থেকে রাজপুত্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল সিনাওয়াত্রার। তবে হ্যাঁ, বলছি না আমি যে থাকসিন একদম ধোয়া তুলসী পাতা।"

নুচের শেষ বাক্যে ভেবেছিলাম সে সন্ধ্যা—ওহ! ও তাহলে লাল থাই না। কী সে তবে? খয়েরি নাকি? ঠিক তখনই আমাদের দুজনেরই ইনডাইরেক্ট বস রিজিওনাল মার্কেটিং হেড বিজয় সিং স্বভাবসুলভ হৈ হৈ করতে করতে আমাদের সাথে যোগ দিলে থেমে গিয়েছিল আমাদের ওই বাংথাই বাৎচিত!

ইমিগ্রেশনের 'ডব্লিউ' লাইনের এক বাহুতে গুটি গুটি এগোতে এগোতে আজ সেই সব কথা মনে হতেই ভাবছি, কী মিলই না দেশে দেশে! ঘটনায় ঘটনায়! তবে সে যাত্রা থাইল্যান্ডে কোনো রকমের অরাজকতার রাজত্ব তৈরি হয়নি। কিন্তু হায়! হচ্ছে কী এখন আমার সোনার বাংলায়?

"কাম, কাম" উচ্চস্বরের মেয়েলি কণ্ঠে বেশ কিছু অচেনা থাই শব্দ ও ধ্বনির পর চেনা এই শব্দ কানে যেতে ফিরল সম্বিৎ। সামনের ঠিক কোনো উৎস থেকে উচ্চারিত হচ্ছে ওই শব্দরা দেখার জন্য বাঁয়ে হেলে সারসগলা হতেই পড়ল চোখে এয়ারপোর্ট গার্ডের ইউনিফর্মের গাট্টাগোট্টা খালার দিকে।

মাঝে ইংরেজিতে কাম কাম বলেই ফের খালা নিজ ভাষায় গজগজ করতে করতে লাইন ঠিক রাখার জন্য লাল প্লাস্টিকের স্ট্যান্ডের মাথায় কালো ফিতা দিয়ে যে ঘোরটোপ বানানো হয়েছে, তার একটির ফিতা খুললেন। এরপর সামনের বেশ কিছু লোককে বাঁ দিকের ইমিগ্রেশন কাউন্টারের দিকে নিয়ে গেলেন। এইমাত্রই দিয়েছে দেখা ওখানে নতুন ইমিগ্রেশন মুখ। তাতে হেলেন আর লাজু ওই খণ্ডিত লাইনে চলে গেলে পড়লাম আটকা নিজে মূল 'ডব্লিউ'র আরেক বাহুতে। প্রাণপণে যদিও খালাকে বলছিলাম, তিনজন আমরা এক পরিবারের; যেতে দিন আমাকেও ওদের সাথে। নাহ্, দিলেন না পাত্তা মোটেও খালা!

এদিকে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন লাইনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে কিছুটা ভয় পেয়েছে ওরা। কিম্বা বলা যায় বিভ্রান্তিতে পড়েছে ভ্রমণসঙ্গী শক্তিশালী নারী সদস্যদ্বয়। এই অভাজনের দিকে ওদের তাকানোর ভঙ্গি বলছে পরিষ্কার তা। হাত নাড়ার সাথে মূকাভিনয়ে বললাম তাই—নো চিন্তা। তোমাদের টার্ন আসবে যখন, যাবে এগিয়ে কাউন্টারে দৃপ্তপদে। ইমিগ্রেশন হয়ে গেলে ওই পাশে অপেক্ষা করবে। আর ঝামেলাই হয় যদি কিছু, কপালে যাই থাকুক এই লাইন থেকে বেরিয়ে যাব এগিয়ে। অবশ্যই মোটেও ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ না এ অধম। অতএব কোন ঝামেলায় কী করিলে হইবে কী, জানি না তাও। তারপরও সাহস দিলাম আর কী!

বিড়ালের কপাল জোরে মাঝে মধ্যে শিকে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে। কিন্তু ভাগ্যের জোরে অধমের কপালের আঙিনায় কখনো কিছু টুপ করে পড়েছিল কখনো—এমন তো মনে পড়ছে না। জানি না হালে কেশবিরল হওয়ার ফলে প্রশরুতর হয়ে ওঠা কপালের আঙিনারই জোর কি না এটা?

এইমাত্রই ডান দিক থেকে আরেক গার্ড আপা এসে ডান দিকের ফিতা খুলে নিয়ে গেলেন এ অধমসহ জনা বিশেক লোককে। ডান দিকের আরেকটা কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতে বললেন লাইনে। এইমাত্রই হয়েছেন নাজিল এখানেও আরেক ইমিগ্রেশন কন্যা।

হ্যাঁ, এবার তো আছি আমি লাইনের একদম প্রথমেই। অতএব দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এল ইশারা।

নাহ্, কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না কন্যা। একমনে পাসপোর্ট স্ক্যান করতে করতে নিজ চোখের কাছে হাত নিয়ে নাড়াতেই বুঝলাম চশমা খুলে তাকাতে হবে ক্যামেরার দিকে। কালবিলম্ব না করে 'তথাস্তু' বলে দাঁড়িয়ে যেতেই নিমিষেই হয়ে গেলাম এই বৈতরণী পার। মানে এ নিয়ে তিরিশ বছরে আটাশতম বারের মতো মিলল অনুমতি—শ্বেতহস্তীর ভূমিতে এই অধম বঙ্গসন্তানের পা রাখার।

হৃষ্টচিত্তে এগোলাম দ্রুত সামনের বাঁ দিকে। মানে যেদিকটার লাইনে আছে হেলেন ও লাজু। চোখ আন্দাজ, আছে ওরা এখনো প্রায় ১২/১৪ জনের পেছনে। যার মানে হচ্ছে কমপক্ষে মিনিট ২০/২৫ লাগবে ওদের পালা আসতে। জানি না খেয়াল করেছে কি না ওরা যে এরই মধ্যে অধমের প্রশস্ত হওয়া কপালের জোরে আচানক শিকে ছিঁড়ায় অনায়াসে পেরিয়েছি পুলসিরাত।

যা ভেবেছি হয়েছেও তাই! নাহ্, প্রত্যক্ষ করেনি ওরা অভাবিত এই ঘটনা। সে কারণেই মনে হচ্ছে শুরুর দিকের বিরাট 'ডব্লিউ' অজগর ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যাওয়া লাইনগুলোতে চোখজরিপ করে লাজু আমাকে দেখতে না পেয়ে বলেছে কিছু

হেলেনকে। হেলেনের ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে বেশ ঘাবড়েছে ও। লাইন থেকে একটু বেরিয়ে করছে খুঁটিয়ে চোখজরিপ ডানের লাইনগুলো।

যদিও সহজেই চোখে পড়ার মতো জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলাম। তাতেও দেখছি চোখে পড়েনি দুজনের কারোই অধমের নিকষ ভূতো চেহারা। সামনের দিকে তাকাচ্ছেই না ওরা। খেয়ালই করেনি ওরা যে পরের যে লাইনটি করা হয়েছিল তার প্রথমেই ছিলাম অধম।

দুই হাত তুলে তুমুল নাড়াচাড়ার সাথে বেশ কিছুক্ষণ নিজের অজান্তেই মূকাভিনয়ের পর অবশেষে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল হেলেনের। উত্তরে সাথে সাথেই স্বস্তির হাত নাড়ানোর সাথে দেহভঙ্গি ওর জানান দিল—বেঁচেছে হাঁফ ছেড়ে।

সে যাক, বাঁ দিকের ওই লাইনের শেষ দিকে স্বস্তি ফিরে আসতেই মনে হলো—আচ্ছা, এখানে ইমিগ্রেশন না করলেও তো পারতাম? গন্তব্য তো আমাদের চিয়াংমাই। ওখানেই ইমিগ্রেশন করলেই তো হতো। করলাম কেন বেহুদা এই বেকুবি? এর আগে ঢাকা থেকে ব্যাংককে নেমেই তো ধরেছিলাম ফুকেটগামী ফ্লাইট। সে সময় ফুকেটেই তো করেছিলাম ইমিগ্রেশন।

লাগেজ-ফাগেজও তো বুকিং করেছিলাম সরাসরি ফুকেট পর্যন্ত। ওটাই করলাম না কেন? এমন ভুলও কি করে নাকি মানুষ? বেহুদাই এখন ব্যাগ-সুটকেস সংগ্রহে দৌড়াতে হবে ডোমেস্টিক মানে আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরে। আচ্ছা ওটা জানি কোথায়?

কাছেই তো মনে পড়ছে। আচ্ছা ওই তিনবারের তিনবারই কি সুবর্ণভূমি থেকেই গিয়েছিলাম? নাকি ডন মুয়েং নেমে ধরেছিলাম ফুকেটগামী প্লেন? পরিষ্কার মনে করতে পারছি না। তবে এ নিশ্চিত যে যেখান থেকেই ধরে থাকি না কেন ফুকেটের প্লেন, অভ্যন্তরীণ সেই এয়ারপোর্ট ছিল হাঁটা দূরত্বেই। এখন যেমন একদম বেরিয়ে এলাম আন্তর্জাতিক অংশ থেকে, তখন তো এমন করতে হয়নি!

আন্তর্জাতিকের ভেতর দিয়েই হেঁটে পৌঁছেছিলাম অভ্যন্তরীণে। ছিল না ব্যাগ-সুটকেস টানারও ঝক্কি। থাই এয়ারলাইনসের দায়িত্বেই হয়েছিল সব। এমনকি ঢাকাতেই পেয়েছিলাম ফুকেট ফ্লাইটের বোর্ডিং কার্ডও। এবার বেহুদা নিলাম কেন তবে এই ঝক্কি? করলাম কেন এই ভুল? এ কি তবে বয়সের দোষ?

যতই তরুণ ভাবি না কেন নিজেকে এবং বয়সকে শুধুই একটা নম্বর বলে গলাবাজি করি না কেন, বয়সের ছোঁয়া তো স্পষ্টই দেখতেই পাই দাঁড়ালে আয়নার সামনে। আর সে ছোঁয়া যে লেগেছে মগজেও, পাচ্ছি টের তাও এখন!

ভাবতে ভাবতেই এ সময় খুলে গেল নিজ মনে নিজে নিজে বেহুদা তৈরি করা ধাঁধার জট। আরে সে তিনবারই তো করেছি ভ্রমণ গোটা পথ থাইয়ের রেশমি

পাখায়। সে জন্যই তো ওইসব ভ্রমণের সাথে এখনকারটাকে মেলানো চলবে না। এবারের ভ্রমণ তো হচ্ছে এয়ারলাইনসের ভাষায় যাকে বলে 'দুই পায়ের ভ্রমণ'। অর্থাৎ টু-লেগ ফ্লাইটের। যার প্রথম লেগ ছিল ঢাকা-ব্যাংকক। এসেছি যা বলাকার ডানায়। এরপরের পা বা লেগ মানে ব্যাংকক-চিয়াংমাইয়ে তো যাবো থাইয়ের রেশমি পাখায়। অতএব ঢাকা থেকে সরাসরি ব্যাগ-সুটকেস চিয়াংমাই পর্যন্ত বুকিং করার কোনো উপায়ই ছিল না যেমন, তেমনি ওই রুটের বোর্ডিং করানোরও উপায় ছিল না। নাহ্, ভুল তো হয়নি কিছুই।

"ওহ আল্লাহ বাঁচলাম! নাহ্, কিছুই জিজ্ঞেস করে নাই।"

বিদেশ ভ্রমণে বিদেশীদের সাথে ইংরেজিতে বাতচিত করা নিয়ে সর্বক্ষণ আশঙ্কায় থাকা হেলেন এইমাত্র ইমিগ্রেশন পার হয়ে ছাড়ল হাঁফ!

—আরে শোন, ওই কাউন্টারগুলোতে আছে যারা তাদের অবস্থাও একই। পারতপক্ষে তারাও তাই থাকে 'স্পিকটি নট'।

"এই শোন, এখন যাব কোথায়?"

হেলেনের পিছু পিছু ইমিগ্রেশন বৈতরণী পার হওয়া লাজুর এই প্রশ্নের উত্তরে বললাম—হবে যেতে এখন ব্যাগ-সুটকেস নিতে। তারপর যাবো ডোমেস্টিকে। চিয়াংমাই রুটের বোর্ডিং করার জন্য।

"ওহ। ওটা কত দূরে আবার?"

ব্যাগ-সুটকেস সংগ্রহের নিমিত্তে ব্যাগেজ কনকোর্স হলমুখী তীর চিহ্ন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম—বেশি দূরে না। কাছেই। ঢাকায় যেমন আন্তর্জাতিকের পাশেই ডোমেস্টিক, তার থেকেও কাছে এটা।

"অত দূর না হলেও কত দূর? যেতে হবে কীভাবে?"

"ব্যাগ-সুটকেস কি আসছে আমাদের এরই মধ্যে?"

পায়ের ব্যথা মাথায় রেখে লাজু খুব যৌক্তিক কারণেই জানতে চেয়েছে যেতে হবে কত দূর? আর কীভাবে? ওই দিকে ঢাকা এয়ারপোর্টের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হেলেনের জিজ্ঞাসা হলো—এখন গেলেই পাওয়া যাবে কি না ব্যাগ-সুটকেস?

উত্তরে হেলেনকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করতে পারলেও বউকে তো তা করতে পারার উপায় নেই। বললাম ফের তাই যে, খুব দূরে না। তাই কোনো ট্যাক্সি-ফ্যাক্সিও নেয়ার জো নেই। বলতে বলতে মনে হলো—আচ্ছা, এই আন্তর্জাতিক অংশে হাঁটতে সমস্যা আছে এমন যাত্রীদের বোর্ডিং গেট পর্যন্ত নেবার জন্য তো ব্যাটারি কার আছে। আন্তর্জাতিক থেকে ডোমেস্টিকে যাওয়ার জন্য ওই রকম সার্ভিস আছে কি? খুব ভালো হতো থাকলে ওটা। কোথায়, কাকে যে জিজ্ঞেস করি?

লাগেজ কনকোর্স হলে ঢুকতে ঢুকতে তাকালাম ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে। তাতে একই সাথে পড়ল চোখে যেমন আমাদের নির্দিষ্ট বেল্টটি, তেমনি পড়ল চোখে বেল্টের পাশে মেঝেতে খাড়া হয়ে থাকা আমার সুটকেসটি। প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময়ের ভ্রমণসঙ্গী, নানান সময়ে, নানান জায়গায়, নানান ওজনের ধাক্কা-ঘষা খাওয়ার সাক্ষী হিসেবে নিজদেহে নানান আকারের চিহ্ন ধারণ করে আছে দাঁড়িয়ে লাল কচ্ছপখোলের স্যামসোনাইট!

সাথে সাথেই হেলেনকে ওইটি দেখিয়ে বাকি সুটকেসগুলো খুঁজতে বলে এগোলাম হলের অন্য মাথার ট্রলি স্ট্যান্ডের দিকে। সামনের জনের কাঁধে পেছনের জন থুতনি লাগিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি ট্রলি থেকে গেলাম আনতে তাদেরই এক জোড়া।

ট্রলি নিয়ে ফিরতে ফিরতে ঘোরালাম ফের চোখ আট দিকে। খুঁজছি এমন কোনো কর্মীকে যার সাথে করা যাবে ইংরেজি বাতচিত। জানতে চাই ডোমেস্টিকে যাওয়ার জন্য কোনো ব্যাটারি গাড়ি পাওয়া যাবে কি না? না, ব্যাগ-সুটকেস সব নিয়ে আমরা সবাই যাবো না। শুধু লাজুকে নিয়ে গেলেই হবে।

কিন্তু হা হতোস্মি! দেখছি যাদেরই, তাদের সাথে বাংলা বলা আর ইংরেজি বলায় কোনো ফারাক হয় না। এদিকে এই দেশে এতোবার আসা-যাওয়া করেও নিজের থাই ভাষাজ্ঞান 'সোয়াদিকাপ' আর 'কাপ কুন কাপ'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাহ্, এই সিকিউরিটি গার্ডদের সাথে কথা বলে লাভের লাভ হবে না কিছুই!

ট্রলি নিয়ে ফিরে এসে দেখি এরই মধ্যে ব্যাগগুলো সব একাট্টা করে ফেলেছে ওরা। সবগুলোকেই পাওয়া গেছে মেঝেতেই। অবশ্য তখনই দেখেছিলাম নিশ্চল কনভেয়র বেল্ট চুপচাপ শুয়ে আছে লম্বমান। দ্রুত চার সুটকেস দুই ট্রলিতে তুলে একটাকে আমি আরেকটাকে হেলেন ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছি। নানান তথ্য আর যুক্তির প্যাঁচ কষে ধরে নিয়েছি উঠতে হবে প্রথমে আটতলা এই বিমানবন্দরের লেভেল ফোরে। ওখানেই যে আন্তর্জাতিক বহির্গমন, জানি নিশ্চিত। সূত্রের সাথে সূত্র মিলিয়ে মনে হচ্ছে ওই ফ্লোরের ডানে বা বাঁয়ে গেলেই ঢোকা যাবে অভ্যন্তরীণ লাউঞ্জে। একবার তাতে ঢুকতে পারলেই বাকিটা বের করা যাবে সাইন পোস্ট দেখে। নইলে ইনফরমেশন ডেস্ক তো আছেই।

"এই সেলিম! শোন, শোন, মনে আছে ওই যে দীপ্র আর অভ্রকে নিয়ে যে একা এসেছিলাম। আরে বুঝলে না ওই যে ওইবার তুমি একটা মিটিংয়ে এসে থেকে গিয়েছিলে। দীপ্র-অভ্রকে নিয়ে আসছিলাম আমি একা। মাগো মা! কী যে চিন্তায় ছিলাম! এক চিন্তা ছোট ছোট দুই বাচ্চা নিয়ে একা একা ব্যাগ-ট্যাগ সব নেব কীভাবে? তোমাকেই খুঁজে পাব কোথায়? বিশাল এই এয়ারপোর্টে মাথা ঘুরে গিয়েছিল।"

ট্রলি থাকার কারণে চলমান সিঁড়ি ধরার বদলে লেভেল টু থেকে চলমান সমতল প্ল্যাটফর্ম যেটি অনেকটা ৩০ নাকি ৪৫ ডিগ্রি হয়ে উঠে গেছে তৃতীয় তলায়, সেটিতে করে লেভেল থ্রি-তে উঠেই লাজুর এ কথাগুলো কানে যেতেই তাকালাম সেই দিকে—

আরেহ্ তাই তো! ওই তো আছে দাঁড়িয়ে ওখানে লাজু, সুটকেস-ব্যাগ বোঝাই ট্রলি নিয়ে! ট্রলির উপরে বসে আমার দিকে দু-হাত বাড়িয়ে কিছু একটা বলছে অভ্র! এর মধ্যে কানে যা আসছে তা হলো চারদিক সরগরম করে "বাবা, বাবা" ডাক! নিজের দেয়া ওই ডাককে দৌড়ে পরাজিত করার অটল প্রতিজ্ঞা দীপ্রর! দু-হাত বাড়িয়ে বসে মেঝেতে পড়েছি আমি! ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাড়ে পাঁচ বছরের দীপ্র ততক্ষণে আমার ওপর!

স্পষ্ট উঠল ভেসে পুরো গোটা দৃশ্যই চকিতে। শুনতে পেলাম পুত্রদের আনন্দিত হৈচৈও। কিন্তু হায়! গেল মিলিয়ে সবই হাওয়ায়, গমগম করা লোকজনের ভিড়ে; এসেছিল যেমন চকিতে তেমনি নিমিষে!

ছিল ওটা ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসের ঘটনা। যার মানে তারই মাস কয়েক আগে প্রথমবারের মতো সুবর্ণভূমিতে নেমেছিলাম আমি নিজে। ফলে বিশাল এই এয়ারপোর্টের কোথায় যে কী আছে জানতাম না। ঠিক করেছিলাম সেবার অফিশিয়াল মিটিং শেষে থেকে যাবো ব্যাংককে। ওই দিকে আসবে দেশ থেকে লাজু, বাচ্চাদের নিয়ে। একটা টিকিটের খরচা তো বেঁচে যাবে এতে!

লেভেল ফোরে ওঠার জন্য পরের চলমান প্ল্যাটফর্মটির দিকে এগোতে এগোতে বললাম—

—থাকবে না কেন মনে? কী যে টেনশনে ছিলাম আমিও! এই এয়ারপোর্ট তখন আমারও তো একদমই অচেনা। যার কারণে আগে থেকে বলতে পারিনি ঠিক কত নম্বর গেট দিয়ে বেরোবে। শুধু বলেছিলাম যেদিক দিয়েই বের হও না কেন, বেরিয়ে ওই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো। আমি ঘুরে ঘুরে খুঁজে নেব তোমাদের।

বিষম চিন্তায় ছিলাম দীপ্র-অভ্রকে সামলে ব্যাগ-ট্যাগ খুঁজে বেরুবে কীভাবে? যদিও বলেছিলাম দেশি কোনো ভাইয়ের সাহায্য নিতে। কিন্তু ওই রকম কাউকে পাবে কি না তা নিয়েও ছিলাম দুশ্চিন্তায়। প্লেন ল্যান্ড করার আধা ঘণ্টা পর থেকে ঘুরেছি আমি চর্কিবাজি গেট থেকে গেটে। ছন্নছাড়ার মতো কতক্ষণ যে ঘুরেছি, তাও খেয়াল করি নাই সেদিন। আজ আর তা বলি কীভাবে? এরপর যেই না দেখলাম তোমাদের ওই যে গেটটা দেখালে ওখানটায়, ধুপ করেই গিয়েছিল থেমে বুকের ধুকধুক!

"দীপ্রই তো দেখেছিল আগে তোমাকে, মনে নেই? দেখেই তো 'বাবা', 'বাবা' করে চিৎকার করছিল বলেই তো তুমি দাঁড়িয়ে গিয়েছিলে। না হয় চারদিকে তাকাতে

তাকাতে যেরকম হনহন করে হাঁটছিলে, তাতে আরও কতক্ষণ ওইভাবে ঘুরতে হতো তোমাকে!”

যাহ্, উঠে গেছি লেভেল ফোরে। অনেকবার এদিক দিয়েই যেহেতু বেরিয়ে গেছি ব্যাংকক ছেড়ে, বড়ই চেনা জায়গাটা। এখন মনে হচ্ছে সামনের বিশাল টার্মিনালটায় ঢুকি তো আগে। ভেতরে ইলেকট্রনিক বোর্ড তো আছেই। ওটাতে থাই এয়ারের ফ্লাইট নম্বর ধরে খুঁজলেই পাওয়া যাবে চিয়াংমাই ফ্লাইটের খবর।

ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছি টার্মিনালে ঢোকার সবচেয়ে নিকটবর্তী গেটের দিকে। চলছে মনে হাহাকার! এরই মধ্যে কত বড় হয়ে গেছে ছেলেরা। মেলেছে ডানা ঘর ছেড়ে বাইরে। আক্ষরিক অর্থেই আছে ওরা অনেক দূরে, পড়াশোনার কারণে। আছি পড়ে আমরা শূন্য ঘরে। ইংরেজিতে নাম যার এম্পটি-নেস্ট (Empty-nest)। অনেক দিন পর হয় যখন দেখা, ডাকে না তো সেই আগের মতো প্রাণ খুলে, উচ্চস্বরে। পড়ে না ঝাঁপিয়ে বুকে। কেন যে বাচ্চারা এমন হঠাৎ করেই বড় হয়ে যায়! হায়!

যাক, পাওয়া গেছে কানেক্টিং ফ্লাইটের হদিস। যেতে হবে টার্মিনালের ওই মাথায়। ফোনের পর্দা বলছে বাজছে এখন থাইল্যান্ডের সাড়ে চারটা। চিয়াংমাই ফ্লাইট ছাড়বে সাড়ে সাতটায়। কে জানে এখন ওই কাউন্টারে গেলে বোর্ডিং করতে পারব কি না? করতে পারলে ভালো হতো। ব্যাগ-সুটকেস সব থাইয়ের হাওলায় দিয়ে হয়ে যেতে পারতাম ঝাড়া হাত-পা। আন্তর্জাতিক রুটের ফ্লাইট তো তিন ঘণ্টা আগেই বোর্ডিং শুরু করে। এ তো হলো ডোমেস্টিক।

বোর্ডিং শুরু করবে কি এতো আগে এরা? না করলে তো আরও এক ঘণ্টা ট্রলি ঠেলে ঘুরতে হবে। না হয় বসতে হবে কোথাও। আচ্ছা আপাতত ব্যাগগুলো স্ক্যান করিয়ে নিই তো। ট্রলি ঠেলে ঠেলে পেছন পেছন আসা হেলেনকে ইশারা করে এগোলাম স্ক্যানিং কাউন্টারের দিকে।

স্ক্যানিং শেষে এয়ারলাইনসের খবরাখবর সমৃদ্ধ মাথার ওপরে ঝুলতে থাকা দৈত্যাকার ডিজিটাল বোর্ডগুলোতে চোখ রেখে হাঁটতে গিয়ে কখন যে বাড়িয়েছিলাম গতি, জানি না। বেশ পেছনে আছে লাজু ও হেলেন। নাকের সামনে এখন থাই এয়ারের নির্ধারিত কাউন্টারের নড়াচড়া দেখে মনে হচ্ছে বোর্ডিং শুরু হবে অচিরেই চিয়াংমাইয়ের। পেছন ফিরে ট্রলিসমৃদ্ধ হেলেনকে দিলাম তাড়া তাই হাত ইশারায়!

এতে হেলেন গতি বাড়িয়ে দিতেই লাজুও তার পায়ের ব্যথা ভুলে গতি বাড়াতে গেলে হাত ইশারায় নিবৃত করি। দরকার কী এতো তাড়াহুড়ার? ছোটবেলার মতো কেন যে এ মুহূর্তে ফার্স্ট হওয়ার ভূত চেপেছিল মনে, জানি না। আরে চিয়াংমাই ফ্লাইটে প্রথম

বোর্ডিং করলে কী সবার আগে পৌঁছাব নাকি? স্কুলে, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট হলেই কী জীবনের দৌড়ে ফার্স্ট হওয়া যায় নাকি?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দার্শনিক ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতেই এল চলে ওরা কাছে। এবার গদাইলস্করি চালে বোর্ডিং শেষে ব্যাগ-সুটকেস থাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হতেই চাপল সিগারেটের তৃষ্ণা ভীষণ!

সময় তো আছে হাতে প্রচুর। অতএব এখন বাইরে বেরিয়ে এই টার্মিনালের ডান দিকে যে স্মোকিং কর্ণার আছে, সেখানে গিয়ে একটু টেনে আসা যাক।

মনে মনে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে বললাম দুজনকে—যাচ্ছি আমি টয়লেটে।

সাথে সাথে সমস্বরে জানাল ওরাও—যেতে হবে ওদেরও। ধুর! পড়ল ছাই বাড়া ভাতে! লাগল বিরক্ত। কিন্তু সাথে সাথেই মনে হলো—সমস্যা কী?

ঢুকবে তারা তাদের ঘরে। তারপর ওইমুখো হয়েছি কি হলাম না তা আর ওরা দেখবে কীভাবে? ওদেরকে ওই শান্তিঘরে ঢুকিয়ে দিয়েই যেতে পারি নিজে সোজা চলে এখনকার আমার মঞ্জিলে মকসুদে।

বললাম—চল এগুই। সাইন তো বলছে ওই দিকেই যেতে হবে, পেতে হলে শান্তির ঘর।

বাহ্, কপাল খুবই ভালো! পাওয়া গেল হাতের কাছেই নারী শান্তিঘর। আমারটা সামনে। ওরা ওই দিকে এগোতেই মনে হলো—আরে শান্তিমতো সিগারেট খেতে হলেও সব ধরনের চাপমুক্ত হওয়াই ভালো।

অতঃপর সে মোতাবেক চাপমুক্ত হয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে ডান দিকের সেই চেনা কোনাটায় এলাম চলে।

বাহ্! নানান রঙের আর জাতের মানুষে পুরোপুরি কসমোপলিটান স্মোকিং কর্ণারটা। মজার ঘটনা হচ্ছে নারীদেরই প্রাচুর্য দেখছি। আগেকার তুলনায় এও এক পরিবর্তন।

যাই হোক, গোটা স্মোকিং কর্ণারটায় চোখ বুলিয়ে যুৎমতো একটা কোণের দখল নিয়ে ধীর-সুস্থে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম জোর এক টান। এরপর ছাড়লাম যখন ধোঁয়া ধীরে ধীরে নাকে-মুখে, উড়ে যেতে থাকল তার সাথে মনের উদ্বেগ ও চাপের কিছুটা!

স্বস্তির নিঃশ্বাসের সাথে আওড়ালাম তাই মনে মনে—ওম শান্তি। ওম শান্তি।

প্রাপোকলাও রোড, সি ফুম, চিয়াং মাই

ওয়াত চেদি লুয়াং: চিয়াংমাই

পূর্ণাঙ্গ বই
মোহময়ী মরক্কো
জিকরুর রেজা খানম

পূর্বপ্রকাশিতের পর

৭

পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো আমাদের 'ফেজ হন্টন' অভিযান। মনে মনে কিছুটা শংকিত ছিলাম বটে, কিন্তু সকাল থেকে রাত অবধি দলের সাথে দিব্যি হেঁটে হেঁটে ফেজের রাজবাড়ি থেকে দুর্গ, দুর্গ থেকে মদিনা বা পুরাতন শহরের অলিগলি—সবই ঘুরে দেখলাম। মদিনার অলিগলিতে পদে পদে মরোক্কান কারিগরদের (আর্টিজান) দেখা মিলছিল আর সেখানে ছিল অবাক হওয়ার মতো বিস্তর জিনিসপত্র। আমার অপারেশন করা পা দুটো এবার একটুও বেগড়বাই করেনি; বলেনি, 'থামো, আর পারছি না।' বরং সবার আগে আগে ছুটে গেছে। পায়ের মালিকের মতো তাদেরও কৌতূহল অপরিসীম। সেই কৌতূহলের চোটে ওরা মনে হয় ভুলেই গিয়েছিল যে ওরা নকল, আল্লাহ প্রদত্ত হাড়গোড় নয়। আলহামদুলিল্লাহ!

তবে ফেজ সম্পর্কে বলার আগে মরক্কো নিয়ে অল্প কিছু কথা বলা দরকার, না হলে সব কিছু কেমন জানি অসম্পূর্ণ লাগে। আফ্রিকার সবচেয়ে পশ্চিমের দেশ মরক্কো—এই কথা আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জানে। উত্তরে ভূমধ্যসাগর

আর উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক; তাই একে 'দুই সাগরের দেশ'ও বলা হয়। এখানে ইসলাম প্রবেশ করেছিল মহানবী (সা.)-এর জন্মের ঠিক একশো বছর পরে, ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের হাত ধরে। মরক্কো ইউরোপের খুব কাছে—মাত্র ১৪ কিমি জিব্রাল্টার প্রণালি পেরোলেই স্পেন—অথচ এটি ইউরোপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মরক্কোতে ঐতিহ্যের পাশাপাশি প্রগতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে; আধুনিকতার সঙ্গে ঘটেছে আধ্যাত্মিকতার মিশেল।

মরক্কো একমাত্র দেশ যেখানে কখনো অটোমান শাসকদের রাজত্ব ছিল না। অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের আগ পর্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত অটোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব, স্প্যানিশদের আমেরিকা আবিষ্কার এবং রিকনকুইস্টার জেরে ইউরোপীয়রা পুরো পৃথিবীকে উপনিবেশ বানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তার জেরে ১৯১২ সালে ফরাসি ও স্প্যানিশ ঔপনিবেশিক শক্তি মরক্কোকে ভাগ করে নেয়। দেশটি স্বাধীন হয় ১৯৫৬ সালে। তবে পশ্চিমা শক্তিগুলো সবসময় চেয়েছে মরক্কো যেন তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। ছলে-বলে-কৌশলে এই নিয়ন্ত্রণ আজও অব্যাহত আছে।

এ নিয়ে বলতে গেলে এত কথা বলা লাগবে যে এটি আর ট্র্যাভেল লগ থাকবে না, হয়ে যাবে রাজনৈতিক আর্টিকেল; সেই সাথে পাঠকরাও হয়তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবেন। অত রিস্ক নেওয়ার দরকার কী! তবে এইটুকু বলি, আমরা যখন মরক্কোতে ছিলাম, সেই সময়েই বিখ্যাত পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান 'স্টারবাকস' তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। মরক্কোর জনগণ ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং তারা ইহুদিদের প্রতিষ্ঠান বয়কট করেছে। একই দশা হতে চলেছে কোকাকোলারও। বুদ্ধিমানরা ইশারাতেই বুঝে নিন।

যেসব দেশ আমেরিকার প্রভাববলয় থেকে বের হতে চায় বা চীন-রাশিয়া ঘেঁষে চলে, তাদের মুদ্রার মান ক্রমশ কমতে থাকে। অর্থনীতির কলকাঠি যে আমেরিকার হাতে! তবে মরক্কো ন্যাটোর মিত্র এবং এদের মুদ্রা বেশ শক্তিশালী; এক ডলারে মাত্র নয় মরোক্কান দিরহাম পাওয়া যায়। উইকিপিডিয়াতে দেখবেন লেখা আছে—অর্থনৈতিক প্রগতি ও আধুনিকতার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে মরক্কো একটি 'মডেল'। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় তারা সত্যিই যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু প্রচুর গরিব মানুষও চোখে পড়েছে মরক্কো জুড়ে। ধনী-দরিদ্রের এই চিত্রটা দেশেই হোক বা বিদেশে, মন খারাপ করে দেয় বৈকি! অথচ ৭১১,০০০ বর্গ কিমি আয়তনের মরক্কোর জনসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি ৫৫ লাখের মতো। এখানে বৈষম্যটা কম হলে ভালো লাগত।

মরক্কোয় ইসলামের প্রভাব এত বেশি যে প্রধান ভাষা আরবি। পাশাপাশি সেখানে বারবার (Berber), ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষাও প্রচলিত। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ফ্রেঞ্চ আর আরবি ছাড়া আর কিছুই জানত না। তার সাথে কথা বলতে হলে হুসেনকে দোভাষী হতে হতো। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, খ্রিস্টপূর্ব আট হাজার বছর আগে এখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। বারবার, ফোনেশীয়, ইহুদি ও সাব-সাহারান লোকজন পর্যায়ক্রমে এখানে বসতি গড়ে তোলে। শুরু থেকেই বারবারদের প্রাধান্য ছিল এবং একপর্যায়ে এটি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চম শতকে রোমানরা সরে গেলে জার্মান বংশোদ্ভূত ভেন্ডাল আর গ্রিক বাইজেন্টাইনরা পর্যায়ক্রমে দেশটি শাসন করে।

দামেস্কের উমাইয়া খলিফার আদেশে উকবা ইবনে নাফি (in.)-এর নেতৃত্বে মরক্কোতে অভিযান চালানো হয়। ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে তারা দেশটিতে প্রবেশ করে। দীর্ঘ ১০০ বছরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে একত্র করে তারা একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। ইসলাম এখানে নিয়ে আসে উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনাচরণ। ১৬৬৬ সালে বর্তমান রাজবংশের পূর্বপুরুষরা আসার আগে কয়েকশ বছরে দেশটিতে নানা উত্থান-পতন হয়। অ্যাটলাস মাউন্টেনের কোলে ৭৮৯ সালে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন মহানবী (সা.)-এর প্রপৌত্রের বংশধর মুলে ইদ্রিস। প্রতি বছর আগস্ট মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলিম তীর্থযাত্রীরা সেখানে ভিড় করেন। এ দেশে রাজার প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অন্য লেভেলের—একদম নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। হয়তো একারণেই আরব দেশগুলোর মধ্যে শুধু মরক্কোর রাজার উপাধি হলো ‘আমিরুল মুমিনিন’।

আগেই বলেছি, আরব বসন্তের ঢেউ লেগেছিল মরক্কোতেও। পশ্চিমারা যখন গণতন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে তাবেদার সরকার বসাতে চায়, তখন সেই গণতন্ত্র মেনে নেওয়া কঠিন। পাকিস্তানের ইমরান খান কিংবা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমাদের দ্বিচারিতা আজ স্পষ্ট। সুখের কথা হলো, দেশটিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য ২০০৬ সালে মরক্কো ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছে। দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ইসলামিক নিদর্শনে ভরা এই দেশ পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। আর যা না বললেই নয় তা হলো মরক্কোর চামড়া শিল্প। প্রাচীনকাল থেকেই মরক্কোর চামড়া তার নমনীয়তা ও স্থায়িত্বের জন্য বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত।

এবার ফেজ (Fez) সম্পর্কে কিছু বলি। এটি একসময় এতই বিখ্যাত ছিল যে একে ‘পশ্চিমের মক্কা’ ও ‘আফ্রিকার এথেন্স’ বলা হতো। ফেজ ক্যাসাব্লাঙ্কার

পরে মরক্কোর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে এটি ইদ্রিসি শাসনের অধীনে ছিল। ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব ফেজ এল-জদিদে রাজকীয় প্রশাসনিক জেলা নির্মাণ করেন। আজকের ফেজ দুটি নতুন পুরাতন মদিনা সদর (ফেজ এল-বালি ও ফেজ এল-জদিদ) নিয়ে গঠিত। ফেজের মদিনা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রামীণ পথচারী অঞ্চল। আমরা পায়ে হেঁটে এই চিত্তাকর্ষক শহরটি পরিদর্শন করেছি।

ফেজ সারা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত হয়েছিল তার 'ফেজ টুপি'র জন্য। ইউরোপসহ সর্বত্রই লাল রঙের এই টুপির জয়জয়কার ছিল। উজ্জ্বল লাল রঙের গোলাকৃতি এই টুপি স্থানীয় এক ধরনের বেরি ফল দ্বারা রঞ্জিত করা হতো। একে 'রুমি টুপি'ও বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক ছিল। পরবর্তীকালে কামাল আতাতুর্ক এটি নিষিদ্ধ করলেও সারা বিশ্বে এর কদর ছিল অন্যরকম। গ্রিসের রাষ্ট্রপতির রক্ষীবাহিনীর পোশাকে আজও এটি ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের হায়দ্রাবাদের নিজাম ওসামা আলী খানও বিশেষ উপলক্ষে এই টুপি ব্যবহার করতেন। দক্ষিণ এশিয়ায় এটি একসময় খিলাফত আন্দোলন ও মুসলিম লীগের সাথেও সম্পর্কিত হয়ে পড়েছিল। হয়তো একারণেই বাংলাদেশে আর ফেজ টুপির ব্যবহার দেখা যায় না। টুপির এই সাতকাহন শুনে পাঠকরা হয়তো বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, তাই টুপি পর্ব এখানেই শেষ করছি।

৮

সকালবেলা হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে আমাদের যাত্রা শুরু হলো গাড়িতে। কিন্তু জানতাম এই বিলাসিতা অল্পক্ষণের, তাই কেডস পরে নিয়েছিলাম। মোজা-জুতো পরলেই আমার পা গরম, হাত গরম এবং তারপর মাথা গরম হয়ে যায়। তবে হাড়ের সমস্যার জন্য এক সাইজ বড় জুতো পরতে হয়, তাই কর্তার সাদামাটা নাইকি কেডসটাই নিয়ে এসেছিলাম। আজ আমাদের সাথে হুসেন ছাড়াও নীল মরোক্কান জুব্বা গায়ে এক যুবককে দেখলাম। হুসেন পরিচয় করিয়ে দিল—সে আমাদের স্থানীয় গাইড। মদিনার অলিগলি এতটাই গোলমেলে যে একলা হারিয়ে গেলে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল; তাই এই বাড়তি সতর্কতা।

প্রথমে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে, যার নাম 'দার আল মাখজেন'। বর্তমান রাজা এখানে বসবাস করেন বলে ভেতরে যাওয়া নিষেধ। বিশাল তোরণে সোনার কারুকাজ করা সাতটি দরজা রয়েছে। মোজাইকের আলপনা, ক্যালিগ্রাফি আর হাতের সূক্ষ্ম কাজ এককথায় অসাধারণ। তবে

স্থাপত্যশৈলীর দিক দিয়ে তাজমহল বা ইউরোপের প্রাসাদের সাথে তুলনা করলে একে বেশ সাদামাটাই বলা যায়। রাজবাড়ির সামনের চত্বরটি অনেকটা শালিমার গার্ডেনের মতো। সেখানে বেশ কটি কমলা গাছে টসটসে কমলা ঝুলছিল। আমি আর ঝর্ণা মিলে গাছ থেকে কয়েকটি কমলা পেড়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললাম। রাজবাড়িতে এই চৌর্যবৃত্তি করে আমরা দুজনেই হাসছিলাম; আসলে চুরি উদ্দেশ্য ছিল না, গাছ থেকে কমলা পাড়ার অভিজ্ঞতাটুকুই আমরা নিতে চেয়েছিলাম। হুসেন এসে যখন আমাদের নিষেধ করল, তখন আমরা নিচে পড়ে থাকা কমলাগুলো দেখিয়ে দিয়ে বললাম—গাছ নিজেই তো এগুলো ফেলে দিচ্ছে!

এরপর গাড়ি থামল পাহাড়ের উপরের এক দুর্গে। একে দুর্গ না বলে পাহাড়ের ওপর সাদামাটা বাড়ি বলাই ভালো। তবে এখান থেকে পুরো ফেজ শহরটি চমৎকারভাবে দেখা যায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে আমরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। এরপর আমরা এলাম ফেজের পুরাতন শহর মদিনায়। এখান থেকেই আমাদের হাঁটা শুরু। গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। হুসেন মদিনা সম্পর্কে আগেভাগেই ভয়ংকর এক ধারণা দিয়ে রাখল। সে বারবার সতর্ক করল—'নো শপিং'। কারণ এই সরু গলিতে হারিয়ে গেলে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না।

মদিনার সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় দুপাশের শৌখিন জিনিসপত্রের কারুকাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মরক্কোর আর্টিজানরা যে কতটা উঁচুমানে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষ করে লেদার শিল্প, মোজাইক এবং সিরামিকের থালাবাটি বা তাজিনগুলো (Tagine) চোখ ধাঁধানো। হুসেন আমাদের এক সিরামিক কারখানায় নিয়ে গেল। সেখানে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে হাতের জাদুতে অপূর্ব সব জিনিস তৈরি করা হয়। পাথরের ওপর নকশা এঁকে প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কেটে তারপর জোড়া দিয়ে মোজাইক তৈরি করা হয়। এই শ্রমসাধ্য কাজ দেখে সত্যিই অভিভূত হতে হয়।

মদিনায় ঘোরার সময় আমরা বিখ্যাত আল কারাউইন ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছালাম। এটি ৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বের প্রাচীনতম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর গেলাম মওলা ইদ্রিসের সমাধিতে। ভেতরে যেতে হলে জুতো খুলে এবং মাথায় কাপড় দিয়ে যেতে হয়। ভেতরে মেয়েদের জন্য আলাদা ছোট একটি কক্ষ ও বারান্দা নির্দিষ্ট করা ছিল। পুরো মরক্কোকে তাদের আচার-আচরণে বেশ রক্ষণশীল মনে হয়েছে। তবে ফরাসি উপনিবেশের কারণে আধুনিক শহরগুলোতে ইউরোপীয় কালচারের প্রভাবও স্পষ্ট।

৯

এতগুলো অল্পবয়সী মেয়ে দলে, আর হাস্যকর কোনো ঘটনা ঘটবে না—এ তো হতেই পারে না! বিস্তর হাস্যকর ঘটনা ঘটেছিল বৈকি! তবে আগেই বলে নিই কাউকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, ঘটনাগুলো কেমন হাহা-হিহির জন্ম দিয়েছিল সেকথাই বলব।

সোনিয়া ও তানিয়া আসলে ননদ-ভাবি। খুব একটা বয়সের তফাত না হলেও সোনিয়া সর্বদা তানিয়াকে আগলে আগলে রাখত। কিছুদিন যেতেই টের পেলাম, সারাক্ষণ কলকল করা তানিয়া আসলে বেশ সহজ-সরল টাইপ। যা মনে আসে কলকল করে বলে সারা! অল্প বয়সে আমার নিজেরও এই রোগ ছিল। জীবনের জটিল বিষয়গুলোও তার অজানাই। রাবাতে একদিন গাড়িতে কথায় কথায় বলেছিল, প্রথম যেদিন শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল সেদিন বাড়ি খুঁজে না পেয়ে হবু স্বামীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল—"তোমাদের বাসার সামনে কি বোগেনভিলিয়ার গাছ আছে?" তার মহাপণ্ডিত স্বামী নাকি বলেছিল—"না না! আমাদের বাসার সামনে কোনো ফুলের গাছই নেই!" অথচ সেটিই ছিল তাদের বাড়ি।

পুরুষ মানুষ এমন আলাভোলা হয় এমনটি আমি জীবনেও দেখিনি! বাসার সামনে জলজ্যান্ত বোগেনভিলিয়ার যে গাছ সোনিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী জীবনভর আছে, অথচ যার নজর এড়িয়ে যায়—শুধু এড়িয়েই যায় না, ঘোষণাও করে দেয় যে তাদের বাসার সামনে কোনো ফুলের গাছই নেই! সোনিয়া বলেছিল তাদের বাসার এই গাছটি অনেক পুরাতন। বোঝেন এবার ব্যাপারখানা! যে ব্যক্তি নিজের বাসার সামনের পুরাতন গাছ খেয়াল করে না, সে তো শপিং মলে গিয়ে বউ হারালে না জানি অন্য কারো হাত ধরে নিয়ে আসে!

ঝর্ণা এমনিতে ভালো মানুষ কিন্তু কাউকে ক্ষ্যাপাতে পেলে একটা সুযোগও ছাড়বে না, এমন বদ! বাগে পেলে আমাকেও ছাড়ে না। এই কয়েক দিন আগে এক ঘায়ে গলফ বলকে গর্তে পাঠিয়ে রেকর্ড করেছে; যে কাজ ছেলেরাই পারে না বলে দাবি করে। সে কি আর খ্যাপানোর এমন মোক্ষম সুযোগ ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী? এরপর থেকে কোনো বাড়ির সামনে বোগেনভিলিয়ার গাছ দেখলেই সে বলত—"এই দেখ! তানিয়ার শ্বশুরবাড়ি!" আর অমনি গাড়িতে হাসির ধুম পড়ে যেত।

ফেজের মদিনায় ঘোরার সময় 'নো শপিং' বললেও অল্প বয়সীরা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যাচ্ছিল। এই দলে অগ্রগামী ছিল তানিয়া। আর তাকে হারিয়ে সোনিয়ার

অবস্থা দাঁড়াত উদভ্রান্তের মতো। চিন্তিত হয়ে দুপাশের দোকানগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে নিয়ে আসত। একবার তানিয়াকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে সোনিয়া হুসেনকে জিজ্ঞেস করল তানিয়া কোথায়। এর মধ্যে আরো অনেকেই বিভিন্ন দোকানে ঢুকে কেনাকাটা করছিল। হুসেন মনে হয় এই 'বেয়ারা' দলটাকে সামলাতে না পেরে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে ছিল; সে সোজাসাপ্টা বলে দিল—"আমি জানি না সে কোথায়!" শুনে সোনিয়া উল্টো দিকে দিল দৌড়! মিনিট পনেরো পরে দুইজনের হাস্যবদনে আগমন ঘটল। সোনিয়ার হাসি হারানো বস্তু উদ্ধারের খুশিতে, আর তানিয়ার হাসিটি ছিল একটু লজ্জিত গোছের—বাচ্চারা বাঁদরামি করে হাতে-নাতে ধরা পড়লে যেমন হাসি দেয়।

সেই দিনই অথবা মারাক্কাশের মদিনাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানেও 'নো শপিং' বলা সত্ত্বেও আমরা কেউ ছোটখাটো কেনাকাটায় পিছিয়ে ছিলাম না। সবচেয়ে বেশি হারিয়ে যাচ্ছিল তানিয়া আর সোনিয়া। ফেরার সময় হারিয়ে গেল রাকিবা আর আবিদা। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছি, তখন ঠিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে তানিয়া নিজের মনেই বলে উঠল—"শপিং করা মানা না? তাহলে কেন এই শপিংয়ের জন্য দেরি করা! আশ্চর্য!" শুনে আমার কেবলই পেট গুলিয়ে হাসি আসছিল। মেয়েটি যে কত সহজ-সরল তা তখনই বুঝলাম; তার মনেই নেই যে আজ সারাদিন সে নিজেও অনেকবার এই কাজ করেছে! এ যেন ঠিক 'সুঁই আর চালুনির' কাহিনি। অনেক কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললাম—"হ্যাঁ, অন্যদের কাজগুলো এমনই লাগে! নিজেরটা তো আর দেখতে পাই না!" অবাক হয়ে আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে তানিয়া একেবারে চুপ!

বুঝলাম ভয় পেয়েছে। আমার মতো 'ঢোঁড়া সাপকে' কেউ ভয় পেলে আমার মজাই লাগে। তাই তার ভয়টা আর ভাঙালাম না। তারপর থেকে দেখি দলের বয়োজ্যেষ্ঠ দুইজনকে ভয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে, অবশ্য খুব বেশিদিন নয়। যে দলে অনেক রাত অবধি আড্ডা চলে সেখানে দূরত্ব আপনা থেকেই পালিয়ে যায়! কিন্তু ঘটনাগুলো এমনই ঘটেছিল যে তানিয়াকেও দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম ধাক্কাটি সে খেয়েছিল রাশনার কাছে। সে এক কাহিনি বটে! রাবাতে আমরা সবাই এক ফলের জুসের দোকানের সামনে থেমেছি। রাশনা এক গ্লাস জুস নিয়ে তানিয়ার হাতে দিয়ে বলল—"একটু ধরো তো!" বলে সে ব্যাগ হাতড়ে দিরহাম বের করছিল। তানিয়া যেই স্ট্র-টা মুখের কাছে নিয়েছে, অমনি রাশনা অবাক হয়ে বলে উঠল—"এই মেয়ে! তোমাকে ধরতে বলেছি, খেতে বলিনি!" তানিয়ার হতভম্ব চেহারাটা দেখে আমি তৎক্ষণাৎ উল্টো দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাপরে! হাসি আটকানো যাচ্ছিল না! সেই থেকে তানিয়া রাশনাকে 'একশ হাত দূরে থাকুন' টাইপ ভয় পেত।

দলে আমরা দুজনেই সবচেয়ে বয়স্ক। এইরকম কাণ্ডকীর্তি কি কোনো ছেলেদের দলে হতো? আমার ভয়ানক মজা লাগত। কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি, বেশিরভাগ সময় অবজার্ভ করেই গেছি। জানতাম যতক্ষণ মুখ বন্ধ রাখবেন ততক্ষণ আপনি জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান। নিজের নির্বুদ্ধিতাকে প্রচার করতে কে চায়! আজ লিখতে বসে ঘটনাগুলো মনে করে একা একাই হেসে মরে যাচ্ছি; আর পাশে বসে থাকা ছেলে বলছে—"কী হয়েছে? জিনে ধরেছে না মাথাখানি গেছে?"

যাই হোক, ফেজের মদিনায় যারা কেনাকাটা করছিল তারা হুসেনকে বলে যাচ্ছিল, যে কারণে জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল আর আমিও আমার বেত্তমিজ পা দুটোকে বিশ্রাম দিতে পেরেছিলাম। প্রাচীন শহরটির অলিগলিতে ঘুরতে ঘুরতে ভীষণ রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। একবার হুসেন আমাদের এমন গলি দিয়ে নিয়ে গেল যার পরতে পরতে কোনো না কোনো বাড়ির জানালা বা দরজা ছিল। কৌতূহলবশত আমি প্রতিটি জানালা-দরজায় উঁকি দিচ্ছিলাম। হুসেন সাবধান করে বলল—"উঁকি দিও না, এগুলোতে মানুষ থাকে।"

কে শোনে কার কথা! বদনাম হলে না হয় ইন্ডিয়ার হবে—কারণ আমাদের হিজাবহীন দেখে সবাই ইন্ডিয়ানই ভাবছিল। একসময় সরু এক প্যাসেজে ঢুকে দেখি আমি এক রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছি! এক তরুণী রান্না করছিল। আমার পদশব্দে সে প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে উত্তপ্ত খুন্তি হাতে ফিরে তাকাল। আমাকে কিছুক্ষণ দেখে সে হেসেই ফেলল! আমি 'সরি' বলতে বলতে দ্রুত দলের পিছু নিলাম।

এবার চলেছি তিনজন মানুষ কোনোমতে হেঁটে যেতে পারে এমন চওড়া গলি দিয়ে। হঠাৎ পেছন থেকে বিজাতীয় ভাষায় চেঁচামেচি শুনে একপাশে সরে দাঁড়ালাম। দেখলাম এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে আমাকে পাস করে গেল! এলাকাটা 'যানবাহনমুক্ত' জানলেও 'গাধামুক্ত' নয়—সেটা জানা ছিল না। সরু রাস্তায় মালামাল বহনের জন্য গাধাই একমাত্র ভরসা। দুপুরে হুসেন আমাদের এক চমৎকার রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। এর সাজসজ্জা নজরকাড়া। পরিবেশনকারীরাও অল্পস্বল্প ইংরেজি জানতেন। স্থানীয় খাবারগুলো অপূর্ব লাগল। 'হাঙ্গার ইজ দ্য বেস্ট সস' কথাটি তো আর এমনি এমনি জন্মায়নি!

খাবার সময় ম্যানেজার স্বয়ং এসে তদারকি করছিলেন। খালি হুসেন ছিল আগাগোড়াই গম্ভীর। একদিন জানতে চেয়েছিল আমাদের দেশে বিয়ে কেমন

করে হয়, ডিভোর্সের হার কেমন ইত্যাদি। তখন জানাল তাদের দেশে ডিভোর্সের হার খুবই বেশি। মেয়েরাই বেশি ডিভোর্স চায়, কারণ বিয়েতে মেয়ের বাবাকে বরের পরিবারকে মোটা পণ বা যৌতুক দিতে হয়। আমাদের দেশে উল্টো প্রথা শুনে হুসেনের বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল!

খেয়েদেয়ে আবার আমাদের হাঁটা শুরু হলো। আমি হুসেন বা নীল জোব্বার (গাইড) সাথে আঠার মতো লেগে থাকতাম, পাছে হারিয়ে না যাই! ঝর্ণা আমাকে জুব্বা কেনার কথা মনে করিয়ে দিল। নীল জোব্বা যখন ঝর্ণাকে কেনাকাটা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিল, তখন ঝর্ণা কৌতুক করে বলল—"দেখো! আমার সিস্টার তার বরের জন্য এমন জুব্বা কিনতে চান। কিনতে না দিলে উনি তোমার জুব্বাখানিই খুলে নিয়ে যাবেন!" ঝর্ণার কথা শুনে হুসেন আর নীল জোব্বা দুজনেই খুব হাসল। শেষে তারা দুজনে মিলেই আমাকে পছন্দমতো জুব্বা কিনে দিল।

আমাদের শেষ গন্তব্য ক্যারাভান সরাইখানা। আকারে বুখারার সরাইখানার চেয়ে ছোট। হুসেন জানাল গাড়ি আসতে আধাঘণ্টা সময় লাগবে। আমি আর ঝর্ণা বারান্দার সোফায় বসলাম। রাশনাও এলো, তার হাঁটুতে সমস্যা থাকায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। পিছে পড়ে থাকা সোনিয়া-তানিয়া এবং অন্যরা পনেরো মিনিট পরে পৌঁছালো। মাইশা এসে রাশনাকে বলল—"আন্টি আপনার বিশ্রামের জন্য আমরা আধাঘণ্টা বিরতি নিলাম।" রাশনা রেগে গিয়ে বলল—"উল্টাপাল্টা কথা বলবে না! তোমাদের নিজেদের কারণে দেরি হচ্ছে, আমাকে টানছো কেন?" মাইশা দূরে গিয়ে মোবাইল টিপতে লাগল আর আমি ও ঝর্ণা হাসি চেপে বসে রইলাম।

১০

ক্যাসাব্লাঙ্কা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশনের সময় ঝর্ণাকে বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়েছিল। অফিসার তার কাছে আমেরিকান ভিসার স্ন্যাপশট দেখেও ছাড়ছিল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ঝর্ণা যখন ফিরল, জানলাম সেই অফিসার আসলে কিছু 'উপঢৌকন' চাচ্ছিল! নগদ টাকা নেই শুনে পরে ছেড়ে দিয়েছে। সেখান থেকে লাগেজ ক্লেইমে এসে দেখি আমাদের সুটকেসগুলো এতিমের মতো বেল্টে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে আমাদের দেরি দেখে ঝর্ণা আর মাইশার মধ্যে সামান্য কথা-কাটাকাটি হলো। মাইশা আমাকে কোনো কিছুই বলত না, কেবল অদ্ভুত অসহায় মুখ করে তাকিয়ে থাকত। তবে শেফশোয়েনে মাইশা অসুস্থ হলে ঝর্ণাই তার

তদারকি করে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছিল। রাতের আড্ডায় হাহা-হিহির বন্যায় আমরা সবাই সবার খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম।

পরদিন আমাদের গন্তব্য ছিল ইফরান সিটি। স্থানীয় ভাষায় ইফরান অর্থ 'গুহা'। শহরটিতে পা দিয়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম—এটি যেন আফ্রিকার বুকে এক টুকরো ইউরোপ! ঝকঝকে রাস্তা, ইউরোপীয় ধাঁচের বাড়ি আর প্রচুর সিডার গাছে ঘেরা শহরটি দেখে মনেই হয় না আমরা মরক্কোয় আছি। ১৯২৯ সালে ফরাসি কলোনিয়ালরা এটলাস মাউন্টেইনের মধ্যভাগে এই শৈল শহরটি গড়ে তোলে।

ইফরানের উচ্চতা ১৬৬৫ মিটার। এখানে ইউরোপীয় ঘরানার বিশ্ববিদ্যালয়, গির্জা এবং রাজবাড়ি আছে। পাহাড়ের পাদদেশে বরফ দেখে আমরা অবাক হলাম—মার্চ মাসে বরফ! হুসেন আমাদের সিডার বনে 'ম্যাকাক' নামের বিরল প্রজাতির বাঁদর দেখাতে নিয়ে গেল। ঝর্ণা আমাকে পাহাড়ে উঠতে নিষেধ করল, আর আমিও বুঝেছিলাম আমার পক্ষে পাহাড় বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

জীবনেও ট্র্যাকিং করিনি। তাছাড়া বাঁদরে আমার মোটেও ইন্টারেস্ট ছিল না। সারাজীবন গেন্ডারিয়ায় বাঁদরের সাথেই বসবাস। নানান বাঁদরামি আর চুরির গল্প আমার নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিতেই জমা আছে। গ্রীষ্মের খরদাহে ছাদের ট্যাংকের ঢাকনা খুলে লাইন ধরে বাঁদরকুলের একের পর এক অবগাহন, আর "আপনেগোর টাঙ্কিতে বাঁদর নামছে!" বলে প্রতিবেশীদের চেঁচামেচি থেকে শুরু করে ঘরে ঢুকে পাউরুটি, বিস্কুট, কলা, মুলা এমনকি আলু-পটল অবধি অপহরণ করার রেকর্ড আমার নিজের চোখেই দেখা। গাড়িতে যখন উঠছি, তখন আমাদের অতি ভদ্রলোক ড্রাইভার তার ভাষাতেই জিজ্ঞেস করল— "মাঙ্কি দেখবে না?"

আমিও সোজা বাংলায় জবাব দিলাম— "আমার সাথে চলো, কত মাঙ্কি দেখতে চাও দেখিয়ে দেব!" ভাষা না বুঝলেও ও ভাব বুঝতে পেরেছিল, কারণ জবাব শুনে সে বেদম হাসছিল। এদিকে আমাদের দলের মেয়েরা বাঁদর লাফ দেওয়ার ছবি তুলছিল। কিছুক্ষণ পর আমাদের যাত্রা ফের শুরু হলো। এবার বন নয়, বরফঢাকা পর্বত দেখা যাচ্ছিল। পর্বত নয়, তার আভাস। সেদিকে ইশারা করে হুসেন বলল— "এটলাস মাউন্টেইন। আজ আমরা কেবল লাঞ্চের জন্য থামব। সারাদিন চলব, বিকেল নাগাদ পৌঁছাব সাহারা মরুভূমিতে। সেখানে সানসেট দেখব।"

শুনে আমি নিমেষেই চনমনে হয়ে উঠলাম। যদিও জার্নিটা বেশ হেক্টিক ছিল, কিন্তু এটলাস মাউন্টেইন রেঞ্জের প্রায় সবটাই দেখতে পেয়েছিলাম। একই পর্বতের

ভিন্ন ভিন্ন চেহারা দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত। আল্লাহর দুনিয়ায় কত বৈচিত্র্য আর মহিমা ছড়িয়ে আছে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি! দুপুর নাগাদ যখন বরফে ঢাকা এটলাস একদম চোখের সামনে, তখন লাঞ্চের জন্য গাড়ি থামল এক বিশাল রেস্টুরেন্টের সামনে। প্রচুর ট্যুরিস্ট। দোতলায় খোলা বারান্দায় এটলাসকে সামনে রেখে ঝাঁ ঝাঁ রোদে এক টেবিলে বসলাম সবাই। কড়া রোদে পুড়ে যাচ্ছিলাম, তাও কারও ভ্রুক্ষেপ ছিল না—সবাই এটলাসের মোহনীয় রূপে মুগ্ধ। সূর্যটা ঠিক সামনেই ছিল বলে ছবি তুলে সুবিধা করতে পারছিলাম না।

এমন অদ্ভুত মাউন্টেইন আর একটাও দেখিনি। ইউরোপের আল্পস দেখেছি, স্পেনের পিরিনিজ দেখেছি, হিমালয় তো দেখেছিই, দু'বছর আগে মাউন্ট কেনিয়া দেখেছি—কিন্তু এই মধ্য এটলাসের মতো একটাও দেখিনি। পুরোটা বরফে ঢাকা, যেন বিশাল এক দৈত্যাকার টেবিলকে কেউ বরফ-শুভ্র টেবিলক্লথে ঢেকে দিয়েছে। ছবিতে দেখা আফ্রিকার উচ্চতম পর্বত কিলিমাঞ্জারো দেখতে অনেকটা এমন, খালি সেখানে বরফ নেই। তাঞ্জানিয়ায় অবস্থিত এই পর্বতকে 'টেবিল মাউন্টেইন'-ও বলা হয়।

খেয়ে দেয়ে নিচে নেমেছি সুবিধাজনক ছবি তোলার চেষ্টায়। নিচের বারান্দায় হুসেন এক চেয়ারে বসে ছিল। আচমকা আমাকে পেছন থেকে ডেকে বলল— "শোনো! আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। তোমার ছেলের বয়স কত?" ঐ যে শেফশোয়েনে বলেছিলাম "তুমি আমার ছেলের মতো", সেই ঘোর এখনও কাটেনি ওর। বললাম— "আমার ছেলের বয়সও এমনই। তিন বছরের গ্র্যান্ডসানও আছে।" পরবর্তী প্রশ্নের জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না। ও জিজ্ঞেস করল— "নাজিয়া কি তোমার ডটার?" নাজিয়া যেহেতু আমার এক্সট্রা যত্ন নেয়, হয়তো সে কারণেই ওর এমন মনে হয়েছে। বললাম— "বলতে পারো মাদার অ্যান্ড ডটার ফ্রেন্ড, বাট নট বায়োলজিক্যাল মাদার!" অদ্ভুত চোখে চেয়ে ও জিজ্ঞেস করল— "তোমাদের কতদিনের পরিচয়?"

"গত অক্টোবর থেকে।"

"কিন্তু দেখে মনে হয় অনেক দিনের পরিচয়!"

"হ্যাঁ, ক্রেডিট নাজিয়ার। খুবই ভালো একটি মেয়ে।"

ফের যাত্রা শুরু হলো। অবাক হয়ে দেখছিলাম এটলাস তার সাদা চাদর ফেলে এবার গেরুয়া রঙ ধরেছে। কি অদ্ভুত সুন্দর যে দেখতে! এক জায়গায় দেখলাম লেকের মতো। হুসেন জানাল— "এসব এলাকায় পানির খুব কষ্ট, তাই রাজা নদীতে বাঁধ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।"

১১

ফেজ থেকে রওনা দেওয়ার পর ইফরান সিটি ছাড়া আর বিরতি ছিল না। মরক্কোর এসব এলাকায় ট্রেন নেই। চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলতে চলতে সময় কোনদিক দিয়ে কাটছিল জানি না। পেছনের সিট থেকে রাকিবা বিস্কুট, চকলেট আর খেজুর সাপ্লাই দিচ্ছিল। আজকের সফরে এই সাপ্লাই না থাকলে সবার বারোটা বাজত। দুপাশে জনমানবহীন ধূ-ধূ বিরান প্রান্তর দেখে মনে ভীতি জাগে। রেগে গেলে আমি রাকিবাকে 'বিস্কুটের মা' বলে ডাকতাম। ও রেগে বলত— "ভালো হবে না আন্টি! আমাকে বিস্কুটের মা ডাকলে আমি আপনাকে 'ঠাম্মি' ডাকব!"

"ডাক না! কোনো অসুবিধা নেই। আমি তো ঠাম্মিই!" ওমনি চমকে গিয়ে রাকিবা বলে— "ঠাম্মি মানে কি দাদি নাকি? হায় আল্লাহ! আমি ভেবেছি কত না জানি মুরুব্বি গালি!" ওর কথা শুনে সবাই হাসতে শুরু করল।

বেলা ঢলে পড়তে শুরু করেছে। সাহারার খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। পৃথিবীর বৃহত্তম এবং উষ্ণতম মরুভূমি এই সাহারা। এই উষর মরুর আদি যাযাবর বার্বাররা জানে এর রহস্য। বালুতে পায়ের ছাপ দেখে তারা উট বা মানুষের সব তথ্য বলে দিতে পারে। মরুভূমি প্রথম দেখেছিলাম প্লেন থেকে—অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলার রাব আল খালি মরুভূমি। এখন যাচ্ছি তার চেয়েও বড় মরুতে, যার ব্যপ্তি ৩৩ লক্ষ বর্গকিলোমিটার! যা ভূমধ্যসাগরের দ্বিগুণ বড়। সাহারা যেন এক রহস্যের খনি।

বিকেল নাগাদ পৌঁছালাম ক্যাম্পে। তাবুগুলোর পেছনেই আটটি উট শুয়ে ছিল। হুসেন তাড়া দিল— "এক্ষুণি রওনা না দিলে সানসেট মিস করবে!" আমরা উটের কাছে গেলাম। আমার তিনমণ ওজন বইতে পারবে কি না, তা নিয়ে মনে মনে চিন্তিত ছিলাম। দেখলাম সামনের উটটিই সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান। আমি চুপিচুপি ওর কানে গিয়ে বললাম— "দেখিস রে বাবা, আমায় ফেলে দিসনে। তোর কষ্ট হলেও সয়ে নিস।"

আমার উটের নাম ছিল 'সাম্বুদা', মানে হলো 'দ্য বস'। আমি বললাম— "তাহলে আমি হলাম লিডার!" সামনে তাকিয়ে দেখি বালুর পাহাড়ের সারি। উট যখন বালুর পাহাড় থেকে নামে, তখন সামনে ঝুঁকে যাচ্ছিলাম আর মনে হচ্ছিল উল্টে পড়ে যাব! মাইশার উট আবার আমার হাঁটু চাটা শুরু করল। আমি ভয়ে চেঁচাতে লাগলাম— "কামড়াচ্ছে রে! খেয়ে ফেলল রে!" ইব্রাহিম এসে ওটাকে সরিয়ে

দিলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উট কামড়ায় কি না জানি না, তবে ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।

বালিয়াড়ির নিচে উট থামলে এক পা নামিয়েছি মাত্র, অমনি হাঁটু অবধি নরম বালুতে গেঁড়ে গিয়ে আমি ধপাস! একা ওঠা অসম্ভব। ইব্রাহিম ও ওমর শরীফ খুব হ্যাংলা-পাতলা, ওরা এই 'বস্তা' তুলতে পারবে কি না সন্দেহ ছিল। কিন্তু ওমর অনায়াসে এক টানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। ওর শক্তি দেখে আমি থ! উপরে উঠে সূর্যাস্ত দেখলাম। পশ্চিম আকাশে কমলা রঙের আভা, আর নিচে ঘন কুয়াশা। সাহারার কুয়াশা নাকি ভয়ংকর, একে 'লে সাহারাটাই' বলা হয়।

সূর্যাস্তের পর ক্যাম্পে ফিরলাম। তাবু ঠিকই, কিন্তু ভেতরে এসি, হিটার, গদিওয়ালা খাট—সবই ছিল। ডিনারের পর হলো ক্যাম্প ফায়ার। ওমরের ঢোলের তালে তালে মেয়েরা নাচল। স্পেনিশ আর জাপানি ট্যুরিস্টদেরও হাত ধরে টেনে নাচে নামালাম। অনেক রাতে লেপের নিচে সেঁধিয়ে গেলাম। মরুভূমির প্রচণ্ড শীত—ভোররাতে লেপ সরে যাওয়ায় কোমর জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। সেই যে ঠান্ডা লেগে কাশি শুরু হলো, সেটা পরে অনেক ভুগিয়েছে।

সকালে উঠে দেখি মেয়েরা রঙিন শাড়ি পরে বালিয়াড়িতে ছবি তুলছে। ঠিক যেন বলিউডের নায়িকা! রাকিবা আমাকে টেনে নিয়ে গেল ওদের তাবু দেখাতে— "আন্টি আমাদের হানিমুন টেন্ট না দেখলে জন্মই বৃথা!" গিয়ে দেখি রাজকীয় বাথটাব। কিন্তু হাসির বিষয় হলো, বেডরুম আর ওয়াশরুমের মাঝে প্রাইভেসি বলতে তেমন কিছুই নেই। রাকিবা হাসতে হাসতে বলল— "ঠাম্মি, যারা হানিমুন করে তাদের কি প্রাইভেসি লাগে না?"

সাহারা অভিযানের এই আধুনিক তাবুবাস ভালো লাগলেও উটের পিঠে চড়ে বালিয়াড়ির গভীরে ঢোকার সেই রোমাঞ্চই মনে দাগ কেটে আছে।

১২

সাহারা মরুভূমিতে আমাদের টেন্ট যেখানে ছিল, সে জায়গার নাম মারজোউগা (Merzouga)—অর্থাৎ ‘দ্য গেট অফ সাহারা’। একদিক দিয়ে কথাটা ভুল নয়। কারণ টেন্ট যেখানে, সেখানটা বালুময় হলেও বালিয়াড়ি নয়; মোটামুটি সমান জায়গা। কিন্তু টেন্টের ঠিক পরেই বালুর পাহাড় আর পাহাড়। দেখে যেমন ভালো লাগে, ভয়ও লাগে বৈকি!

এবার বলি টেন্টের কথা। আমাদের মরক্কো ভ্রমণের দিন-তারিখ ঠিক হয়েছিল উজবেকিস্তান থেকে ফিরেই। জানতাম সাহারায় আমাদের তাবুতেই থাকতে হবে। সেই অনুসন্ধিৎসা থেকে ইউটিউব ঘেঁটে সাহারার মরুচারী বেদুইনদের

জীবনযাত্রা নিয়মিত ফলো করতে শুরু করেছিলাম। তখন মাথায় ছিল না যে সাহারা উত্তর আমেরিকার চেয়েও বড় এবং এর উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমের ভূপ্রকৃতির মধ্যে যেমন বিস্তর তফাৎ, তেমনি বিভিন্ন বেদুইন গোত্রে গোত্রেও বেজায় পার্থক্য রয়েছে। এক ইউরোপীয় দম্পতির ব্লগে দেখেছিলাম, সুদানের একদম ভেতরে তারা এক রাত এক মুসলিম পরিবারের সাথে তাদের তাবু কাটিয়েছিল। একদম সাদামাটা তাবু—মরুভূমির মাঝখানে প্রখর রোদে কালো কাপড়ের নিচু করে টানানো তাবু। তাতে মেঝেতে সতরঞ্জি টাইপ কার্পেট ছাড়া কিচ্ছু ছিল না। তবে সেই মরুভূমি ছিল সমতল; উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি ছিল না।

এছাড়া উজবেকিস্তানে কিজিলকুম শীতল মরুভূমির ভেতর দিয়ে গিয়েছিলাম খিভা। কিজিলকুমের মাঝামাঝি এক রেস্টুরেন্টের সামনে সেখানকার নোমাডদের তাবু প্রদর্শনীর জন্য রাখা ছিল বটে; তাতে গদিওয়ালা লম্বাটে চেয়ার থাকলেও বিছানা ছিল না। ইরানি নোমাডদের কিছু ব্লগ নিয়মিত দেখি; তাদেরও সব কাজকারবার কার্পেটের ওপর, আসবাবপত্রের বালাই নেই। যে কারণে ধরেই নিয়েছিলাম সাহারা মরুভূমির যাযাবরদের তাবুগুলোও হবে সেই ধরনের। দুই হাঁটুতে নকল কলকব্জা নিয়ে মাটিতে বসা ডাক্তারের ঘোরতর বারণ; তাই পারব কি না সেই সন্দেহও ছিল।

সাহারায় তাবুবাসের ইচ্ছে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা! মনটাকে বিধাতা ভয়ানক কৌতূহলী আর অ্যাডভেঞ্চারাস করে তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু সে তুলনায় শক্তি-সাহস দেননি।

এদিকে সাহারায় তাবুবাসের ইচ্ছে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা! মনটাকে বিধাতা ভয়ানক কৌতূহলী আর অ্যাডভেঞ্চারাস করে তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু সে তুলনায় শক্তি-সাহস দেননি। তবে যতটা সুযোগ পাই, তা সুদে-আসলে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। তাই সাহারার তাবুবাস ছিল আমার মরক্কো ভ্রমণের প্রায়োরিটি লিস্টের টপে। কাজেকর্মে ট্রায়াল হিসেবে গত ডিসেম্বরে ‘ওয়ান্ডার উইমেন’-এর সাথে চট্টগ্রামের ‘মাটিটা’ রিসোর্টে থাকার জন্য টেন্ট বেছে নিয়েছিলাম। ছবিতে দেখেছিলাম টেন্টের মেঝেতে ইরানি নোমাডদের মতো কেবল গদি পাতা। তখন তো আর ধারণা ছিল না সাহারার তাবুগুলো কেমন। ঝর্ণা খালি বারবার বলছিল,

“আপা, পারবেন না। তাবু বদলে রুম নেন।”

সে তো আর জানে না আমার মনের খবর! কষ্ট হয়েছিল বৈকি! বিছানায় ধপ করে বসতে গিয়ে শুয়ে পড়তে হতো, আর উঠতে গেলে উপুড় হয়ে দুই পায়ের পাতা আর হাতের তালুতে ভর দিয়ে, হাঁটু ভাঁজ না করে উদ্ভট ভঙ্গিতে ঠিক মরুভূমির উটের মতোই উঠতাম। সেই সাথে আত্মবিশ্বাসও জন্মেছিল। নাহ! আমার সাহারায় তাবুবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ! সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছিল দুই হাত মাথার ওপরে তুলে বিশ্বকবি রবিঠাকুরের মতো চেঁচিয়ে বলি—

“ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!

পায়ের তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।”

হায়! তখন যদি জানতাম আমার এই অ্যাডভেঞ্চার মাঠে মারা যেতে বসেছে! কেনিয়ার মাসাইমারায় তবু তাবুগুলোতে একটু বুনো আবহ ছিল; রাতের বেলা নানান জীবজন্তুর ডাক শোনা যেত। মনে হতো হায়েনারা যেন তাবুর পাটাতনের ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে ডাকছে! কিন্তু সাহারার তাবু আমাকে বেজায় হতাশ করেছিল। এই তাবুর সাথে ফাইভ স্টার হোটেলের কোনো তফাত নেই। টেন্ট না বলে ওটাকে ‘তারাওয়ালা হোটেল’ বলাই ঠিক। কেবল ধূ-ধূ মরুর পরিবেশের গুণে সেটি হয়ে উঠেছিল অনন্য। এছাড়া বাদবাকি সবকিছু, এমনকি খাবার টেবিলের ন্যাপকিনটাও ছিল ফাইভ স্টার হোটেলের কায়দায় ভাঁজ করা। কেবল আলখাল্লা ও পাগড়ি পরা অল্পবয়সী ওয়েটাররা যখন ধোঁয়া ওঠা গরম তাজিন হাতে ঢুকত, কেবল তখনই মনে হতো—নাহ! সাহারার ভেতরে আছি।

উটের পিঠে চড়ে বালিয়াড়ি বেয়ে ওঠা-নামার রোমাঞ্চ এবং রাতের ক্যাম্পফায়ারের গানবাজনা বাদ দিলে বাদবাকি সবই ছিল বেজায় ফ্যাঁকাসে। অ্যাডভেঞ্চারের কথা ভাবলে—শাওয়ারে স্নান করে, অত্যাধুনিক বেসিনে হাত ধুয়ে, গদিমোড়া বিছানায় শুয়ে ঘুমালে কি আর সাহারায় আছি মনে হয়? খালি মাথার ওপর ছাদের বদলে তাবু—এইটুকুই তফাত!

সাহারা অভিযান শেষ হলে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। যে পথে এসেছিলাম, এবার তার উল্টো দিকের পথ—সেই এটলাস মাউন্টেইন রেঞ্জের ভেতর দিয়েই রাস্তা। এটলাস যেন পুরো মরক্কোকে পাইথনের পাকে আগাগোড়া জড়িয়ে আছে। এবারের রেঞ্জটা একটু ভিন্নতর; গন্তব্য ‘ডেডস ভ্যালি’ (Dades Valley)। নামটা শুনে ভেবেছিলাম যাচ্ছি বোধহয় কোনো ‘মৃত উপত্যকায়’। পরে দেখলাম ডেডস নদীর নামে এই উপত্যকার নাম। আসলে এটি প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এলাকা

জুড়ে থাকা 'সিরিজ অফ গর্জ' বা গিরিখাতের ভ্যালি। শুকনো মৌসুমে ডেডস নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় এটি ভয়ানক স্রোত আর প্রচুর পানি বয়ে আনে। বর্তমানে এটি জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট। এই গর্জগুলোর উচ্চতা ৬৫০ মিটার থেকে ১৬০০ মিটার পর্যন্ত। সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানটি মাত্র ৩৩ ফুট চড়া। ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্য পুরো পথটিই এসফল্ট এবং কংক্রিটের পাকা রাস্তা করা হয়েছে। গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সেই পথে চলা এক দারুণ অভিজ্ঞতা! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কাজ থাকে না।

ডেডস নদী ৩৫০ কিলোমিটার লম্বা, যা পরে মরক্কোর দীর্ঘতম নদী 'দ্রা' (Draâ)-তে মিশেছে। দ্রা নদী প্রায় ১১০০ কিলোমিটার লম্বা। আমরা মারজোউগা যাওয়ার সময় এই নদীর লেকের মতো বিস্তার দেখেছিলাম। বাঁধ দিয়ে এই নদীর পানি ধরে রাখা হয় এবং শুকনো মৌসুমে গোটা এলাকার পানির প্রয়োজন মেটানো হয়। আল্লাহর কী অপার মহিমা! রুক্ষ মরু প্রান্তরে পর্বত সৃষ্টি করে পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

গেরুয়া রঙের রুক্ষ কিন্তু অপূর্ব পর্বতশ্রেণী দেখে মনেই হয়নি এখানে কোনো পানির ধারা থাকতে পারে। সাহারা থেকে যখন ফিরছি আর গাড়ি ক্রমশ ওপরের দিকে উঠছে, তখন দুই দিকেই পাহাড়ের সারি লম্বালম্বি উঠে সামনে ঝুঁকে আছে। মনে হচ্ছিল এরা যেন জীবন্ত; উঁকি দিয়ে দেখছে কারা তাদের শান্তিভঙ্গ করতে এই সংকীর্ণ পথে ঢুকেছে। আমরা সমতলের মানুষ, এমন দৃশ্য দেখে চোখে যেন মায়া-অঞ্জন পড়ে যায়। মরক্কো সাব-সাহারান দেশ হলেও এর প্রতিটি নগরীকে আল্লাহ তায়ালা দুহাত ভরে সাজিয়েছেন। ক্যাসাব্লাঙ্কা বা রাবাতের রূপ একরকম, আবার নীল শহর শেফশোয়েন বা ঐতিহ্যের শহর ফেজের রূপ অন্যরকম। সাহারার ভয়াল সৌন্দর্যের পর এই পাহাড়ি মরুপ্রান্তর আমাদের জন্য বিস্ময়ের পর বিস্ময় নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ডেডস ভ্যালিতে ঢোকার আগে যখন উঁচু এক ভিউ পয়েন্টে গাড়ি থামানো হলো, তখন নিচে তাকিয়ে ঘন গাছের জঙ্গল দেখে চমকে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রচুর গোলাপ, খেজুর আর আমন্ড জন্মায়। 'ডেড' মানে 'মৃত'—এটিই সবার আগে মনে আসে; কিন্তু এই 'ডেডস' (Dades) নামটির পেছনে অন্য অর্থ আছে। আমাজিগ ভাষায় সম্ভবত এর অর্থ 'শিশুর মতো টলমল পায়ে হেঁটে যাওয়া'। গিরিখাতের ভেতর নদীর এঁকেবেঁকে চলা দেখলে সত্যিই মনে হয় কোনো শিশু যেন এক পা ফেলে এগোবার জায়গা না পেয়ে আরেক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁক পেরোতেই মনে হয়—এইতো, এখানে ফেলেছে দ্বিতীয় পদখানি!

সেই ভিউ পয়েন্টে অনেক স্থানীয় লোকজন পসরা সাজিয়ে বসে ছিল। পুরো মরক্কোতে কালো মানুষ খুব একটা দেখিনি বললেই চলে, কিন্তু এখানে সবাই কালো। এক নিমিষেই বোঝা যায় এরা আদি আফ্রিকার হাসিখুশি জনগণ। কারণ কালো মুখগুলোতে সাদা দাঁতের অমলিন হাসি ঝিলিক দিচ্ছিল। জীবনে প্রথম আফ্রিকার লোকজনের সাথে মেশার সুযোগ হয়েছিল ২০১২ সালে যখন 'এনডিসি' (NDC) কোর্স করি। তখন দেখেছিলাম আফ্রিকার মানুষেরা শুধু ভদ্রলোকই নয়, অত্যন্ত ফুর্তিবাজ। নাচ-গান যেন এদের রক্তে মিশে আছে।

ডেডস ভ্যালির ভিউ পয়েন্টে নামা মাত্র ফেরিওয়ালারা আমাদের ঘিরে ধরল। হাতে বানানো মালা, চুড়ি, দুল আর ওড়নার মতো একচিলতে কাপড়—যা ওখানকার মেয়েরা আলখাল্লা ড্রেসের ওপর পরে। বিবাহিতরা বাম কাঁধের ওপর দিয়ে এবং অবিবাহিতরা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ঘড়িয়ে পরে। হুসেন সাবধান করে দিল— "এখান থেকে কেউ কিছু কিনো না, ট্যুরিস্ট স্পট বলে দাম অনেক বেশি।" লোকগুলো নেহাৎই গরিব, হয়তো পর্যটকরাই তাদের আয়ের উৎস। মায়া লাগছিল খুব, কিন্তু কেনার মতো কিছু পাইনি। নিজের মনে নিচের সবুজ উপত্যকার ছবি তুলছিলাম, এমন সময় "হেই গর্জিয়াস লেডি!" বলে এক তরুণ ফেরিওয়ালা আমাকে পাকড়াও করল। পটিয়ে কিছু একটা গছানোই তার উদ্দেশ্য। আমার আপত্তি না শুনেই সে তার হাতের ওড়না আমাকে পরিয়ে দিয়ে মোবাইলটা টেনে নিল এবং কয়েকটি ছবি তুলে দিয়ে বলল— "লুক! ইউ আর ফাতিমা!"

নবী-নন্দিনী খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা বানিয়ে দিল যখন, তখন বুঝলাম মুসলিম প্রধান এই অঞ্চলের মানুষের এটাও এক বিক্রয় কৌশল। নইলে কোথায় আগরতলা আর কোথায় চৌকিরতলা! উপমাটা একেবারে আকাশ আর পাতাল। দেশগুলোও মুসলিম প্রধান। আবার আফ্রিকার ইস্টার্ন বেল্টেও মুসলমান বেশি। হবে না কেন, এডেন উপসাগর, বাব-আল-মান্দেব আর লোহিত সাগর পার হলেই তো আরব উপদ্বীপ। প্রাচীনকাল থেকেই আফ্রিকার পূর্ব উপকূল আর এরাবিয়ান পেনিনসুলার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ চলে আসছে। মদিনায় হিজরতের আগে কোরাইশদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে মুসলিমদের প্রথম দলটি হিজরত করেছিল আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া), যা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের দেশ।

সেই কালো ফেরিওয়ালার উজ্জ্বল হাসিমুখটিকে আশাহত করতে মন চায়নি, কিন্তু এমন হাতের কাজ আমি নিজেই করতে পারি; তাছাড়া কাপড়টাও ছিল দেড় গজ

মাপের নিতান্তই সস্তা। এর পেছনে একশ ডলার খরচ করার মতো পকেটের জোরও আমার নেই। ফের যখন সবাই গাড়িতে উঠলাম, দেখি সোনিয়া একটা ওড়না কিনেছে। "কত দিয়ে কিনলে?"—প্রশ্নের জবাবে ও জানালো, "দেড়শ ডলার।" অবাক হয়ে বললাম, "হায় আল্লাহ! আমার কাছে তো একশ ডলার চেয়েছিল!"

সোনিয়া বলল— "আপা, একশ ডলারই চেয়েছিল। লোকটাকে দেখে মায়া লাগল, তাই আমি পঞ্চাশ ডলার বেশি দিয়েছি।" একথা শুনে তৎক্ষণাৎ সোনিয়াকে ভালোবেসে ফেললাম। যারা গরিব মানুষকে মায়া করে, আমি তাদের খুব পছন্দ করি। প্রথম থেকেই দেখছিলাম মাত্র বছর দুয়েকের ছোট তানিয়াকে ও বাচ্চাদের মতো আগলে রাখছে। এখন সোনিয়াকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। নতুন করে ভালো লাগল এই মায়াবতী তরুণীটিকে।

১৩

ডেডস নদীর বরফগলা হিমশীতল পানিতে মেয়েরা জুতো খুলে প্যান্ট গুটিয়ে নেমে পড়ল। পায়ের গোড়ালি অবধি স্বচ্ছ জল, নিচের নুড়িটিও স্পষ্ট দেখা যায়। পানি দেখেও নামিনি—এমন কাণ্ড আমার জীবনে বিরল। নদী, পুকুর বা হাওর—হাতের নাগালে পেলে আমি নেমেই পড়ি। ২০১৫ সালে স্পেনের সান-সেবাস্তিয়ানে শীতের মধ্যেও আটলান্টিকের হিমশীতল পানিতে নেমেছিলাম। আর এখন তো মার্চ মাস। স্যান্ডেল খুলে নেমে পড়লেই হতো, কিন্তু সাহস হলো না। সাহারার তাবুতে রাতদুপুরে ঘুমের ঘোরে লেপ ফেলে দিয়ে এমন ঠান্ডা লেগেছে যে, ভয় পাচ্ছিলাম পুরোনো ব্রংকো-অ্যাজমা না আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। খুকখুক কাশি চলছে, আমি সন্তর্পণে সামলে নিচ্ছি যাতে দলকে ব্যতিব্যস্ত করতে না হয়।

নাজিয়া নিজের মায়ের চেয়েও বেশি খেয়াল রাখছিল আমার। ঝর্ণা তো তীক্ষ্ণ নজর রাখেই, আবার একটু এদিক-সেদিক হলেই আমেরিকায় বড় জা-কে আর দেশে ছেলেকে তথ্য সরবরাহ করে আমাকে রীতিমতো সমঝে রাখে। রাকিবা আর দলনেতা মাইশাও সবসময় তটস্থ। চেন্নাইয়ের সিএমসিতে অপারেশনের সময় আমার সহ্যশক্তি দেখে ডাক্তাররা অবাক হয়েছিলেন, তাই এই চমৎকার গিরিখাত আর ডেডস নদী দেখার আনন্দে নিজের অসুস্থতা বেমালুম চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

গিরিখাত ঘোরার পর হুসেন তাড়া দিল। গাড়িতে উঠে দেখা গেল তানিয়া আর সোনিয়া নেই। গাড়ি উল্টো পথে ঘুরিয়ে কিছুদূর যেতেই তানিয়াকে পাওয়া গেল,

ও নিচু হয়ে কী যেন কিনছিল। কিন্তু সোনিয়া উধাও! হুসেন নির্বিকার মুখে গাড়ি চালিয়েই যাচ্ছিল। আমরা সবাই চেঁচামেচি করছি পেছনে ফিরে দেখার জন্য, কিন্তু ও কানেই দিচ্ছে না। ওর ভাবখানা এমন—দলছুট হওয়ার শাস্তি হিসেবে ও সোনিয়াকে ছাড়াই চলে যাবে। গিরিখাত পেরিয়ে খোলা জায়গায় আসতেই দেখা গেল সোনিয়া রাস্তার ধারের এক দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামতেই ও উঠে এলো এবং সবার বকুনি খেয়ে অবাক হয়ে বলল— "কেন? হুসেন তো জানেই আমি কোথায়! সেই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে!"

তখন বুঝলাম হুসেন আমাদের সাথে 'প্র্যাক্টিক্যাল জোক' করে ভয় দেখাচ্ছিল। কী পাজি রে বাবা! সবাইকে উৎকণ্ঠায় রেখে ও মজা দেখেছে এবং একই সাথে কড়া একটা সবকও দিয়েছে।

লাঞ্চের সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। হুসেন আমাদের এক দেহাতি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেল। পুরোনো ধাঁচের বাড়ি, রাস্তার লেভেল থেকে আধতলা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলে ছোট্ট উঠোন আর বাগান। সেখানে সোফাসদৃশ নিচু লম্বা চেয়ারে আমরা গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে বসলাম। খাবার আসা মাত্রই আমার সেই 'বেত্তমিজ' কাশি শুরু হলো। পানি খেয়েও থামছিল না। ঝর্ণা তড়িঘড়ি গরম পানির অর্ডার দিল। আমি বললাম— "তোমরা খাও। আমি আর খেতে পারব না। একবারে ওজায়জাত (Ouarzazate) গিয়ে ডিনার করব।" নিজের খাওয়ার চেয়ে বাকিদের খাওয়া যাতে মাটি না হয়, সেটাই ছিল বড় চিন্তা।

ঝর্ণা আর নাজিয়া কয়েকটা কমলা আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল কাশি কমানোর জন্য। আমি কিচেনে উঁকি দিয়ে দেখলাম এক হিজাব পরা সুন্দরী মেয়ে রান্না করছে। হোটেলের মালিকের অল্পবয়সী স্ত্রী সম্ভবত। পেশাজীবনে এনডিসি চলাকালে জর্ডানের এক সতীর্থের 'মেয়ে' ভেবে যাকে প্রশংসা করেছিলাম, পরে জেনেছিলাম তিনি আসলে তার স্ত্রী! সেই থেকে শিক্ষা হয়েছে, তাই এখানে অবাক হইনি। মালিক নিজেই সিরামিকের মগে গরম পানি এনে দিলেন। আস্তে আস্তে তা খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলাম।

ফের যাত্রা শুরু হলো। একটু পর পর কাশি আসছিল। তানিয়া তার ব্যাগ থেকে কাশির লজেন্সের একটা ছোট ডিব্বা আমার হাতে দিয়ে বলল— "আন্টি, এটা আপনার কাছে রাখেন। আরাম পাবেন।" রাকিবা বারবার ওর কাছে থাকা ওষুধ দেওয়ার কথা বলছিল। বিকেলে আমরা ওজায়জাত শহরে পৌঁছালাম। আধুনিকতা আর পুরাতনের মিশ্রণে ছিমছাম এক শহর। হোটেলে ঢুকে অসুস্থ শরীরে দীর্ঘ ভ্রমণে আমি বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। গাড়ি থেকে নেমেই

মাইশাকে কিছুটা কড়া গলায় চার্জ করলাম হেক্টিক জার্নির ব্যাপারে। হুসেন বাংলা না বুঝলেও আমার মেজাজ দেখে অবাক হলো। পরে ও জানালো এই রুটে ট্রেন বা প্লেন সার্ভিস নেই, এই পথেই ফিরতে হয়।

রুমে ঢুকে ফ্রেস না হয়েই লেপের নিচে ঢুকে পড়লাম। ঝর্ণা বের হয়ে গেল, কিন্তু ও সবসময়ই উদ্যমী। খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মনটা শান্ত হলো। ভাবলাম, বাই রোডে না এলে এটলাস মাউন্টেইন বা ডেডস নদীর এই মোহময়ী রূপ তো দেখা হতো না! রাকিবা এসে একপাতা ওষুধ দিয়ে বলল— "ঠাম্মি, এটা সকালে আর রাতে খাবেন। খামোকা কেন কষ্ট করবেন?" ওর দেওয়া ওষুধ খেয়ে কিছুটা ভালো লাগল। পরে দেশে ফিরে জেনেছিলাম ওই ওষুধই আমাকে নিউমোনিয়া আর ব্রংকো-অ্যাজমার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এই অজানা-অচেনা মানুষের মায়া দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

একটু পর ঝর্ণা এসে খবর দিল আজকের ডিনার এই হোটেলেই। হুসেন আমাদের অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিয়ে এই ডিনারের ব্যবস্থা করেছে। বুঝতে পারলাম, ও আমাদের সত্যিই আপন করে নিয়েছে। ওই যে বলেছিলাম "তুমি আমার ছেলের মতো", সেই কথার দাম ও ঠিকই রেখেছে।

১৪

ওয়ারজাজেট (Ouarzazate) শহরে যখন পৌঁছালাম, তখন আমরা ভীষণ ক্লান্ত। এই নামটির সঠিক উচ্চারণ করতে গিয়ে আমাদের জিভ বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! বার্বার ভাষায় এর অর্থ হলো—কোলাহল বা বিভ্রান্তিহীন স্থান। একে 'মরুভূমির প্রবেশদ্বার'ও বলা হয়। ১১৬১ মিটার উঁচু মালভূমিতে অবস্থিত এই শহরটি ড্রা নদীর কল্যাণে একটি মরুদ্যান। এখানে, গম, এপ্রিকট, পিচ ও ডুমুর ফলে। ড্রা নদীতে 'মনসুর এদ-দাহাবি' বাঁধ দিয়ে এই শুষ্ক অঞ্চলের পানির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। খনিজ সম্পদেও এটি সমৃদ্ধ; এখানে ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট ও তামা পাওয়া যায়। এমনকি আরব লিগের সহায়তায় এখানে একটি বিশাল সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসিয়ে তা জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্রাম নেওয়ার পর মনটা চনমনে হয়ে উঠল। আফ্রিকা সম্পর্কে আগে যা জেনেছি, তা মূলত রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে। কিন্তু সরেজমিনে উত্তর আফ্রিকা দেখে বুঝলাম, এই অঞ্চলের মানুষ যতটা না আফ্রিকান, তার চেয়ে বেশি সেমিটিক। চোখ বেঁধে আপনাকে মরক্কো বা আলজেরিয়ায় নামিয়ে দিলে মনে

হবে আপনি আরব উপদ্বীপের কোথাও আছেন। মরক্কোর মানুষ বেশ ফর্সা এবং তাদের সংস্কৃতিতেও সেমিটিক প্রভাব স্পষ্ট।

মরক্কোর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। সমুদ্র সৈকত, শ্যামল পাহাড়ি শৈল শহর, নদীঘেরা সবুজ ক্ষেত, কমলা ও অলিভ বন, এটলাসের ঘন সিডার জঙ্গল আর ভয়াল মরুভূমি—সব মিলিয়ে এক দেশে এত রূপ ভারত ছাড়া আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ! স্পেনের মতো পরাশক্তি দেশ ঘুরেও আমি এতটা মুগ্ধ হইনি। আমার বড় ছেলে জুটকেস গোছানোর সময় ঠাট্টা করে বলেছিল— "ইউরোপীয়দের কাছে মরক্কো কত আগে থেকেই জনপ্রিয়, আর তোমাদের এখন মনে পড়ল?" ওর কথায় কান দিইনি ঠিকই, কিন্তু ঘুরে এসে বুঝলাম কথাটি সত্য। এখানে ইউরোপীয় পর্যটকেরই ভিড় বেশি।

মরক্কোর ইতিহাস ও মানুষের সরলতা আমাকে টেনেছে। যদিও শাসকগোষ্ঠীর দ্বিচারিতা সর্বত্রই বিদ্যমান, কিন্তু সাধারণ মানুষ সব জায়গায় একই ধাতুতে গড়া। আমার এক বস একদা বলেছিলেন, "জিকরুর সাদার মধ্যে সাদা আর কালোর মধ্যে কালো ছাড়া কিছু চেনে না।" হয়তো ঠিকই বলেছিলেন, কারণ মরক্কোর এই রুক্ষ কিন্তু মায়াবী প্রকৃতি আমার মনে এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

হোটেলটি ছিল সাদাসিধা কিন্তু অত্যন্ত অভিজাত। সিঁড়ির দেয়ালে পেতলের বাতির স্ট্যান্ডগুলো প্রাচীন রাজপ্রাসাদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। ডাইনিং টেবিলে রাজকীয় আয়োজন থাকলেও মরোক্কান খাবারে ঝাল নেই বললেই চলে। তবে আমাদের সাথে ছিল 'মহিলা ইবনে বতুতা' ঝর্ণা; তার জাদুর ঝুলি থেকে বের হলো চিলি ফ্লেক্স (শুকনো মরিচের গুঁড়া)। ব্যস, বিস্বাদ খাবার নিমেষেই অমৃত হয়ে উঠল!

পরদিন সকালে আমরা গেলাম 'এটলাস স্টুডিও' দেখতে। ওয়ারজাজেট শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্টুডিওটি আফ্রিকার বৃহত্তম এবং পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম। এখানে 'মমি', 'গ্ল্যাডিয়েটর', 'আলাদিন', 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া'র মতো বিশ্বখ্যাত সব মুভি নির্মিত হয়েছে। স্টুডিওর ভেতরে গাইড আমাদের এক বিশাল 'পাথর' দেখিয়ে বলল এটি তুলতে হারকিউলিসও হিমশিম খাবে। আমি গিয়ে হাত দিতেই দেখি ওটা আসলে হার্ডবোর্ডের ডামি! গাইড নিজেই একপাশে ধরে অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের হাসাল।

গাইড আমাদের দিয়ে একটি ছোট্ট 'শুটিং'ও করাল। এক ইউরোপীয় দম্পতিকে রাজা-রাণী বানিয়ে এবং আমাদের দলের তানিয়াকে গোপন রাণী সাজিয়ে একটা ছোট দৃশ্য তৈরি হলো। আমরা সবাই সেখানে প্রজা সেজে অভিনয় করলাম।

গাইড জানালো আমাদের অভিনয় নাকি দুর্দান্ত হয়েছে! এছাড়া আমরা জেমস বন্ড ছবির গাড়ির ডামি এবং মরুভূমির মাঝখানে তৈরি করা কৃত্রিম শহর দেখে মুগ্ধ হলাম।

ওয়ারজাজেটে আরেকটি বিখ্যাত জায়গা হলো 'কাসবাহ' (Kasbah), যা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ। কাসবাহ মানে সুরক্ষিত বাসস্থান। এখানকার লালচে ইটের দালানগুলো বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আভিজাত্যপূর্ণ।

১৫

মরক্কোতে আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল মারাক্কেশ। মোরাভিদ রাজবংশের সময় এটি ছিল তাদের রাজধানী। বার্বার ভাষায় মারাক্কেশ মানে হলো 'ঈশ্বরের ভূমি'। ১০৬২ খ্রিষ্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। মারাক্কেশকে বলা হয় 'আসল মরক্কো'। এখানে সারাবছর বেশ গরম থাকলেও জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বৃষ্টি হয়। শীতকালে এখানকার এটলাস পর্বত বরফে ঢাকা থাকে, যদিও আমরা মার্চে আসায় সেই শ্বেতশুভ্র রূপটি দেখতে পাইনি।

মারাক্কেশ পৌঁছে অসুস্থতা আর ক্লান্তিতে আমি বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। বুকে-পিঠে গেঁথে ধরা কাশির কারণে প্রথম রাতে বিখ্যাত 'জামা আল ফানা' স্কোয়ারে যেতে পারিনি। এই চত্বরটি ২০০১ সাল থেকে ইউনেস্কো হেরিটেজের অংশ। দিনে এখানে ফেরিওয়ালা আর ঘোড়ার গাড়ির রাজত্ব থাকলেও রাতে এটি হয়ে ওঠে স্ট্রিট ফুডের স্বর্গরাজ্য। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত খাবার হলো 'তাঞ্জিয়া' (Tangia), যা মাটির পাত্রে জাফরান ও লেবু দিয়ে ছয় ঘণ্টা ধরে রান্না করা হয়।

পরদিন সকালে স্কোয়ারে গিয়ে শৈল্পিক সাজানো মসলা আর শুকনো ফলের দোকান দেখে খুব অবাক হলাম। এখানে সবাই ধুমছে কেনাকাটা করল। মেদিনার সরু রাস্তার দুপাশে পরিপাটি দোকানপাট। জানতাম না যে ২০২৩-এর ভয়াবহ ভূমিকম্পে এই শহরের অনেক প্রাচীন ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যার চিহ্ন এখনো কিছু জায়গায় রয়ে গেছে। ইউরেশিয়ান ও আফ্রিকান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণেই এই অঞ্চলে জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপর সেতু তৈরি করা সম্ভব হয়নি।

দুপুরে হুসেন লাঞ্চের জন্য তাড়া দিলেও আমাদের মন ছিল স্ট্রিট ফুডের দিকে। রাস্তার ধারের এক দোকানে মাংসের কিমা দিয়ে বানানো 'লোকাল বার্গার' আর জামা আল ফানা চত্বরে মিক্সড ফ্রুট জুস খেয়েই আমরা লাঞ্চ সারলাম। এরপর

রকমারি শুকনো ফল কিনে আমরা গাড়িতে উঠলাম। পরবর্তী গন্তব্য—বাহিয়া প্যালেস।

১৬

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল বাহিয়া প্যালেস। এটি আদতে একটি বাগানবাড়ি। স্থাপত্য বিচারে বাইরের দিক থেকে একে সাধারণ বাগানবাড়িই মনে হবে। 'প্যালেস' বা প্রাসাদ বলতে যে রাজকীয় ভাব আমাদের অন্তরে জেগে ওঠে, বাহিয়া প্যালেসের বহিরাঙ্গনে তার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাইনি। এটি অবশ্য আমার নিজস্ব মতামত। আসলে ভারতীয় উপমহাদেশেই সম্ভবত মধ্যযুগের স্থাপত্য সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে পেরেছিল; বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য কৌশলের সাথে মিশেছিল ভারতীয় শিল্পরীতি। তাতে যেন দুয়ে দুয়ে চার হয়ে ফিবোনাচ্চির গোল্ডেন রেশিওতে পৌঁছে গিয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই কোনো স্থাপত্য অনায়াসে আমাদের মন ভুলাতে পারে না—অবচেতন মনে তুলনাটুকু এসেই যায়, আর তাতেই বাঁধে বিপত্তি।

মনে আছে, তোপকাপি প্যালেসের বাইরের রূপ দেখেও একইভাবে হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু ভেতরের কারুকাজ ছিল ভীষণ সুন্দর। তবে সে তো ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায়; বাইরে থেকে বেশ সাদামাটা ঠেকে। কেবল তৈমুর লংয়ের দেশে বিশাল বিশাল রাজকীয় দালানকোঠা দেখেছিলাম, যদিও সেগুলো একটি অন্যটির কপি—বৈচিত্র্য নেই।

বাহিয়া প্রাসাদের পরিচয়ে বলা যায়, উনিশ শতকে এই প্রাসাদের জন্ম। ১৮৯৪ সালে মৌলা হাসান ডাইনাস্টির উজির মুসা নিজের বাসভবন হিসেবে এটি নির্মাণ করেন। প্রায় ৩০০০ কলাকুশলী কয়েক বছর ধরে এটি নির্মাণ করেছেন। 'কলাকুশলী' শব্দটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম, কারণ এর ভেতরের কারুকাজ ধারণাতীত। কোনো সাধারণ রাজমিস্ত্রির দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। এতটাই সুন্দর যে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। একজন ফরাসি স্থপতি মরোক্কান স্টাইলে প্রভাবিত হয়ে এর নকশা করেন। প্রাসাদের সর্বত্র মরক্কোর আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট।

এর অনিন্দ্য সুন্দর মোজাইকগুলো রঙে ও নকশায় এখনও জ্বলজ্বল করছে। এই মোজাইকের প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে খোদাই করে তারপর জোড়া দেয়া হতো—যা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ধৈর্যের কাজ। কোনো রাসায়নিক ব্যবহার না করে ভেষজ বা ফুল থেকে এর রঙ তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের পদচারণার পরও এর রঙ ম্লান হয়নি, মার্বেলের চাকচিক্য কমেনি। সিলিংয়ে অপূর্ব রঙিন নকশা করা সিডার কাঠের কাজ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

প্রাসাদটিতে চারটি আলাদা কোর্ট-ইয়ার্ড আছে। প্রথমটি উজিরের কর্মস্থল বা দরবার। পরের ইয়ার্ডে একটি ছোট জলাশয় বা সুইমিং পুল আছে, যা পরিবেশকে বেশ ঘরোয়া করে তুলেছে। প্রতিটি আংগিনাই মোজাইক করা এবং মাঝখানে ফোয়ারা রয়েছে।

হারেম অংশে উজিরের স্ত্রীদের জন্য নির্মিত আলাদা অংশ দেখে দলের মেয়েরা ফিসফাস করে হাসিতে ফেটে পড়ছিল। গাইড হুসেন পেশাদারিত্বের সাথে আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখালো। মধ্যযুগে মুসলিম সম্ভ্রান্ত নারীদের জন্য পর্দা পালন করা বাধ্যতামূলক ছিল বলে অন্দরমহলে পরপুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এখান থেকেই 'হারাম' (নিষিদ্ধ) শব্দ থেকে 'হারেম' এসেছে।

২০২৩ সালের ভূমিকম্পে প্রাসাদের সিডার কাঠের কিছু নকশা করা সিলিং ধসে পড়েছে। তবুও এই প্রাসাদ যে কারও মনে গভীর ছাপ ফেলবে।

মারাক্কেশে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মেজোরেল গার্ডেন। রুক্ষ গেরুয়া রঙের পরিবেশের মাঝে 'বাগিচা' শব্দটি বেশ বেমানান ঠেকছিল। পাঁচটা বাজার পর ব্যাচে ব্যাচে পর্যটকদের ভেতরে ঢোকানো শুরু হলো। আবহাওয়া বেশ মনোরম ছিল। সাহারার ঠান্ডায় আমার কাশির দাপট বেড়ে যাওয়ায় বেশ সাবধানে চলছিলাম।

ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল বাঁশ বাগান। আফ্রিকার মাটিতে এশিয়ার এই গাছ দেখে অবাক হলাম। বাগানের পায়ে চলা পথ থেকে নামা কিংবা নির্দিষ্ট বেঞ্চ ছাড়া অন্য কোথাও বসা নিষেধ। ১৯১৭ সালে ফরাসি চিত্রশিল্পী জ্যাক মেজোরেল অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে মারাক্কেশে আসেন এবং এই বাগানের প্রেমে পড়ে এখানে স্থায়ী হন। এখানকার গাঢ় কোবাল্ট ব্লু শেডটি তাঁর নামানুসারে 'মেজোরেল ব্লু' নামে পরিচিত। পরে ১৯৮০-র দশকে বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার ইভ সাঁ লোরঁ (Yves Saint Laurent) এটি কিনে নিয়ে সংরক্ষণ করেন।

মেজোরেল গার্ডেন থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। দলের তরুণীরা শপিংয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমি আর রাশনা হাঁটু ব্যথার কারণে গাড়িতেই অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নিলাম। পার্কিং নিয়ে পুলিশের সাথে ড্রাইভারের বেশ একচোট রফা হলো। শেষমেশ মেয়েরা স্পা ও ডিনার শেষ করে ফিরলে আমরা হোটেলে ফিরলাম। মরক্কোতে আজই আমাদের শেষ রাত, কাল দুপুরে ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে ফেরার বিমান।

বলতে ভুলে গেছি, আমাদের একটি আকর্ষণীয় স্পট ছিল আইত বেন হাদ্দু। এটি ১৯৮৭ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অংশ। পাহাড়ের ওপর লাল মাটির এই

দুর্গ বা কাশবাহটি ৭৫৭ সালে নির্মিত হয়েছিল। কাঁচা ইটের তৈরি ছয়টি লাল দুর্গ পরস্পরের সাথে গলি দিয়ে সংযুক্ত। 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া', 'গ্ল্যাডিয়েটর', কিংবা 'গেম অফ থ্রোনস'-এর মতো বিখ্যাত মুভির শুটিং এখানে হয়েছে।

পাহাড়ের ওপরে সিঁড়ি ভেঙে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলে আমি নিচেই স্যুভেনিরের দোকানে সময় কাটালাম। সেখান থেকে একজোড়া পুতুলের মধ্যে একটি 'সেপাই পুতুল' কিনলাম। দোকানি আমাকে বোরকা পরা নারী পুতুলটি নিতে বললেও আমি রাজি হলাম না। আমি সেপাই ড্রেসের নারী পুতুল চাইলাম, যা শুনে স্থানীয়রা অবাক হয়ে হাসতে শুরু করল। তারা আমাকে বোঝাতে চাইল মেয়েরা এমন পোশাক পরে না। আমি মজা করে আমার গোঁ ধরে রইলাম।

শেষে একটি উটের পুতুলও কিনলাম। এভাবেই সময় কাটল। ফেরার পথে ব্রিজের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আবিদার সুন্দর সবুজ টুপিটি উড়ে গিয়ে নদীর ওপারের গমক্ষেতে হারিয়ে গেল। আমাদের 'এভারেস্ট বিজয়ী'রা (যারা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছিল) ফিরে এলে আমরা রেস্টুরেন্টের দিকে রওনা হলাম।

রেস্টুরেন্টে কয়েক চামচ খেতেই আমার সেই বুকের ভেতর গেঁথে ধরা কাশি শুরু হলো। খিদে পেটে রেখেই উঠে এলাম। রাকিবার দেওয়া ওষুধ আর হুসেনের কেনা সিরাপ খেয়ে কোনোমতে নিউমোনিয়া ঠেকিয়েছিলাম। পরের গল্পটুকু কেবল এয়ারপোর্টে যাওয়া আর বিমানে ওঠার। এভাবেই আমার মরক্কো ভ্রমণের ইতি টানলাম।

ছবিগদ্য

ক্যামেরার সুন্দরবন

ক্যামেরার কবি: রফিকুর রহমান

জোয়ার ভাটার চিহ্ন

বনগামী নৌযান

বনপর্যটক

বনভ্রমণ ও মনভ্রমণ

বিশ্বপর্যটকের আকর্ষণের কেন্দ্রে

বৃক্ষসারি ভেদ করে পথ করে নিয়েছে সুন্দরী খাল

সুন্দরবনের গাছ

সুন্দরবনের খাল

হরিণ